সময় ভ্রমণ এবং সময়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

টাইম ট্র্যাভেল

হিমাংশু কর

BanglaBook.org

সময় ভ্রমণ নিয়ে, বিশেষ করে অতীত ভ্রমণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কোনো কোনো বিজ্ঞানী তো অতীত ভ্রমণ করার সম্ভাবনা এক কথায় বাতিল করে দিতে চান। কিন্তু আসলেই কি সময় ভ্রমণ সম্ভব? আমরা কি এমন কোন টাইম মেশিনের নকশা করতে পেরেছি, যা ভবিষ্যতে কোনো একদিন তৈরি করা সম্ভব হবে? ভবিষ্যৎ জেনে কি তা পরিবর্তন করা যাবে ? এই বইতে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বশেষ জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর সময় ভ্রমণের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য সময় বিষয়টি আসলে ঠিক কি সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

টাইম ট্র্যাভেল

সময় ভ্রমণ এবং সময়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

হিমাংশু কর

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তাম্রলিপি

টাইম ট্র্যাভেল
হিমাংশু কর

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

তাম্রলিপি : ৩৪৯

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
শিবু কুমার শীল

অলংকরণ
চৈতি

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
এম আর প্রিন্টিং প্রেস
১১ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ২৭০.০০

TIME TREBLE
By Himangshu kar
First Published : February 2016, by A K M Tariqul Islam Roni
Director Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 270.00

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

ড. অজয় রায়কে

একটি সেমিনারে যার পড়া আইস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের ভৌত বাস্তবতার একটি আর্টিকেল শুনে আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক উপলব্ধি তৈরি হয়েছিল।

ভূমিকা

বজ্রযোগিনী গ্রাম থেকে অতীশ যখন বেড়িয়ে পড়েছিল বাংলার পথে তার প্রারম্ভিক অভিযাত্রায় সে কী ভেবেছিল? মুন্সিগঞ্জের রঘুরামপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া অষ্টম শতকের বৌদ্ধবিহারের সাথে তার কী কোন যোগসূত্র ছিল? আহ, যদি সময়ের পেছন দিকে যাওয়া যেত! নিদেনপক্ষে দশম শতাব্দীর কাছে এসে দাড়াতে পারতাম তাহলে দেখতে পেতাম আবহমানকালের এক বাংলাকে, দেখতাম জ্ঞানের প্রদীপ হাতে অন্তহীন ছুটে চলা এক পথিককে। ঝালকাঠির গাবখান ব্রিজে দাড়িয়ে ভেজা সবুজ পৃথিবীকে দেখলেও আমার তাই মনে হয়।

কার না ইচ্ছা করে সময় অথবা ক্যালেন্ডারের পিছনের দিকে যেতে - অতীতের ভুলগুলোকে শোধরাতে, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান নিয়ে শৈশবে ফিরে যেতে, ডেমোক্রিটাসের সঙ্গে সক্রেটিসের কী আলাপ হয়েছিল এথেন্সে তা জানতে, অথবা জীবনানন্দ দাশ যখন ছোট্ট নদী ধানসিড়ির তীরে দাড়িয়ে নক্ষত্রের আলোয় মুগ্ধ হতেন অথবা নক্ষত্র আর ঘাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন! আহ যদি দেখতে পেতাম। ভাবলে অবাক লাগে এক সহজ মানুষ কিভাবে একটি ছোট্ট নদী দিয়ে মহাজাগতিক বাস্তবতায় পৌছে যেতেন। সময়ের উল্টো পথেই হাটলেই তা সম্ভব। কিন্তু কিভাবে?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 'সময়' ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে। ইতিহাসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সময়কে বহতা নদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেন্ট অগাস্টিনও তাই বলেছেন। তিনি একবার লিখেছিলেন এর স্রোত অতি তীব্র। কোনো কিছুই ভেসে উঠতে না উঠতেই তা আবার দ্রুত হারিয়ে যায়। কিন্তু তিনি জানতেন না যে সময়ের গতি ধ্রুবক নয়; এর গতি কমানো যায়। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের কাছেও সময় ছিল একটি পরম বিষয়। তার ধারণায় সময় ঘড়ির কাটার মত এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে প্রতিনিয়ত চলমান। সমসাময়িক লিবনিজ ভাবতেন ভিন্ন রকম– সময় এক ঘটনার সঙ্গে আরেক ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে মাত্র; যে বিশ্বে ঘটনা বলে কিছু নেই, কোনো পরিবর্তন নেই, সেখানে সময় বলে কিছু

থাকতে পারে না। আইনস্টাইন লিবনিজের এই ধারণাটির কিছু গ্রহণ করে তাকে নিজের আঙ্গিকে তুলে ধরেন।

টাইম মেশিন বা সময় পরিভ্রমণ গল্পের জন্ম এইচ জি ওয়েলস এর টাইম মেশিন সায়েন্স ফিকশন থেকে। কিন্তু তা ক্রমশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে আইনস্টাইনের পরে এখনও সময় সম্পর্কে আমাদের স্পষ্টভাবে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। এটার একটা কারণ হতে পারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোনো ধরনের বাধা আছে যাকে আমরা অতিক্রম করতে পারছি না। হিমাংশু কর এ ধারণাগুলোর ইতিহাস, বর্ণনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেটা আমাদের ছাড়া ছাড়া ধারণাগুলোকে সমন্বয় করতে সাহায্য করবে। ইতমধ্যে তরুণ প্রজন্ম তার লেখা স্ট্রিং থিওরির ওপর গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। এ্ বইটিও সময় পরিভ্রণে আমাদের নিয়ে যাবে সময় নদীর বাঁকে।

আসিফ

ডিসকাশন প্রজেক্ট

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

কিছু কথা

প্রথমেই বলে নেই, বইটি শুধু সময় ভ্রমণ সম্পর্কেই না; বরং সময় ও সময় ভ্রমণ দুটো সম্পর্কেই। কারণ সময় ভ্রমণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে গেলে সময় সম্পর্কে না জেনে সময় ভ্রমণের বাস্তবতা উপলব্ধি করাটা কষ্টকর।

মানুষ একটি বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে সব সময়ই তার ভবিষ্যৎ-অতীত সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই তারা সময়কে জয় করতে চেয়েছে। আর তাই তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই সময় ভ্রমণের ইচ্ছার কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন মিথ, লোককাহিনী আর ধর্মীয় উপাখ্যানে। এরপর বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে আমাদের কাছে সময়ের এক নতুন রূপ উন্মোচিত হয়েছে। একসময় বিস্ময়ের সাথে মানুষ আবিষ্কার করেছে সময় শুধু আমাদের মস্তিষ্কের উপলব্ধিই নয়, বরং এই মহাবিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থানের মাত্রার মতো সময়ও একটি মাত্রা। সময় স্থান পেয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণে। সময়কে বৈজ্ঞানিকভাবে জানার পর মানুষ সময়কে কল্পনা দিয়ে নয়, জয় করতে চেয়েছে তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে। তৈরি করতে চেয়েছে টাইম মেশিন। যে মেশিনের সাহায্যে মুহূর্তেই ফেলে আসা অতীত কিম্বা সুদূর ভবিষ্যতে পারি দেওয়া যাবে। ফিরে পাওয়া যাবে হারানো সময়। আর উন্মোচিত হবে অজানা ভবিষ্যৎ। কিন্তু চাইলেই তো আর অতীতে চলে যাওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির।

সময়কে সব থেকে স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে। আইনস্টাইন তার তত্ত্বের সাহায্যে এই মহাবিশ্বের স্থান ও সময়কে একই সুতোয় গেঁথে দিয়েছেন। দেখিয়েছেন সময় কোনো পরম বিষয় না, চাইলে সময়কে ধীর করে ফেলা যায়।

BanglaBook.org

বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি। সময় ভ্রমণ করতে গেলেও আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রযুক্তির সন্ধান করতে হবে। কিন্তু তার জন্য চাই সঠিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বই এক্ষেত্রে আমাদের সব থেকে বড় ভরসা। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে ভবিষ্যতে ভ্রমণের সমাধানটি এমনিতেই চলে আসে। এই তত্ত্ব থেকে দেখা যায়, আমরা যদি খুব দ্রুত কোনো মহাকাশযানে ভ্রমণ করে আবার পূর্বের অবস্থানে (পৃথিবীতে) ফিরে আসি, তবে এমনিতেই আমাদের ভবিষ্যতে ভ্রমণ করতে হবে। কিন্তু বিপত্তি বাধে সেই ভবিষ্যৎ থেকে আবার পূর্বের সময়ে ফিরে আসা নিয়ে।

তবে বিজ্ঞানীরা তো আর থেমে থাকার পাত্র না। তারা অতীত ভ্রমণেরও উপায় খুঁজতে থাকলেন। আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র সমীকরণের বিভিন্ন সমাধান থেকে দেখা গেল, তাত্ত্বিকভাবে শুধু ভবিষ্যতে নয়, অতীতে ভ্রমণও সম্ভব। তবে অতীতে ভ্রমণের জন্য কোনো প্রযুক্তি তৈরি করাটা অনেক বেশি কঠিন কাজ। তবে আশার কথা হলো, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সমাধান করা গেলে হয়তো, এমন কোনো সহজ উপায় আমরা খুঁজে পাব, যা দিয়ে আরও সহজেই অতীত ভ্রমণের প্রযুক্তি অর্জন করা যাবে। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সমাধান ছাড়া আমরা ঋণাত্মক শক্তি ও ওয়ার্মহোলের মতো জিনিসকে কাজে লাগিয়ে অতীতে ভ্রমণ করতে চাইছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে- কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির তত্ত্ব হাতে পাবার পর দেখা যাবে এসব উপায় থেকে আরও অনেক সহজেই (বা কম শক্তি ব্যয় করে) অতীতে ভ্রমণের জন্য টাইম মেশিন তৈরি করা যাবে।

এই বইতে প্রথমে সময় ভ্রমণ নিয়ে মানুষের প্রাচীন ভাবনার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন মিথ, লোককাহিনী ও ধর্মীয় উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে মানুষের সময় ভ্রমণের ইচ্ছাকে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে সময়ের প্রকৃতি নিয়ে। সময় আসলে কী? সময়কে আমরা কেন আর কীভাবে উপলব্ধি করি? আর পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময় বিষয়টি কেমন? এছাড়া সময়ের তীর নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বইয়ের মূল বিষয় সময় ভ্রমণ। দুটি অধ্যায়ে স্থান-কাল, ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল, সময় ভ্রমণের তাত্ত্বিক সমাধান, সেই প্রযুক্তি অর্জন করার সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতীতে ভ্রমণ করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের স্ববিরোধী বিষয়ের সৃষ্টি হয়। এসব মজাদার

BanglaBook.org

প্যারাডক্স ও কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা নিয়ে একটি অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সবশেষে সময় ভ্রমণ নিয়ে প্রচলিত কিছু গুজব তুলে ধরা হয়েছে। হয়তো সময় ভ্রমণ একসময় সম্ভব হবে, তবে এই কাহিনীগুলো একদমই বানোয়াট। যা সত্য তাই বিজ্ঞান। তাই এসব চটকদার কাহিনীতে ভরসা না করলেও আমরা একদিন সময়কে জয় করতে পারব। সুদূর অতীতে ভ্রমণ করে ডায়ানোসরদের রাজ্যে ভ্রমণ করে আসতে পারব।

সময় সম্পর্কে আরও কিছু কথা না বললেই নয়। সময় এখনো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ জানা বিষয় নয়। তার অবশ্য কারণও আছে। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সমাধান না করতে পারলে সময়ের একদম নিখুঁত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব না। সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে বিভিন্ন ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে সময় ভ্রমণ করাটা কোনো ব্যাপারই না, শুধু কয়েক বছর অপেক্ষার পরই বিজ্ঞানীরা টাইম মেশিন তৈরি করতে পারবেন। আবার অনেকেই মনে করেন (বিজ্ঞানীরাসহ) টাইম ট্র্যাভেল কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এটি চূড়ান্তভাবে বাতিল একটি ধারণা। আসলে এই দুই ধারণার কোনোটিই সঠিক না। সময় ভ্রমণ কতটুকু সম্ভব আর কতটুকু অসম্ভব সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলাটাও এই বইয়ের একটি উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী মানুষ। তারা খুব সহজেই কোনোকিছুকে বাতিল করে দিতে চান না। সঠিক তাত্ত্বিক সমাধান পাওয়া গেলে হয়তো একদিন সেই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিও তৈরি করা যাবে। তৈরি করা যাবে টাইম মেশিন। জয় করা যাবে সময়কে। তখন আমরা আর প্রকৃতির সাধারণ কিছু নিয়মের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সত্যিকারের স্বাধীন ও বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো জীবনযাপন করতে পারব।

হিমাংশু কর।
মিরপুর ১, ঢাকা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১. মিথ ও সময় ভ্রমণ	১৫
২. সময়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	৩৩
৩. সময়ের তীর	৬৩
৪. টাইম ট্র্যাভেল ও টাইম মেশিন	৯৫
৫. ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল ও স্থান-কালে ভ্রমণ	১১৭
৬. টাইম ট্র্যাভেল প্যারাডক্স	১৬৭
৭. টাইম ট্র্যাভেল ও গুজব	১৮১

মিথ ও সময় ভ্রমণ

নাচে নটরাজ, মহাকাল।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া আলো-ছায়ার বাঘ-ছাল।।
—কাজী নজরুল ইসলাম

স্টিভেন জি. স্প্রুইল তার 'জানুস ইকুয়েশন' বইয়ের মাধ্যমে অতীত ভ্রমণ নিয়ে একটি মাথা খারাপ করা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তার গল্পের নায়ক একজন মেধাবী গণিতবিদ। এই গণিতবিদের টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল। টাইম মেশিন তৈরি করার জন্য কী কী উপায় হতে পারে তা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন। সে একদিন খুবই অদ্ভুত ও খুব সুন্দরী এক মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু প্রথম দেখার সময় মেয়েটি সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। প্রেমে পড়ার পর সে মেয়েটি সম্পর্কে একটু একটু করে খোজ নিতে থাকে। একসময় জানা যায়, এই মেয়েটি আগে একবার কসমেটিক সার্জারি করে তার চেহারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। এসব শুনে তো সেই গণিতবিদের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। সে ঐ মেয়ে সম্পর্কে আরও তথ্য জোগাড় করতে থাকে। পরে জানা যায় মেয়েটি শুধু তার চেহারাই পরিবর্তন করেনি, পাশাপাশি সে তার লিঙ্গ পরিবর্তন করে মেয়ে হয়েছে! অর্থাৎ সে আগে একজন ছেলে ছিল! আরও পরে জানা যায়, সে আসলে ভবিষ্যৎ থেকে আগত একজন টাইম ট্র্যাভেলার। আর সবথেকে মর্মান্তিক বিষয়– এই মেয়েটি অন্য কেউ না, সে নিজেই! (ভবিষ্যৎ থেকে আগত)। তার মানে সে নিজেই তার প্রেমে পড়েছে! এখন আরও মজার বিষয় হলো– এই দুজন যদি বিয়ে করে, আর তাদের একটি সন্তান হয় তাহলে কি হবে? আর এই সন্তানও যদি টাইম ট্র্যাভেল করে সেই অতীতে

BanglaBook.org

চলে যায়, যখন এই গণিতবিদের গল্প শুরু হয়েছিল? এভাবে কেউ ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রী হতে পারবে!

আসলে 'টাইম ট্র্যাভেল' শব্দটিই অনেক কৌতূহল উদ্দীপক। সময়ে ভ্রমণ করে অতীত বা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারলে এর থেকে রোমাঞ্চকর আর কী'ইবা হতে পারে। টাইম মেশিনে চড়ে যদি সেই লক্ষ বছর আগের ডাইনোসরদের যুগে চলে যাওয়া যেত! দৈত্যাকার আর বিস্ময়ে ভরা সেই প্রাণীদের রাজ্যে! অথবা আজ থেকে কয়েক শত বছর পরের সময়ে! নতুন প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তখন কত আশ্চর্য জিনিসই না সম্ভব করে ফেলত। কিন্তু চাইলেই তো আর ডাইনোসরদের রাজ্যে চলে যাওয়া যাবে না। এর জন্য চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের এই জ্ঞান দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেই সাথে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তি মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মাইক্রোসফট হলো লেন্সের কার্যকারিতা দেখে জাদু থেকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। সময় ভ্রমণ নিয়ে বই পড়তে এসে আপনি হয়তো প্রথমেই জানতে চাইছেন – টাইম মেশিন বানানো সম্ভব কিনা সেটা আগে বলুন তো! কোনো প্রযুক্তি তৈরি করা সম্ভব আর কোনটি অসম্ভব, সে বিষয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য দিয়েছেন ব্রিটিশ সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক। তার ভাষায়- "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." অথবা "The only way to discover the limits of the possible, is to go beyond them into the impossible"। তার এই উক্তির মূলভাব এটিই যে– আজকের দিনে আমরা যাকে সাধারণ প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করছি, সেটি কয়েকশত বছর আগেই ম্যাজিক হিসেবে গণ্য হতো। আর আজকের দিনে যাকে ম্যাজিকের মতো মনে হচ্ছে, সেটি হয়তো আগামী দিনের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রযুক্তিতে পরিণত হবে।

সময় ভ্রমণ করতে চাইলে, সময় বিষয়টি কেমন সে সম্পর্কে না জানলে তো আর হবে না। কিন্তু এই সময় জিনিসটি এমনই রহস্যময় আর কৌতূহল ভরা যে, সময় সম্পর্কে খুব বেশি না জেনেও মানুষ তাদের কল্পনাকে মেলে দিয়েছিল। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বসে যেমন সময়

BanglaBook.org

ভ্রমণ করার কথা ভাবছি, তেমনি সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সময় ভ্রমণ নিয়ে ভেবেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বিভিন্ন পুরাণ, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, রূপকথা, লোককাহিনী বা এমন আরও অনেক উপাদানে। এই মিথের কাহিনীগুলো মূলত মানুষের মনের আদিম ইচ্ছার প্রতিফলন। আজকের দিনে আমরা প্রযুক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করতে চাই। কিন্তু প্রযুক্তির রাজত্ব চলছে সেটি বড়জোর শত বছরের কথা। মানবজাতি খুবই আশাবাদী প্রজাতির প্রাণী। সক্ষমতা না থাকলেও তাদের কল্পনা থেমে থাকত না। সেই প্রাচীনকাল থেকেই তারা বিভিন্ন অলৌকিক উপায়ে প্রকৃতিকে জয় করতে চাইত। প্রাচীন পুরাণ থেকে শুরু করে, আজকের দিনের সায়েন্স ফিকশন মুভিগুলোর দিকে লক্ষ করলে আমরা সময় ভ্রমণসংক্রান্ত দীর্ঘদিনের ভাবনা ও ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারব।

হিন্দু পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ

সময় ভ্রমণসংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণটি আছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, 'মহাভারত'-এর একটি কাহিনীতে। মহাভারত মূলত একটি প্রাচীন মহাকাব্য। তবে বেশির ভাগ হিন্দু একে ধর্মগ্রন্থ বলেই মনে করে। বেশির ভাগ সমর্থিত সূত্র অনুযায়ী মহাভারতের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ সালের কাছাকাছি সময়ে। মহাভারত থেকে জানা যায় পৃথিবীর সময়কে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। পৃথিবী সৃষ্টির ঠিক পরের সময়ের নাম সত্য যুগ। সেই সত্য যুগের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন কুকুম্মি রৈবত নামে এক রাজা ছিলেন। তার রাজ্যের নাম ছিল কুশস্থলি। মহারাজ রৈবতের রেভতি নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। রেভতি শুধু রূপেই সেরা ছিল এমন কিন্তু না, কোনো দিক থেকেই তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আর এমন গুণবতী মেয়ে নিয়েই শেষ পর্যন্ত রাজার সাথে এক মহাবিপত্তি। কেননা, এমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের জন্য উপযুক্ত ছেলেই বা কোথায় পাওয়া যাবে! সমগ্র পৃথিবী খুঁজেও রাজকন্যার উপযুক্ত কোনো ছেলের সন্ধান হচ্ছিল না। আবার অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের বয়স তো পার হয়ে যায়!

কোনো উপায় না দেখে রাজা রৈবত তখন সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মার সাথে দেখা করলে এর

BanglaBook.org

কোনো একটা উপায় তিনি নিশ্চয় বলে দেবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন রাজা তার মেয়ে রেভতিকে নিয়ে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশে রওনা দিলেন। রাজা ও রাজকন্যা যখন ব্রহ্মলোকে পৌঁছুলেন ব্রহ্মা তখন গান্ধর্বদের সঙ্গীত শুনছেন। তাই বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গীত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। সংগীত শেষ হবার পর রাজা ব্রহ্মার কাছে সব কথা খুলে বলতেই, ব্রহ্মা তো অট্টহাসিতে ফেটে পরলেন। বলতে লাগলেন 'হে রাজা, তুমি ও তোমার কন্যা যখন বসে সংগীত শুনছিলে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে কেটে গেছে শত-সহস্র বছর। তোমার যুগের রাজপুত্ররা তো গত হয়েছেই, এমনকি তাদের পুত্র-প্রপৌত্র এবং তস্য তস্য পুত্ররাও গত হয়েছে সহস্র বছর পূর্বে।' একথা শুনে রাজা তো অবাক। তিনি এখানে বসে তো মাত্র দু একটি সংগীত শুনলেন। এর ভেতর শত সহস্র বছর কেটে যায় কী করে?

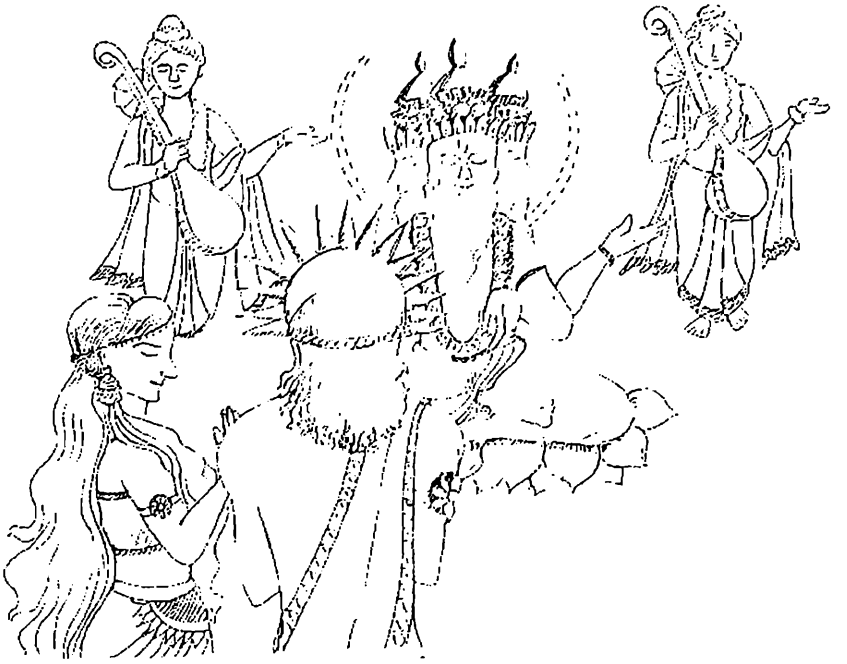

রাজার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ব্রহ্মা তাকে সবকিছু ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন। ব্রহ্মা তাকে বুঝিয়ে দিলেন, মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সময়ের গতি বিভিন্ন। পৃথিবীতে সময় যে গতিতে বয়ে চলে, মহাবিশ্বের অন্যত্র সে গতিতে চলে না। প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রের সময়ের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর

ব্রহ্মলোকের কয়েক মুহূর্তে পৃথিবীর শত শত বছর পার হয়ে যায়। তারপর তিনি তাদের বললেন- 'তোমরা পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে দেখবে পৃথিবীতে এখন দ্বাপর যুগের শেষ সময় চলছে।'

রাজা ও তার কন্যা ফিরে এসে সত্যি তাই দেখলেন। তারা চলে গিয়েছিলেন সত্য যুগের মাঝামাঝি সময়ে, আর এখন দুই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে দ্বাপর যুগের শেষভাগ চলছে। কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে। পরে ব্রহ্মার কথামতো কৃষ্ণের ভাই বলরামের সাথে তার কন্যার বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হিন্দু ধর্মীয় পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আপেক্ষিক সময় ও সময় ভ্রমণের আরও কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ আছে। কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, ব্রহ্মলোকের সম্পূর্ণ দিন-রাত হতে পৃথিবীর ৮.৬৪ ট্রিলিয়ন বছর কেটে যায়। একে এক 'কল্প' বলা হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কিছু বর্ণনা অনুযায়ী আবার চার যুগকেও এক 'কল্প' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কল্পের বিষয়টি বেশ মজার। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ শেষ হয়ে আবার নতুন করে সত্য যুগ শুরু হয়। আর এভাবে চলতেই থাকে। একে বলা হয় বৃত্তাকার সময়। অর্থাৎ হিন্দু দর্শনে সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনীতে আপেক্ষিক সময় ও সময় ভ্রমণের কথা উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে উল্লেখ আছে যে জগতের বিভিন্ন স্থানে সময়ের গতি আলাদা। এছাড়াও 'পয়সি সূত্রে' বুদ্ধের এক প্রধান শিষ্য কুমার কশ্যপ, পয়সি নামে একজনের সন্দেহ দূর করার জন্য সময়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। কুমার কশ্যপের ব্যাখ্যা অনুসারে তেত্রিশ দেবতার বাসস্থান স্বর্গে, সময়ের গতি পৃথিবীর থেকে আলাদা। আর তাই সেখানে যারা থাকে তাদের আয়ু অনেক বেশি হয়। স্বর্গের একদিন আমাদের পৃথিবীর একশত বছরের সমান। তাই সেখানে যারা থাকে তারা পৃথিবীর মানুষের তুলনায় অনেক গুণ বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ কেউ যদি স্বর্গে কিছুদিন থেকে আসে, তাহলে পৃথিবীতে কয়েক শতাব্দী কেটে যাবে।

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ

ইহুদিদের একটি অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হলো, 'তালমুদ (Talmud)'। এটি ইহুদিদের মৌখিক আইন হিসেবেও প্রচলিত। ইহুদিদের ঐতিহাসিক দ্বিতীয়

BanglaBook.org

উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে যাবার পর এটি লিখতে শুরু করা হয়। তালমুদে মোজেস (মুসা নবী) -এর সিনাই পর্বতে যাওয়া সহ আরও অনেক কাহিনী আছে। এতে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে লিখা হোনি হা-ম'এগেল (Honi ha-M'agel) নামে এক ব্যক্তির গল্প বর্ণনা করা আছে। "হোনি হা-ম'এগেল" একদিন এক রহস্যময় ঘুমে তলিয়ে যান। ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান পৃথিবীতে ৭০ বছর কেটে গেছে। তার ছেলে, এমনকি ছেলের সন্তানরাও আর বেঁচে নেই। পরে তিনি বুঝতে পারেন তার এক ঘুমে পৃথিবীতে অনেক বছর কেটে গেছে আর এই ঘুমের মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতে চলে এসেছেন। এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে যান।

ইসলামি ধর্মগ্রন্থ

ইসলাম ধর্মে সময় ভ্রমণের দুই ধরনের উল্লেখ আছে। ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ কুরআনে এমন কয়েকজন ব্যক্তির গল্প আছে যারা একটি গুহার ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে এবং ৩০৯ বছর পর জেগে ওঠে। ঘুমের মধ্যে দিয়ে তারা ভবিষ্যতে ভ্রমণ করেছিল। এছাড়া সময়ের গতি যে আলাদা হতে পারে সে বিষয়েও উল্লেখ আছে। এসব সূত্র মতে, ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ্) এক দিন, পৃথিবীর মানুষের এক হাজার বছরের সমান।

এগুলো ছাড়াও ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মোহাম্মদকে নিয়ে সময় ভ্রমণসংক্রান্ত একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাটি ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের কাছে এই ঘটনাটি 'মেরাজ' নামে পরিচিত।

মেরাজের সঠিক তারিখ নিয়ে অনেকের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের আগে ঘটেছিল। সালটি সঠিক বলা না গেলেও বেশিরভাগ সমর্থিত সূত্র অনুযায়ী এটি ৬১৯-৬২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হবে বলে ধারণা করা হয়। রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে হযরত মোহাম্মদ উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। দেবদূত (ফেরেশতা) জিবরাঈল এসে তাকে ডেকে তোলেন। এরপর জিবরাঈল তাকে মেরাজে যাবার কথা বলেন।

BanglaBook.org

জিবরাঈল প্রথমে মোহাম্মদকে মসজিদুল হারামে নিয়ে যান। সেখানে জমজম কূপের পানি দিয়ে শরীর ধৌত করে (অজু) তিনি পবিত্র হয়ে নেন। মেরাজে যাবার জন্য তাকে একটি প্রাণীর পিঠে উঠতে বলা হয়। প্রাণীটি দেখতে গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি, গায়ের রঙ সাদা। পিঠের দুই পাশে ডানা আছে। হাদিসে এই প্রাণীকে 'বোরাক' বলে উল্লেখ করা আছে। এরপর তাকে সেই প্রাণীর পিঠে চড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে (পূর্ব জেরুজালেম) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি সব নবীদের ইমাম (নেতা) হয়ে প্রার্থনা করেন।

তারপর তিনি বোরাক নামের সেই প্রাণীর পিঠে চড়ে উপরের দিকে উঠতে থাকেন। শুরুতে তাকে প্রথম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার সাথে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমের দেখা হয়। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিতীয় আকাশে, সেখানে তার সাথে ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া এবং হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে দেখা হয়। এরপর তাকে চতুর্থ আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার সাথে হযরত ইদ্রিসের সাথে দেখা হয়। এরপর তাঁকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সাথে হযরত হারুনের দেখা হয়। এরপর তাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার সাথে হযরত মুসার (মোজেস) দেখা হয়। এরপর তাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে হযরত মোহাম্মদের সাথে হযরত ইব্রাহীমের দেখা হয়। সপ্তম আকাশের পর তারা বায়তুল মামুরে গিয়ে ফেরেশতাদের নিয়ে আবারও প্রার্থনা করেন (দুই রাকাত নামাজ পড়েন)।

এরপর তাকে সিদরাতুল মুনতাহা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার সাথে আসা জিবরাঈল এই স্থানের উপরে যেতে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে। জিবরাঈল তাকে জানায়, তারা বোরাক নামে যে পাখাযুক্ত প্রাণীর সাহায্যে এই সপ্তম আকাশ পর্যন্ত এসেছিল, এর সাহায্যে আর উপরে যাওয়া যাবে না। তার পরিবর্তে এখন 'রফরফ' নামে আরেকটি বাহনের সাহায্যে নিতে হবে। রফরফ দেখতে কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এটি দেখতে সবুজ রঙের ছিল এটা নিশ্চিত। হাদিস থেকে জানা যায়, এখানে তিনি জিবরাঈলকে তার নিজের রূপে দেখেছিলেন। তার ৬০০টি ডানা ছিল। এরপর তিনি রফরফে চরে সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ্‌র) যে দরবার আছে সেখানে পৌঁছান। এই জায়গাটি আরশে মোয়াল্লা নামে পরিচিত। হাদিস ও তাফসিরের বর্ণনা অনুসারে, তিনি আল্লাহর এতটা কাছাকাছি গিয়েছিলেন যে দুজনের মধ্যখানে মাত্র

BanglaBook.org

ধনুক পরিমাণ ব্যবধান ছিল। সেখানে আল্লাহর সাথে তার কথোপকথন হয়। এই কথোপকথনের মাধ্যমে প্রার্থনার (নামাজের) নিয়ম কেমন হবে, কতবার প্রার্থনা করতে হবে ইত্যাদি বিষয় ঠিক করা হয়। এই ভ্রমণের মধ্যেই তাকে বেহেস্ত ও দোজখসহ আরও অনেক রহস্যময় স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এসব কিছুর পরে তাকে যখন আবার পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি দেখতে পান এতসব করার পরও কোনো সময় অতিবাহিত হয়নি। তিনি যেখানে ওজু করেছিলেন সেই স্থানের পানি এখনো মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। দরজার কড়া এখনো দুলছে। বলা হয়, চোখের এক পলক পড়তে যে সময় অতিবাহিত হয় তিনি এই সময়ের মধ্যে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস (পৃথিবীর একটি স্থান), সাতটি আকাশ ও আরও অনেক স্থান ভ্রমণ করে আসেন।

খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে টাইম ট্র্যাভেলের সরাসরি কোনো উল্লেখ নেই। তবে বাইবেল নতুন নিয়মে পিটার II পুস্তকে, সময়ের প্রবাহ নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে পিটার উল্লেখ করেছেন, 'প্রভুর একদিন আমাদের এক হাজার বছরের সমান, আর এক হাজার বছর প্রভুর কাছে এক দিনের মত' (II পিটার, ৩:৮)। এই বর্ণনার সাথে ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিকর্তার সময়ের ধারনার মিল আছে। মূলত খ্রিষ্টান ধর্মসহ আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে[১] সৃষ্টিকর্তার সময়ের ব্যাপারে একই রকম ধারণা করা হয়।

এতো গেল ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা। এসব ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাচীন লোককাহিনী ও রূপকথার গল্পেও টাইম ট্র্যাভেলের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আবার কিছু গল্প আছে, যেগুলো পড়লে সময় সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এসব গল্পের মধ্যে প্রাচীন জাপানি রূপকথার গল্পগুলো অনেক জনপ্রিয়।

BanglaBook.org

---

[১] ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম এই তিনটি ধর্মকে একত্রে আব্রাহামিক ধর্ম বলা হয়। কারণ এই তিনটি ধর্মের আদিপুরুষ ছিলেন আব্রাহাম (হযরত ইব্রাহিম)। আব্রাহামের বংশধররা এই তিনটি ধর্ম পালন করে বলেই এমন নামকরণ। এই তিনটি ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণাও খুব কাছাকাছি।

প্রাচীন জাপানি রূপকথা

বিভিন্ন দেশে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রূপকথার গল্পে সময় ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি জাপানি রূপকথায় 'উরাশিমা তারো' নামে এক ব্যক্তির সময় ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুন্দর একটি গল্প আছে। গবেষকদের তথ্য মতে, উরাশিমা তারোর গল্পটি ৮ম শতকের গোঁড়ার দিকে (জাপানি নারা যুগে) লেখা হয়।

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। জাপানের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এক গরিব জেলে বাস করত। লোকে তাকে উরাশিমা তারো বলেই ডাকত। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে নৌকা নিয়ে মাছ ধরার জন্য বের হতো। সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে আগে থেকেই কিছু বলা যায় না। যেদিন ভাগ্য ভালো, সেদিন তারো অনেক মাছ পেত। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হলে কোনো কোনোদিন একটি মাছও জুটত না। একদিন সকালের কথা। উরাশিমা তারো মাছ ধরতে যাচ্ছে। সে দেখতে পেল সমুদ্রের ধারে কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে মিলে একটি কচ্ছপকে নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু এতে কচ্ছপটার খুব কষ্ট হচ্ছে। এসব দেখে কচ্ছপটির প্রতি উরাশিমার খুব মায়া হল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে কচ্ছপটিকে রক্ষা করল, আর গভীর পানিতে ছেড়ে দিল।

এরপর আরেক দিনের কথা। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন কোনো মাছ পাওয়া যায়নি। মনের দুঃখে সে সমুদ্রের পার দিয়ে হাঁটছে। এমন সময় তার মনে হলো, কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকছে। তাড়াতাড়ি সে পেছনে ফিরে দেখল। কিন্তু একি? কেউই তো নেই! উরাশিমা ভাবল হয়তো মনের ভুল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারও সেই ডাক শোনা গেল। এবার সে বুঝতে পারল এটি মনের ভুল হতে পারে না। নিশ্চয় কেউ তাকে ডাকছে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সে হঠাৎ খেয়াল করল, ঐ দিনের সেই কচ্ছপটি পানির ওপর ভাসছে। আশেপাশে তাকিয়ে আর কাউকে পাওয়া গেল না। এবার কচ্ছপের দিকে তাকাতেই কচ্ছপটি কথা বলে উঠল- 'সেদিন তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তোমাকে সেদিন একটা ধন্যবাদও দেওয়া হয়নি।

কচ্ছপকে কথা বলতে দেখে উরাশিমা খুব অবাক হলো। কিন্তু কচ্ছপটির সেদিকে খেয়াল নেই, সে তার ভালোমন্দ এসব খবর জানতে চাইল। উরাশিমা তাকে বলল, আমি একজন জেলে। সমুদ্রে মাছ ধরে আমার জীবিকা চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার এমন হয় যে আমি কোনো মাছই পাই না। সেদিন আমার খুব কষ্ট হয়। যেমন আজ এত কষ্ট করেও কোনো মাছ জালে তুলতে পারি নি।

BanglaBook.org

এসব কথা শুনে কচ্ছপটি উরাশিমাকে তার পিঠে চড়ে বসতে বলল। উরাশিমা তো অবাক। উরাশিমা ভেবেছিল কচ্ছপটি বুঝি মজা করছে। তাই সে বলল, আমি কী করে তোমার পিঠে বসব?

এসব শুনে কচ্ছপটি হাসতে হাসতে বলল, কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি শুধু আমার পিঠে চড়ে বসো। আমি তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সবকিছুই আশ্চর্য রকম সুন্দর। তোমার অনেক ভালো লাগবে। আর তোমার কোনো অসুবিধাও হবে না।

কচ্ছপের কথামতো সে তার পিঠে চড়ে বসল। তাকে পিঠে নিয়ে কচ্ছপটি সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে লাগল। উরাশিমা অবাক হয়ে লক্ষ করল, তার নিশ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সমুদ্রের নিচে তারা একটি বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে থামল। চকচক করছে চারদিক। সুন্দর মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো সেই প্রাসাদ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে আর কচ্ছপটি খুঁজে পেল না। কোথায় চলে গেল সেই কচ্ছপ?

প্রাসাদের সামনে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তার সামনে খুব সুন্দর একটি মেয়েকে দেখা গেল। উরাশিমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মেয়েটিই কথা বলা শুরু করল–

আমি সমুদ্র দেবতার মেয়ে। তুমি যে কচ্ছপকে খুঁজছ আমিই সে। আমি মানুষের রূপ ধারণ করতে পারি, আবার কচ্ছপের রূপও ধারণ করতে পারি। সেদিন কচ্ছপের রূপে সাগরের পাড়ে খেলা করার সময় কিছু ছেলে-মেয়ে আমাকে ধরে ফেলে। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমাকে বিয়ে করলে তুমি এখানে থাকতে পারবে। তোমার আর কোনো সমস্যাই থাকবে না।

কীসব ভেবে উরাশিমা সমুদ্র দেবতার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। পরদিন বিশাল আয়োজন করে তাদের বিয়ে হয়ে হলো। বিয়ের পর তাকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে তখন এই নতুন জগতের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। সত্যি সত্যি এখানের সবকিছুই ছিল অন্য রকম। ঘরের চারদিকে চারটি জানালা ছিল। উরাশিমা প্রথমে পূর্ব দিকে জানালাটি খুলল। বাইরে বসন্ত ঋতু চলছে। চেরি গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। গাছের পাতার আড়ালে কোকিল গান গাইছে।

এবার সে উত্তরের জানালাটি খুলল। বাইরে গ্রীষ্মকাল। পাখিরা কিচিরমিচির করছে, বাগানে নানা রঙের ফুল। এরপর সে পশ্চিমের জানালা খুলে দেখল। বাইরে শরৎ কাল। গাছের পাতার রঙ বদলাচ্ছে। হরিণের ডাক শোনা যাচ্ছে। সবশেষে সে দক্ষিণের জানালাটি খুলল। সেখানে তখন শীতকাল। ঝাপসা কুয়াশা। শীতল বাতাস বইছে। একি ! এইতো তার গ্রামের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাশে নীল সমুদ্র। এই সমুদ্রের পারেই তো সে মাছ ধরত।

এই নতুন জগৎ দেখতে দেখতে তার তিন দিন কেটে গেল। এবার তার বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে নিজের গ্রাম দেখার সময় তার খুব নিজের গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। বাবা-মার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করে। সে তার মনের কথা সমুদ্র দেবতার মেয়েকে খুলে বলল। কিন্তু সে তো কিছুতেই রাজি হবে না। সমুদ্র দেবের কন্যা তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, এটি কিছুতেই সম্ভব না। তুমি এই জগত থেকে ফিরে গেলে আমি আর কখনো তোমাকে দেখতে পাব না। এছাড়াও এমন কিছু সমস্যা আছে যা তোমাকে বলা সম্ভব না।

কিন্তু উরাশিমা কিছুতেই তার কথা মানতে চাইল না। খুব বেশি জেদ করায় মেয়েটি তখন তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো আর তার হাতে একটি রুপার

BanglaBook.org

বাক্স দিল। বাক্সটি একটি লাল সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল। মেয়েটি তাকে বার বার করে সতর্ক করে দিল- 'তুমি কোনোভাবেই এই বাক্স খুলবে না।'

এবার মেয়েটি কচ্ছপের রূপ ধারণ করে তাকে তার পিঠে চড়ে বসতে বলল। ধীরে ধীরে তারা পানির উপরে চলে যাচ্ছে। সেই পাতালপুরী পার হয়ে মেয়েটি তাকে তার গ্রামের ধারে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। বিদায় নেবার আগে সে আরেকবার তাকে সতর্ক করে দিল, সে যেন কোনোভাবেই ঐ বাক্সটি না খোলে। পাশাপাশি বাক্সটিকে সব সময় তার সাথে রাখার জন্য অনুরোধ করল।

উরাশিমা তার গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। কিন্তু একি? তার গ্রাম কোথায়? সে তো তার গ্রামের কোনো কিছুই চিনতে পারছে না। গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেও তারা কিছুই বলতে পারল না। কেউ কেউ বলল উরাশিমা নামে কোনো লোককে তারা চেনে না; এখানে এই নামে কেউ থাকতও না। অনেক খোঁজার পর সে এক বৃদ্ধের সন্ধান পেল। বৃদ্ধ তাকে জানাল- প্রায় ৩০০ বছর আগে উরাশিমা নামে এক লোক ছিল। একদিন সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সে আর গ্রামে ফিরে আসেনি।

ধীরে ধীরে উরাশিমা সব বুঝতে শুরু করল। সেই পাতালপুরীতে তিন দিন থাকার সময়ে এখানে প্রায় তিনশ বছর চলে গিয়েছে। সে আরও দু একদিন থেকে এলে এখানে আরও কয়েক শত বছর পার হয়ে যেত। কী আশ্চর্য ব্যাপার! ঐ পাতালপুরীতে তাহলে সময় থমকে গিয়েছিল!

বাবা-মাকে দেখতে না পেয়ে উরাশিমার খুব দুঃখ হলো। কিন্তু খারাপ লাগলেও তার কিছু করার নেই। তার পরিচিত সবাই অনেক বছর আগেই মারা গিয়েছে। অচেনা পাতালপুরীতে গিয়ে সে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে ফেলেছে।

উপায় না দেখে সে এবার মেয়েটির সাথে দেখা করার জন্য সমুদ্রের পারে ঘুরে বেরাতে লাগল। কিন্তু কয়েক দিন পার হয়ে গেলেও তারও দেখা পাওয়া গেল না। অবশেষে রেগে গিয়ে সে ঐ বাক্সটি খুলে ফেলল। কিন্তু বাক্সটি খোলার সাথে সাথেই সে খুব অসুস্থ বোধ করতে থাকে। তার হাত-পা অবশ হয়ে যেতে থাকে। এবার বাক্সটি থেকে এক ধরনের ধোঁয়া বের হয়ে তাকে ঘিরে ধরল। ধীরে ধীরে তার চুলগুলো সাদা হয়ে গেল। চামড়া কুঁচকে গেল। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে একজন বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যায়। শক্তি শেষ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

এটি একটি রূপকথার গল্প, পাশাপাশি লোককাহিনী। তাই বিভিন্ন জায়গায় একে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা আছে। কিছু কিছু বর্ণনা মতে উরাশিমা এভাবেই মারা যায়। আবার কিছু বর্ণনা মতে সে প্রথমে একটি সারস পাখিতে ও পরে দেবতায় পরিণত হয়। এবং আবার তার সাথে সেই মেয়েটির দেখা হয়।

গল্পটির সাথে উরাশিমার নাম যুক্ত হয় ১৫০০ সালের দিকে। কিন্তু মূল গল্পটি সেই ৮০০ সালের দিকে লেখা। ১৯১০ সালে এটি জাপানি পাঠ্যবইতে স্থান পাবার পর থেকে এটি একটি আদর্শ জাপানি লোককাহিনীর মর্যাদা পেয়ে আসছে।

এসব রূপকথার গল্প ছাড়াও বিভিন্ন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সময় ভ্রমণের হদিস পাওয়া যাবে।

মধ্যযুগীয় ল্যাটিন সাহিত্য

১২ শতকের শুরুর দিকে ওয়ালটার ম্যাপ নামে এক ল্যাটিন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি তার "De nugis curialium" এ সময় ভ্রমণসংক্রান্ত একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ১২ শতকের ল্যাটিন সাহিত্যের মধ্যে যেগুলো এখনো টিকে আছে "De nugis curialium" তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইয়ের গল্পগুলো মূলত সে সময়ের লোককাহিনী ও প্রাচীন রূপকথার সংকলন বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে কিছুর সংকলন তিনি নিজেই করেছিলেন। আবার কিছু ছিল নির্ভরযোগ্য ও চেনাজানা মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া। এই গল্পগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল আদি প্রাচীন কাহিনী নিয়ে লেখা, আবার কিছু আছে আঞ্চলিক ক্ষুদ্র প্রচলিত গল্প। সে হিসেবে এই বই বারো শতকের প্রথম দিকে লেখা হলেও এর বেশ কিছু গল্প আরও অনেক প্রাচীন।

ম্যাপ তার বইতে এক রাজার গল্প লিখেছেন। ব্রিটেনের রাজা হেনরি মাঝে মাঝেই তার সভাসদদের নিয়ে শিকার করতে বের হতেন। এমনই একদিন তাদের সাথে রঙ-চঙ মাখা এক রহস্যময় ভাঁড়ের সাথে দেখা হয়। সেই ভাঁড় তার জাদুর সাহায্যে রাজা ও তার শিকারের সঙ্গীদেরসহ ২০০ বছর ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেয়।

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মীয় নথিপত্র থেকে দেখা যায়, সময়ে ভ্রমণ করাটা মানব জাতির একটি অনেক প্রাচীন ইচ্ছা। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো এসব কাহিনীর সবগুলোই ছিল ভবিষ্যৎ ভ্রমণ নিয়ে। উপরে যে কাহিনীগুলো

BanglaBook.org

দেওয়া হয়েছে তার সবগুলোই ভবিষ্যতে ভ্রমণের। অতীতে ভ্রমণ করার চিন্তাটা অনেক আধুনিক।

অতীতে ভ্রমণসংক্রান্ত প্রথম লেখা সম্ভবত স্যামুয়েল মাডেনের "Memoirs of the Twentieth Century"। এই বইতে একজন দেবদূত ১৯৯৭ সাল থেকে অতীতে ভ্রমণ করে ২৫০ বছর পেছনে চলে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে কিছু নথিপত্র দেওয়া; যাতে সে ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

ডেনিশ-নরওয়েইয়ান কবি জোহান হারমান উইসেল তার লেখা নাটক, "আন্নো ৭৬০৩"-এ সময় ভ্রমণের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখেছিলেন। নাটকটি ১৭৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পের দুই প্রধান চরিত্র একজন ভালো পরীর জাদুর সাহায্যে ৭৬০৩ সালে ভ্রমণ করেন।

এই সময়টায় সময় ভ্রমণ নিয়ে আরও বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়। লুইস-সিবাস্টেইন মারসিয়ার তার "দ্যা ইয়ার ২৪৪০: আ ড্রিম ইফ এভার দেয়ার ওয়ার ওয়ান" বইতে সময় ভ্রমণ নিয়ে লিখেন। এই গল্পের মূল চরিত্র ২৪৪০ সালের একটি সময়ে চলে যায়।

আসলে, মধ্যযুগে সময় ভ্রমণ নিয়ে অনেক মানুষের মধ্যে এক ধরনের তীব্র আকর্ষণ কাজ করত। ফলে বেনামে ছাপা হওয়া অনেক গল্পও বিখ্যাত হয়েছে। ১৮৩৮ সাল "Missing One's Coach: An Anachronism" শিরোনামে বেনামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পে একটি লোক স্টেশনে বসে কোচের জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ সে নিজেকে ১০০০ বছর আগের সময়ে দেখতে পায়। ঘুরতে ঘুরতে সে প্রাচীন একটি আশ্রমে চলে গেলে সেখানে তার সাথে একজন সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সে সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলে জানতে পারে- আগামী ১০০০ বছর ইতিহাসে কী কী পরিবর্তন হবে, অগ্রগতি হবে। এরপর একসময় হঠাৎ করেই নিজেকে তিনি বর্তমানে আবিষ্কার করেন।

উনিশ শতকের বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্স ১৮৪৩ সালে "A Christmas Carol" নামে যে উপন্যাসটি লিখেন, এটিও মূলত একটি সময় ভ্রমণের গল্প। এখানে Ebenezer Scrooge কে জগৎ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার জন্য তার জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়া হয়।

BanglaBook.org

এই বইটিতে সময় ভ্রমণের কাহিনীর ভেতর দিয়ে গভীর দর্শনের উপস্থাপনা করা হয়েছে।

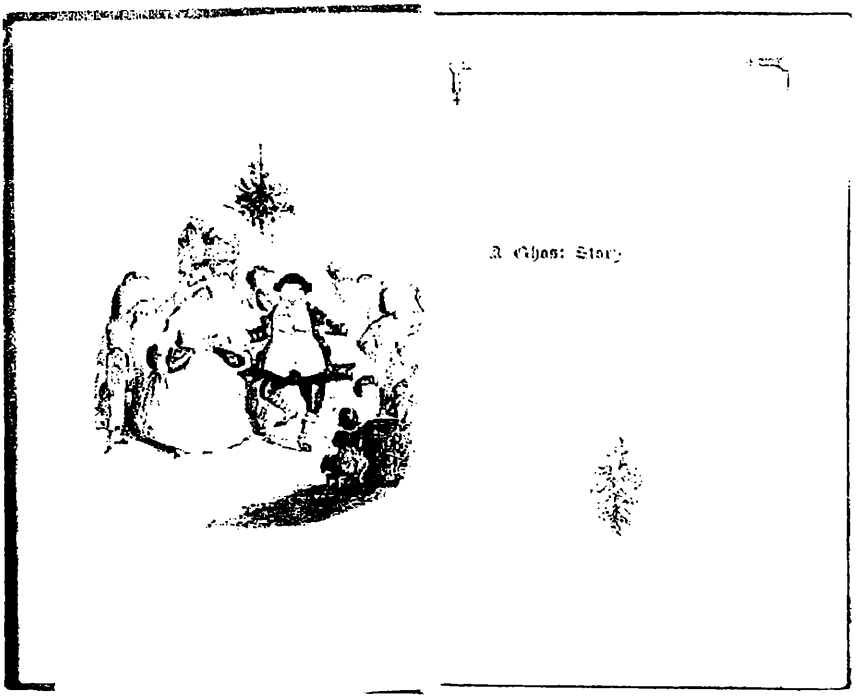

চিত্রঃ চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত বই ক্রিসমাস ক্যারলের ১৮৪৩ সালের সংস্করণের প্রথম পেজ।

অ্যামেরিকান সাহিত্য

অ্যামেরিকান সাহিত্যে সময় ভ্রমণ নিয়ে প্রথম কাজ করেন মার্ক টোয়েন। তিনি তার ১৮৮৯ সালে লেখা "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court" এ এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম না জানা থাকলে অন্ধবিশ্বাসের মানুষকে যে খুব সহজেই ধোঁকা দেওয়া যায়, এই গল্পটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই কাহিনীতে ঊনিশ শতকের একজন অ্যামেরিকান ৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা আর্থারের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে তাকে বন্দী করা হয় এবং শাস্তি দিতে বলা হয়। এমন সময় তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি সূর্যকে নিভিয়ে দিতে পারেন; সবকিছু অন্ধকার করে দিতে পারেন। এখানে আসল ঘটনা হলো, ইতিহাস থেকে তিনি জানতেন ঐ দিনই একটি সূর্যগ্রহণ হবার কথা। কিন্তু সে সময়ের রাজদরবারে যারা ছিল, তারা তো আর সে কথা জানত না।

BanglaBook.org

এরপর যখন সূর্যগ্রহণ শুরু হয়ে যায় তখন সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে যেতে থাকে। তখন রাজাসহ সবাই ভয় পেয়ে যায়। সূর্যকে আবার মুক্ত করে দেবার শর্তে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

উপরে যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই স্রেফ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তৈরি করা। এগুলোর সাথে বিজ্ঞানের কোনো যোগ ছিল না। এইচ. জি. ওয়েলস তার "দ্য টাইম মেশিন" নামের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মাধ্যমে টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত ফিকশনের সূচনা করেন। ওয়েলসের বইটিতে টাইম মেশিনসহ সময় বিষয়টি আসলে কী, সে বিষয়েও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেওয়া হয়েছে। অবাক করার মতো বিষয় হলো, আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করার দশ বছর আগেই এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি সময়কে স্থানের আরেকটি মাত্রা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর মিনকোয়স্কি স্থান-কালের ধারণা ব্যক্ত করার ১৩ বছর আগেই স্থান-কাল যে একই সত্তার ভিন্ন রূপ, তারও একটি স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

ভাবলে অবাক হতে হয়, তিনি তার বইটি শুরুই করেন সময়কে স্থানের আরেকটি মাত্রা হিসেবে কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তার একটি সহজ সাধারণ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে।

ওয়েলসের বইটি প্রথমে খণ্ড আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার পৌত্রের লেখা থেকে জানা গিয়েছে, তিনি তখন একটু আর্থিক সমস্যায় ছিলেন। ফলে তার বহু বছরের জমানো একটি বড়সড় আইডিয়াকে উপন্যাসের রূপ দিয়ে বেচে দিতে হয়। তিনি পরে জানিয়েছেন ঐ সময়টায় তার অর্থের সমস্যা না থাকলে তিনি বইটিকে আরও বিস্তারিত করতে চেয়েছিলেন।

"টাইম মেশিন" বইয়ের ১৯৩১ সালের ভূমিকায় ওয়েলস বলেছেন- "সময় হলো চতুর্থ মাত্রা এবং বর্তমান কালটা হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগতের একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি মাত্র"। তার এই লেখা থেকে বোঝা যায়, তিনি পুরো মহাবিশ্বকে একটি একক সময়ে অবস্থিত বলে ধরে নিয়েছেন। এই চিত্রে পুরো সময়ের প্রতিটি মুহূর্তই, "সময়" নামে স্থান-কালের একটি অতিরিক্ত মাত্রার মধ্যে এনকোডেড আছে। বিষয়টি কিছুটা হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপলের মতো। যেন কোনো পৃষ্ঠের ভেতর পুরো ঘটনাপ্রবাহগুলো ইনকোডেড আছে, আর তার একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতিফলনের ফলে, "বর্তমান কাল" বিষয়টি আমাদের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে।

BanglaBook.org

চিত্রঃ এইচজি ওয়েলসের টাইম মেশিন বইকে ১৯৫৭ সালে প্রথম সচিত্র রূপ দেওয়া হয়। এটি সেই বইয়ের প্রচ্ছদ।

টাইম মেশিন গল্পের মূল চরিত্র সময় ভ্রমণ করার জন্য একটি টাইম মেশিন ব্যবহার করেন। তার বইতে টাইম মেশিনের অনেক খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র টাইম ট্র্যাভেল করে শত সহস্র বছর ভবিষ্যতে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান মানব জাতি তখন দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক প্রজাতির নাম "ইলই"। তারা মানুষ থেকে উদ্ভূত এক

প্রকার বামন প্রজাতি। এরা খুবই ভালো। এদের দেখে টাইম ট্র্যাভেলার অনেক আনন্দিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পারেন এই মানব প্রজাতিকে দেখে এত আনন্দিত লাগলেও এরা আসলে খুবই দুর্বল ও শিশুদের মতো অন্ধকারের প্রতি ভীত।

ভীত হবার কিন্তু যথেষ্ট কারণও আছে। কেননা এই সময়ে পৃথিবীতে শুধু ইলইরাই বাস করে না। পৃথিবীর উপরের এই সৌন্দর্যের পাশাপাশি এক অন্ধকার জগৎও আছে। মাটির নিচে সুরঙ্গ করে থাকে একদল হিংস্র ও ভয়ানক জাতি। নাম এদের মরলক। যেকোনো মুহূর্তে এদের গ্রাসে পরিণত হতে পারে সবাই। দুঃখের বিষয় হলো, এরাও মানুষেরই প্রজাতি। আর তাদের আছে ভূগর্ভস্থ মেশিন। গল্পের এক পর্যায়ে মূল চরিত্র তার টাইম মেশিনটি হারিয়ে ফেলেন। এটি খুঁজে পাওয়া নিয়েই গল্পের পরের কাহিনী এগুতে থাকে। ওয়েলসের এই বইয়ের পরে টাইম ট্র্যাভেল বিষয়টি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর একটি আকর্ষণীয় উপলক্ষে পরিণত হয়েছে। একটি সময় পরে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর সিনেমাতেও এই সময় ভ্রমণ নিয়ে প্রচুর কাজ হতে থাকে।

"স্টার ট্রেক", "ব্যাক টু দ্যা ফিউচার", "সুপারম্যান ১", "প্রিডেস্টিনেশন"-এর মতো অনেক বিখ্যাত সিনেমা টাইম ট্রাভেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সুপারম্যান ১-এ সুপারম্যান যখন জানতে পারে যে লোইস লেন মারা গিয়েছে, তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় সময়ের পথ ধরে সে পেছনে চলে যাবে ও তাকে উদ্ধার করবে। প্রথমে সে পৃথিবীর চারদিকে প্রচুর বেগে ঘুরতে শুরু করে, যে পর্যন্ত না আলোর বেগের থেকে বেশি বেগ অর্জন করা যায়। সুপারম্যান তার বেগ বাড়াতেই থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর থেকে ধীর হতে থাকে। এক সময় পৃথিবী সম্পূর্ণ থেমে যায়। আর বেগ আলোর বেগকে ছাড়িয়ে গেলে পৃথিবী উল্টো দিকে ঘুরতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ উল্টো দিকে ফিরে যায়, জোয়ারের পানি পেছনে ফিরে যেতে থাকে। এরপর অনেক কষ্টে সে অতীতের সময় থেকে লেনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সম্প্রতি ক্রিস্টোফার নোলানের নির্মিত 'ইন্টারস্টেলার' মুভিতেও সময় ভ্রমণ দেখানো হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সময়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

জানার পরিমাণ সসীম, আর অসীম অজানা; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা দাড়িয়ে আছি ব্যাখ্যার অতীত অবস্থার এক অসীম মহাসমুদ্রের মধ্যে, এক ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর। প্রত্যেক প্রজন্মে আমাদের কাজ হলো আরও কিছুটা ভূমি বৃদ্ধি করা।

–থমাস হাক্সলি

প্রাচীনকালের মানুষেরা রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। এই যে পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ ভরা বিস্ময়, এর শুরু হয়েছিল কখন? আসলেই কি এর কোনো শুরু আছে, নাকি চিরন্তন এই মহাবিশ্ব? আদিকাল থেকে মানুষ এই মহাবিশ্বকে চিরন্তন ভেবে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভাবত, এই মহাবিশ্ব বুঝি চিরকালই ছিল। আর তার কোনো এক পর্যায়ে মানুষের মতো প্রাণীরা এই পৃথিবীর বুকে বাস করা শুরু করেছে। প্রাচীন দার্শনিকরাও এই মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন। অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ – খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২) তার "Meteorology" -এর ১২তম অধ্যায়ে যুক্তি দেখিয়েছেন- সময় কখনো থেমে থাকে না, আর এই মহাবিশ্বও চিরন্তন। অর্থাৎ তিনি ভাবতেন, সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই। যখন কিছু ছিল না তখনো সময় ছিল; আর এই বিশ্বজগতের পরিণতি যাই হোক না কেন, সময়ের মতো সময় বয়েই চলবে। অ্যারিস্টটল ছিলেন তার সময়ের সব থেকে প্রভাবশালী দার্শনিক। তিনি এমনই প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন যে, তার মৃত্যুর প্রায় ২০০০ বছর পর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার মতই মানুষ মেনে নিয়েছিল। অ্যারিস্টটল ছাড়া তার সমসাময়িক এপিকুরাসও (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১- খ্রষ্টপূর্ব ২৭০) একই রকম মতামত দিয়েছেন। এসব দার্শনিকদের মতে স্থান এবং সময় দুটোই ছিল পরম।

BanglaBook.org

আসলে প্রাচীনকালের দার্শনিকদের কাছে সময় ছিল এক রহস্যের নাম। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদ সময়ের রহস্য ভেদ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাননি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে সময় এক অতিপ্রাকৃত বিষয়। আর সেসব দার্শনিক আরও গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন, তারাও একটি নিশ্চিত উত্তর খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে একটা সময় তাদের ধারণা হয়েছিল যে, সময় সম্ভবত মানুষের মস্তিষ্কের একধরনের উপলব্ধি। এরপর অনেক সময় চলে গেছে; দর্শনের আধিপত্য শেষ হয়েছে। এখন আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা ঘড়ি দিয়েই সময়কে বুঝে নেই। কিন্তু সময় তো আর ঘড়ির উপর নির্ভর করে চলে না। ঘড়ির কাটা থেমে থাকলেও সময় বয়েই চলে। অনেক ক্ষেত্রে ঘড়ির এক ঘণ্টা পার হলেও আমাদের কাছে মনে হয় যেন এক ঘণ্টার অনেক বেশি সময় চলে গেছে! আবার অনেক ক্ষেত্রে এর উল্টোটিও ঘটে। আসলে, সময় একটি ব্যক্তি নিরপেক্ষ জিনিস হলেও আমরা আমাদের মস্তিষ্কের সাহায্যেই সময়কে অনুভব করে থাকি। ফলে সময় নিয়ে সঠিক ও পরিপূর্ণ ধারণা পেতে হলে শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করলেই চলে না। পাশাপাশি শারীরতত্ত্ব, স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের ওপরও নির্ভর করতে হয়। আর পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে খুব কম কথায় সময় বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করাও বেশ কঠিন। তাই সময়ের সঠিক বিশ্লেষণের জন্য এর ভৌত রূপের (পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে) পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও (শারীরবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে) জানার প্রয়োজন রয়েছে।

BanglaBook.org

পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময়

যদি প্রশ্ন করা হয় সময় কী? তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর উত্তর কী হবে? হয়তো বলা যেতে পারে, এটি একটি ভৌত রাশি। কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় যেসব রাশিকে দরকার হয় এবং সেটাকে পরিমাপ করা যায়, তাকে ভৌত রাশি বলা হয়। যেমন তাপমাত্রা। সময়ও তাপমাত্রার মতো একটি ভৌত রাশি। কিন্তু তাপমাত্রাসহ অন্যসব রাশির

সাথে সময়ের একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ভর, তড়িৎ প্রবাহ, দীপন ক্ষমতা ইত্যাদিকে আমরা মাপার পাশাপাশি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরতে, ছুঁতে ও অনুভব করতে পারি। যেমন- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাকে দেখা যায়, স্কেল দিয়ে মাপা যায়। কোনো বস্তুকে হাত দিয়ে তুলে আমরা তার ভর অনুভব করতে পারি। তাপমাত্রা ও তড়িৎ প্রবাহের সংস্পর্শে এসে অনুভব করতে পারি (তাই বলে তড়িৎ প্রবাহ অনুভব করতে যাওয়াটা নিশ্চয় বোকামি হবে!)। অর্থাৎ সব ভৌত রাশিকেই পরিমাপের পাশাপাশি ত্বক, চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়। কিন্তু সময়কে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার সাহায্যেই অনুভব করতে হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করার কোনো উপায় নেই। অন্য সব ভৌত রাশির সাথে এখানেই সময়ের পার্থক্য।

সময় যে বয়ে চলেছে এটি আমরা বুঝতে পারি পরিবর্তন বা গতির সাহায্যে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘোরার কারণে রাত-দিন হয়। আমরা বুঝতে পারি সময় বয়ে চলেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঘড়িতে যে সময় মাপা হয় সেটিও কিন্তু গতির সাহায্যেই।

আদিকালের ঘড়িগুলোতে এই বিষয়টি খুব ভালোমতো বোঝা যেত। সূর্যঘড়িতে ছায়ার পরিবর্তন থেকে সময় মাপা হতো। জলঘড়ি বা বালিঘড়িতেও এই পরিবর্তনের বিষয়টি সরাসরি দেখা যেত। এসব প্রাকৃতিক ঘড়ির পরে আবিষ্কার করা হয় যান্ত্রিক ঘড়ি। এসব ঘড়িতেও কোনো একটি দণ্ড বা দোলকের পর্যায়কালকে ব্যবহার করেই সময় মাপা হতো।

এরপর আসে আণবিক ঘড়ি। একটি ক্রিস্টাল অণুর কম্পনের হারকে ব্যবহার করে আণবিক ঘড়িতে সময় মাপা হয়। পারমাণবিক ঘড়িতে মাপা হয় পরমাণুর কম্পনের সাহায্যে। এক কথায়, গতি ছাড়া সময়ের প্রবাহকে মাপার কোনো উপায় নেই, এমনকি বোঝারও উপায় নেই। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় গতি কী? তাহলেই একটি দার্শনিক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবেন। কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বস্তুর সে সরণ হয়, সেটিই তার গতি। অর্থাৎ সময়ের ধারণা ছাড়া গতি পরিমাপের কোনো উপায় নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে সময়ের ধারণা ছাড়া গতিকে বোঝার উপায় নেই, আবার অন্যদিকে গতির সাহায্যেই সময়কে বুঝতে হচ্ছে। ফলে "গতি" ও "সময়" এই দুটি জিনিসকে এমনিতে খুব সাধারণ জিনিস

BanglaBook.org

মনে হলেও এদের মৌলিক রূপ বুঝতে চাইলেই এক রহস্যময় জট পাকিয়ে যায়। সময় যে একটি গোলমেলে জিনিস সেটি কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই মানুষের জানা ছিল। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সেন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন- 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে সময় কী? – মনে হয় জানি, কিন্তু উত্তর দিতে গেলেই বুঝতে পারি জানি না।'

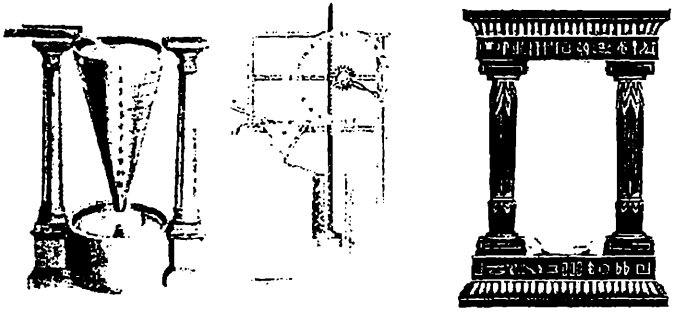

চিত্রঃ প্রাচীনকালে জলঘড়ি ও বালিঘড়ির সাহায্যে সময় মাপা হতো।

গতি থেকেই যে সময়ের ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছে, একথা প্রথম স্পষ্ট করেন বলেন অ্যারিস্টটল। তার ভাষায় 'সময় হলো গতির পরিমাপ।' কিন্তু গতিবিদ্যার (Dynamics) মৌলিক স্বীকার্য সম্পর্কে তার ধারণা ছিল একদম ভুল। তিনি ভাবতেন হালকা বস্তুর থেকে ভারী বস্তু বেশি বেগে পতিত হয়। অর্থাৎ সময় সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণাকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। অ্যারিস্টটলের পরে গতিবিদ্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন ইতালিয়ান জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি পরীক্ষা করে দেখান যে অ্যারিস্টটলের ধারণা ভুল। পাশাপাশি তিনিই প্রথম বলেন গতিবিদ্যায় বস্তুর দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষেত্রে বেগটিই শুধু গুরুত্বপূর্ণ না, সময়ের সাথে কী হারে বেগ পরিবর্তন হচ্ছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই গ্যালিলিওর হাত ধরে প্রথম পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় ত্বরণের ধারণা প্রবেশ করে।

গ্যালিলিও ত্বরণ ও সময়কে বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেও বলবিদ্যা শুরু হবার আগ পর্যন্ত স্থান, সময়, ত্বরণ এসবের গুরুত্ব ভালোমতো বোঝা যায়নি। বলবিদ্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল, এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিউটনের আগে 'স্থান' ও 'সময়' এই দুটোকেই পরম বলে ভাবা হতো। কিন্তু নিউটন তার মহাকর্ষ তত্ত্ব ও গতির

BanglaBook.org

সূত্র আবিষ্কার করার পর আমাদের পরম স্থানের ধারণা ত্যাগ করতে হয়েছে।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন- বস্তুপিণ্ডগুলোর স্থিত অবস্থাই পছন্দ। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বল প্রয়োগ না করে তাহলে কোনো বস্তু সারা জীবন এই স্থির অবস্থায়ই থেকে যাবে, পাশাপাশি গতিশীল বস্তুও স্থিতিশীল অবস্থায় আসতে চায়। আর নিউটনের তত্ত্বের পার্থক্যটি ঠিক এখানেই। নিউটনের তত্ত্ব থেকে জানা যায় কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু চিরকাল চলতেই থাকবে; আর স্থির বস্তু চিরকাল স্থিরই থেকে যাবে। এই তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল স্থিতির কোনো পরম মানই আসলে নেই।

স্থিতির কোনো পরম মান না থাকার বিষয়টি নিউটনকে খুব অস্বস্তিতে ফেলেছিল। এসব নিয়ে নিউটন একটু অস্বস্তিতে থাকলেও বিষয়টি কিন্তু বেশ মজার। কেননা, স্থিতির যদি কোনো পরম মান না থাকে তাহলে কে 'স্থির' আর কেই' বা 'গতিশীল' কোনভাবেই বলা সম্ভব না !! ধরুন একটি লোক রাস্তার পাশে দাড়িয়ে আছে, আরেকটি লোক একটি নির্দিষ্ট বেগে তার দিকে সাইকেল চালিয়ে আসছে। এখন অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুসারে আমরা বলতে পারব, কোনো লোকটি স্থির আর কোনো লোকটি চলমান। আমাদের উত্তর হবে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি স্থির, আর সাইকেল চালিয়ে আসা লোকটি চলমান। কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে এভাবে নির্দিষ্ট করে বলার কোনো উপায় নেই। বলতে হবে দাঁড়ানো লোকটির সাপেক্ষে সাইকেলের লোকটি চলমান অথবা সাইকেলের লোকটির সাপেক্ষে দাঁড়ানো লোকটি চলমান। একি আজব কথা! শুনতে আজব শোনালেও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন নিউটনের তত্ত্বই সঠিক।

নিউটনের তত্ত্ব সঠিক কিনা তা খুব সহজে একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। আমরা যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনকে বিবেচনায় না আনি, তবে পৃথিবীর উপর একটি ট্রেনের গতিকে দুইভাবেই বলতে পারি। এক. পৃথিবী স্থির আর রেললাইনের উপর দিয়ে একটি ট্রেন পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে, অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে ট্রেনটি স্থির আর পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ছুটে চলেছে। এখন ট্রেনের ভেতর যদি কেউ কোনো গতিশীল বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তবে দেখা যাবে নিউটনের সূত্রগুলো ট্রেনটির ভেতরেও প্রযোজ্য। যেমন ট্রেনের একটি টেবিলের উপর যদি কেউ একটি পিংপং বল নিয়ে খেলে, তাহলে দেখা যাবে ট্রেনের

BanglaBook.org

বাইরের থাকা একটি টেবিলের উপরে এটি যেমন আচরণ করত এখানেও একই আচরণ করছে। ফলে রেলগাড়িটি চলছে নাকি পৃথিবী চলছে সেটি বলার কোনো উপায় নেই।

স্থিতির কোনো পরম মান না থাকলে কিন্তু আরও একটি সমস্যা হবে। যেমন ট্রেনের ভেতর দুটি ঘটনা যদি ভিন্ন সময়ে ঘটে, তবে ঘটনাগুলো ঠিক কোথায় ঘটেছে এ বিষয়েও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না। পিং বলটি যখন টেবিলের উপর থেকে লাফিয়ে এক সেকেন্ড পর টেবিলে ধাক্কা খাবে, তখন ট্রেনের বাইরে থাকা কোনো লোকের মনে হবে- বল দুটো ধাক্কা খেয়েছে ৩০ বা ৪০ মিটার ব্যবধানে। কারণ এই এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ট্রেনটি ৩০ মিটার দূরে সরে যাবে। কিন্তু ট্রেনে থাকা কারও মনে হবে যেন ধাক্কাটি একই স্থানে হয়েছে। কারণ সে লক্ষ করবে ধাক্কার স্থানটি টেবিলের একই বিন্দুতে হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, পরম স্থিতি বা পরম স্থানের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। নিউটন ছাড়াও বিসপ বার্কেলে নামে একজন অ্যাংলো-আইরিশ দার্শনিক নিউটনের মতো কোনো গাণিতিক পদ্ধতি ছাড়াই স্থানের পরম ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

নিউটনের আবিষ্কারের পর, স্থানের পরম ধারণা বাতিল হয়ে গেলেও সময়কে তখনও পরম বিবেচনা করা হতো। অর্থাৎ সময়ের কোনো আদি-অন্ত নেই। যখন কোনো কিছু ছিল না, তখনো সময় ছিল। আবার যদি কখনো সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় তবুও সময়ে একইভাবে বয়ে চলবে। পরম সময়ের আরেকটি অর্থ হলো সময় সব ক্ষেত্রেই, সব স্থানেই একই গতিতে বয়ে চলে। পৃথিবীতে এক সেকেন্ড অতিবাহিত হলে মহাবিশ্বের যেকোনো প্রান্তের জন্যও ঠিক এক সেকেন্ড অতিবাহিত হবে। সময়ের গতি যদি এমন হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সময় ভ্রমণ করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে!

পরম সময় নিয়ে প্রাচীনকালেই কিছু দার্শনিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কিছু কিছু দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন যে– সময় যদি পরম হয়, অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে অসীম কাল বলে কিছু থেকে থাকে, তবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে সৃষ্টিকর্তা কেন অসীম কাল অপেক্ষা করেছিলেন? আজ থেকে হাজার বছর আগে আসলে এসব প্রশ্নের কোনো সমাধান সম্ভব ছিল না।

এসব দার্শনিক প্রশ্ন ছাড়া কিছু আধা-বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও উঠেছিল। অনেকে বলেছিলেন গতি ছাড়া যেহেতু সময়কে বোঝার উপায় নেই; আর পরম গতি বলেও কিছু নেই। তাহলে পরম সময় বলে কিছু আছে কি? নাকি সময় নিজেও আপেক্ষিক?

BanglaBook.org

তবে আমাদের সাধারণ জ্ঞান বলে মহাবিশ্ব যদি ধ্রুব আর পরম বলে কিছু থেকে থাকে, তবে তা সময়ই হবে। স্থানের পরম ধারণা নিয়ে অনেকে সন্দেহ পেষণ করলেও, কোনো বিজ্ঞানী কোনদিন সময়ের পরম ধারণা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু সবাই তো আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া বিজ্ঞানী না। আলোর বেগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নামে সুইস পেটেন্ট অফিসের এক কেরানি, যুগান্তকারী এক আবিষ্কার করে ফেললেন! শেষ পর্যন্ত আমাদের পরম সময়ের ধারণা ত্যাগ করতেই হলো।

সেই ছোটবেলা থেকেই আইনস্টাইনের আলো নিয়ে অনেক কৌতূহল ছিল। ছোট্ট আইনস্টাইন ভাবতেন, যদি একটি আলোক রশ্মিকে ধরে ফেলা যায়, তাহলে সেটি দেখতে কেমন হবে? অথবা যদি একটি আলোর তরঙ্গের সাথে সমান গতিতে ছোটা যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাব? একটি স্থির তরঙ্গ? আমরা যদি একটি বাস বা ট্রেনের সাথে একই গতিতে ছুটতে শুরু করি, তাহলে পাশের ট্রেনের মানুষ, চেয়ার, টেবিল কোন কিছুকেই আমরা চলমান দেখব না। ঐ ট্রেনের সবকিছুকেই আমাদের স্থির মনে হবে। তেমনি আইনস্টাইন ভেবেছিলেন, যদি একটি আলোর তরঙ্গের সাথে এভাবে তাল মিলিয়ে চলা যায়, তাহলে সম্ভবত এক সারি লম্বা স্থির আলোর তরঙ্গ দেখা যাবে। আইনস্টাইনের বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর, তখনই তিনি বুঝতে পারেন এই চিন্তায় কিছু একটা গলদ আছে। পরবর্তীতে তিনি তার এক লেখায় বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

"After ten years of reflection such a principle resulted from a paradox up on which I had already hit at the age of sixteen: If I pursue a beam of light with the velocity c (velocity of light in a vacuum) I should observe such a beam of light as a spatially oscillatory electromagnetic field at rest. However, there seems to be no such thing, whether on the basis of experience or according to Maxwell's equations.

আইনস্টাইন কলেজে পড়ার সময় জানতে পারলেন, আলোকে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যেই প্রকাশ করা যায়। আর এই ক্ষেত্র দুটি ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণগুলো মেনে চলে। আইনস্টাইন ভাবলেন, আলোকে ভালোমতো বোঝার জন্য এর থেকে ভাল আর উপায় আর কিই বা হতে পারে!

তিনি তখন ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। দেখা গেল তার ধারণাই ঠিক। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ সেরকম কোনো স্থির

BanglaBook.org

তরঙ্গ অনুমোদন করে না। তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আলোর কোনো স্থির তরঙ্গের সারি দেখা মানে একটি তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রকে স্থির দেখা। অর্থাৎ এরকম কোনো কিছু বাস্তবে ও ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ কোনোটিতেই সম্ভব নয়।

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক সমীকরণে আলোর বেগ ছিল একটি ধ্রুবক। অর্থাৎ এটির কোনো পরিবর্তন হবে না। ম্যাক্সওয়েল নিজে এই ধ্রুবকের মান কত হবে তা নিজেই গণনা করে বের করেছিলেন। তিনি হিসেব করার পর দেখতে পেলেন, অবিশ্বাস্যভাবে এটি আলোর বেগের সমান। এ থেকেই তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন আলো আর কিছু নয়, এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে আলোর বেগ সব সময় একই থাকবে। আমরা কত বেগে ছুটছি সেটি কোনো বিষয় না। আলোর পেছনে আমরা যত দ্রুতই ছুটি না কেন, একে আমরা একই বেগে চলতে দেখবে। কিন্তু এ কী করে সম্ভব?

ধরুন আপনার সামনে একটি ট্রেন আলোর বেগে চলছে। ধরলাম আলোর বেগ ১০০ কি.মি./ঘণ্টা। এখন আমরা যদি এই ট্রেনের পেছনে ৯৮ কি.মি./ঘণ্টায় ছুটি তাহলে আমাদের কাছে মনে হবে এটি ঘণ্টায় ২ কি.মি. বেগে ছুটছে। এটাই স্বাভাবিক, এরকমই আমরা দেখে আসছি। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বলছে আমরা ৯৮ কি.মি. বেগে ছুটার পরও আমরা দেখতে পাব এটি এখনো সেই ১০০ কি.মি. বেগেই ছুটছে। কিন্তু এটি তো পুরোপুরি নিউটনের গতিসূত্রের লঙ্ঘন।

নিউটনের গতিসূত্র অনুসারে কোনো কিছুর বেগকেও অন্য যেকোনো রাশির মতো যোগ-বিয়োগ করা যায়। যদি কেউ আমার দিকে ৫ কি.মি. বেগে আসতে থাকে আর আমি তার দিকে ২ কি.মি. বেগে যেতে থাকি, তাহলে আমার কাছে মনে হবে সে আমার দিকে (৫+২)=৭ কি.মি. বেগে আসছে। আবার ধরি কেউ আমার সামনে ১০ কি.মি. বেগে ছুটছে, আর আমি তার পেছনে ৮ কি.মি. বেগে ছুটছি, তাহলে আমার মনে হবে সে আমার থেকে ২ কি.মি. বেগে সামনের দিকে যাচ্ছে। এবার কেউ যদি পাশাপাশি কোনো বাসে বা ট্রেনে একই বেগে চলে, তাহলে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী আমরা সেই বাসের সবকিছুই স্থির দেখব। আসলে বাস্তবে আমরা কিন্তু তাই দেখি। তবে আলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নিয়ম আর খাটছে না। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে দেখা যায়, আলোকে আমরা কখনোই ধরতে পারব না, কারণ আমরা যত দ্রুতই ছুটি না কেন সামনে তাকালে দেখা যাবে, এটি আমাদের সাপেক্ষে সেই আগের বেগেই চলছে। এ যেন এক

BanglaBook.org

ভুতের সাথে পাল্লা দেওয়া, আমরা যত জোরেই ছুটি না কেন সেই ভূতকে আমরা ধরতে পারব না।

এই বিষয়টিই আইনস্টাইনকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। আলোর ক্ষেত্রে কেন এমন হবে? আর যদি সত্যি এমনটা হয়, তার মানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অথবা নিউটনের সূত্র যেকোনো একটি ভুল আছে। কিন্তু এটি কী করে হতে পারে! নিউটনের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে পুরো এক শিল্প বিপ্লব ঘটে গেল। আর তাছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রদের গতি পর্যন্ত নিউটনের তত্ত্ব থেকে নিখুঁতভাবে হিসেব করে ফেলা যায়। নিউটনের তত্ত্ব ভুল হবার কথা চিন্তাও করা যায় না। আবার ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণও খুবই সফল। আইনস্টাইন কোনোভাবেই কিছু মেলাতে পারছিলেন না।

আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন আমরা প্রকৃতির এমন কিছু একটা জানি না, যার ফলে আমাদের মনে হচ্ছে নিউটন অথবা ম্যাক্সওয়েলের সূত্রে ভুল আছে। কিন্তু প্রকৃতির এই ধাঁধার একটা সমাধান তো অবশ্যই আছে। ১৯০৫ সালের কথা। আইনস্টাইন তখন বার্নের একটি পেটেন্ট অফিসে কেরানি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পেটেন্ট অফিসের কাজ শেষ হবার পরও তার হাতে প্রচুর সময় থাকত। এই সময়গুলোতে তিনি ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণগুলোকে খুব সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণাপত্র লিখলেন। সেখানে তিনি দেখান যে, স্থির বেগে চলমান যেকোনো কাঠামো থেকেই আলোর বেগ সমান পাওয়া যাবে। সকল কাঠামোর সাপেক্ষে আলোর গতি সমান এটি দেখানোর পাশাপাশি এই অবাস্তব ঘটনা কেন ঘটে তিনি তার ব্যাখ্যাও দেন। আর এই ব্যাখ্যা থেকেই তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব গঠন করেন।

প্রথমবার যখন তিনি আলোর বেগের এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন, তিনি নিজেও অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। কেননা এই ঘটনার শুধু একটাই সমাধান আছে; গতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সময় ধীর হয়ে যায়! সাধারণ মানুষ হয়তো কখনোই এমন অদ্ভুত কথা ভেবেও দেখবে না! কিন্তু আইনস্টাইন দেখতে পেলেন শুধু এই বিষয়টি ধরে নিলেই আলোর বেগের রহস্য সমাধান হয়ে যায়। আমরা যখন কোনো গাড়িতে দ্রুত বেগে ভ্রমণ করব তখন আমাদের গাড়ির ভেতরের সময় ধীর হয়ে যাবে। ফলে অতিক্রান্ত দূরত্বের হিসেব ঠিকই থাকবে।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করলে আরও ভালোমতো বোঝা যাবে। আমরা সবাই জানি, সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনকে বেগ বলে। কেউ যদি সেকেন্ডে

BanglaBook.org

১০ কি.মি. বেগে ১০ সেকেন্ড যায় তাহলে তার অতিক্রম করা দূরত্ব হবে ১০X১০=১০০ কি.মি.। এবার বেগ দুইগুণ বাড়িয়ে সেকেন্ডে ২০ কি.মি. করা হল। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বেগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের ঘড়ির সময় ধীরে চলবে। বেগ দ্বিগুণ করার ফলে আমাদের সময় অর্ধেক হয়ে যাবে; ১০ সেকেন্ডের জায়গায় ৫ সেকেন্ড। অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে ২০X৫= ১০০ কি.মি.। এবার আমরা বেগ আবারও দ্বিগুণ করে দিলাম; সেকেন্ডে ৪০ কি.মি.। ফলে সময় আরও ধীর হয়ে ২.৫ সেকেন্ড হয়ে যাবে। ফলে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে, ৪০X২.৫=১০০ কি.মি.। এভাবে বেগ যত বাড়ানো হবে সময় তত ধীরে চলবে। কিন্তু আমরা হিসেব করলে দেখতে পাব অতিক্রান্ত দূরত্ব ঠিকই আছে।

এখানে স্থান ও সময় আমাদের সাথে এক রহস্যময় খেলা খেলছে। বাস্তব পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আমরা যত দ্রুতই ভ্রমণ করি না কেন, আমাদের সাপেক্ষে আলোর বেগ সব সময় একই থাকবে। এটি ঘটছে কারণ, আমরা যত দ্রুত ভ্রমণ করছি আমাদের ঘড়ি তত ধীর হয়ে যাচ্ছে। আলোর বেগ অস্বাভাবিক রকম দ্রুত, সেকেন্ডে প্রায় ৩০০০০০ কি.মি., যা আমাদের পরিচিত যেকোনো কিছুর বেগের চাইতে অনেক গুণ বেশি। তাই বাস্তব জীবনে আমরা সময় ধীর হবার এই প্রভাব বুঝতে পারি না। যদি আলোর বেগের কাছাকাছি দ্রুততায় ভ্রমণ করা সম্ভব হতো, তাহলে সময় ধীর হবার এই প্রভাব আমরা বুঝতে পারতাম। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো; আমরা কিন্তু কখনোই সময় ধীর হবার বিষয়টি বুঝতে পারব না। কেননা আমরা যদি কোনো রকেটে খুব দ্রুত ভ্রমণ করি, তাহলে সেই রকেটের সব কিছুর সময়ই ধীর হয়ে যাবে। এমনকি আমাদের মস্তিষ্কের ঘড়িও ধীর হয়ে যাবে। মস্তিষ্কের ভেতর নিউরোট্রান্সমিটারের অণু-পরমাণুর গতিও ধীর হয়ে যাবে। আমাদের মস্তিষ্ক তখন চিন্তাও করবে ধীর গতিতে। ফলে আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই বুঝতে পারবে না সময় ধীর হয়ে গেছে। তবে আমরা যদি পৃথিবীতে থাকা কোনো ঘড়ির সাথে আমাদের ঘড়ি মিলিয়ে দেখি, তখন দেখা যাবে আমাদের ঘড়ির সময় ধীর হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ যদি কোনো শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে আমাদের রকেটের ভেতরটা দেখতে পায়, সে দেখতে পাবে আমাদের রকেটের ভেতরের সবকিছুই ধীর হয়ে গেছে, আমাদের হাত-পা চলার গতিও ধীর হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের চলাফেরার এই ধীর গতি আমরা বুঝতে পারব না। কারণ আমাদের দেহঘড়িও একই তালে চলবে।

BanglaBook.org

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেখা যায় এই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গতি হলো আলোর বেগ। আর এই বেগের কোনো তারতম্য হয় না। আমাদের সাধারণ জ্ঞান বলবে, কোনো কিছুর বেগ আবার সব ক্ষেত্রেই ধ্রুব হতে পারে নাকি, ধ্রুব যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা হবে সময়। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে দেখা যায় আমাদের সাধারণ জ্ঞানের কোনো দামই এখানে নেই। এক্ষেত্রে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের সাহায্য নিতে হবে। এই তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি, আলোর বেগের বিষয়টি প্রকৃতির একটি মূল নিয়ম, যা মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণা ও মহাবিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই প্রযোজ্য। কিন্ত সময় বিষয়টি একটি ব্যক্তিগত ধারণা। কে সময় পরিমাপ করছে তার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে সময় কীভাবে বয়ে চলবে।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ হবার পর বিজ্ঞানী মহলে হৈচৈ পড়ে যায়। অনেকেই সময় সম্পর্কে পরম ধারণা ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। তবে এই তত্ত্বের আবেদন শুধু বিজ্ঞানী মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আপেক্ষিক তত্ত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করার পর এ নিয়ে শত শত জনপ্রিয় ধারার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে এই তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞান ও বাস্তবতার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। এর ভেতর কিছু লেখায় তত্ত্বটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো সময়কে স্থান থেকে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় নেই। স্থানের তিনটি মাত্রা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মতো, সময়ও স্থানের একটি মাত্রা। স্থান ও কাল মিলেমিশে এক অভিন্ন সত্তা তৈরি হয়, তাকে বলা হয় স্থান-কাল। স্থান-কালের ধারণার পেছনের মূল বিষয়টি সে সময় খুব কম মানুষই অনুধাবন করতে পেরেছিল।

স্থান-কাল এক হয়ে যাওয়ায় এদের মধ্যে একটি প্রতিসাম্যতার সৃষ্টি হয়। এদের একটিকে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরিয়ে সহজেই আরেকটিতে পরিণত করা যায়। আমরা যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে ৯০ ডিগ্রি ঘুরাই তাহলে এর দৈর্ঘ্য প্রস্থে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর প্রস্থ, উচ্চতায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। একটি সাধারণ ঘূর্ণনের মাধ্যমে স্থানের কোনো মাত্রাকে অন্যটিতে পরিবর্তন করার স্বাধীনতা আছে। আর এখন সমস্ত স্থানের আরেকটি মাত্রা হবার কারণে এই চতুর্মাত্রিক সত্তাকে একটি নির্দিষ্টভাবে ঘুরিয়ে স্থানকে সময়ে, আর সময়কে স্থানে রূপান্তরিত করা যায়। এই নির্দিষ্ট চারমাত্রিক ঘূর্ণনের ফলে স্থান-কাল একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বিচ্যুত হওয়াটা বিশেষ

BanglaBook.org

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটি দাবি। অন্যভাবে বললে বলা যায়, বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছু নিয়ম মেনে স্থান-কাল পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। অনেকেই ভাবতে পারেন, সময়ও যেহেতু মহাবিশ্বের স্থান-কালের একটি মাত্রা তাই কোনো বস্তুকে যদি উল্টো করলে দৈর্ঘ্যকে, প্রস্থ বা উচ্চতায় পরিণত করা যায়, তবে সময়কেও বুঝি উল্টো করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, সময়কে কোনো বস্তুর মতো হাতে ধরে ঘুরানো যাবে না। তা করা গেলে আমরা ইচ্ছেমতো সময়কে উল্টে দিয়ে অতীত ভ্রমণ করতে পারতাম। শুধু নির্দিষ্ট গাণিতিক উপায়েই এই বিষয়টি করে দেখানো যায়। আর এই গাণিতিকভাবে করা বিষয়টিকে বাস্তবে করতে গেলে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ শক্তির। শুধু তাই না, এই শক্তি আমাদের চেনাপরিচিত শক্তির মতো নাও হতে পারে! সময়ের উল্টো দিকে চলতে গেলে আমাদের দরকার হয় বিশেষ ধরনের শক্তির।

৩০০ বছর আগে নিউটন ভেবেছিলেন সময় একদম পরম, অর্থাৎ মহাবিশ্বের সকল স্থানেই সময় একই হারে বয়ে চলেছে। আমরা পৃথিবী, চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহ যেখানেই থাকি না কেন সময় একটি ধ্রুব গতিতে চলতে থাকবে। আর স্থানের সাথে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেখা গেল, সময় সব ক্ষেত্রে ধ্রুব গতিতে চলে না, বরং আলোই একটি ধ্রুব গতিতে চলে। আলোর গতি সকল অবস্থায় সমান থাকবে, আর ঘড়ির কাঁটা কতটা দ্রুত চলবে তা নির্ভর করবে আমরা কতটা দ্রুত চলছি তার উপর। নিউটনের ধারণায় সময়ের সাথে স্থানের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থান ও সময় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

উপরে বেগ বৃদ্ধি পাবার ফলে সময় ধীর হবার যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছিল সেটি কিন্তু সঠিক না। শুধু বোঝার সুবিধার্থে গাড়ির বেগের বিষয়টি দেখানো হয়েছিল। সময় ধীর হবার আপেক্ষিক প্রভাব সবচেয়ে ভালোমতো বোঝা যায় আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি রকেটগুলোর বেগ কিন্তু খুব বেশি না। কিন্তু আমরা যখন আলোর বেগের ৯০%-এর কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করার মতো রকেট তৈরি করতে পারব তখন সেগুলো মাপতে আর সূক্ষ্ম ঘড়ির দরকার হবে না। নিচে আলোর বেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সময় কতটা ধীর হয়ে যায় তা দেখানো হলোঃ

আলোর বেগের ৮৭%	সময় ২ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৫%	সময় ৩ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৭%	সময় ৪ গুণ ধীর হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

আলোর বেগের ৯৮% সময় ৫ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৯% সময় ৭ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৯.৯% সময় ২২ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৯.৯৯% সময় ৭০ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৯.৯৯৯৯% সময় ৭০৭ গুণ ধীর হয়ে যাবে।
আলোর বেগের ৯৯.৯৯৯৯৯৯% সময় ৭০৭১ গুণ ধীর হয়ে যাবে।

এখন ধরা যাক আমরা এমন একটি রকেট তৈরি করতে পেরেছি যা আলোর বেগের ৯৯.৯৯% দ্রুততায় ভ্রমণ করতে পারে। যদি কেউ এই রকেটে চরে এক বছর কাটিয়ে আসে তাহলে আমরা আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাব বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারব। ধরে নিলাম কয়েক দিন আগে আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আপনি চাচ্ছেন কিছুদিন একটু দ্রুতগামী রকেটে করে একটু মহাকাশ ভ্রমণ করে আসলে মন্দ হয় না। আপনি একটি রকেটে করে আলোর বেগের ৯৯.৯৯% দ্রুততায় ১ বছর মহাকাশে ভ্রমণ করে এলেন। ফিরে এসে কী দেখবেন? যা দেখবেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। আপনি রকেটের ভেতর থাকায় আপনার বয়স মাত্র এক বছর বেড়েছে, কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে কেটে গেছে ৭০টি বছর। ফিরে এসে আপনার বেশিরভাগ সহপাঠীকেই আর জীবিত পাওয়া যাবে না। আর যারা বেঁচে আছে তারা এতটাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে যে আপনি তাদের চিনতেই পারবেন না। তাই এরকম মহাকাশ ভ্রমণ না করাই ভালো !

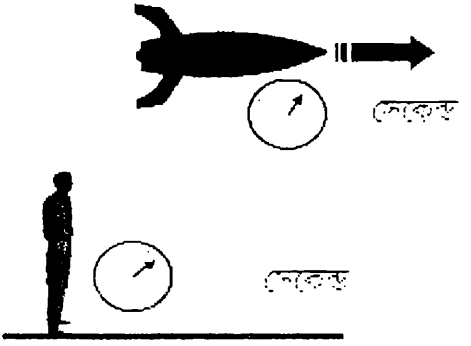

চিত্রঃ গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে সময় ধীর হয়ে যায়

সময় ধীর হবার বিষয়টি কিন্তু শুধু মানুষ বা সচেতন প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এই মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তুকণিকার জন্যই প্রযোজ্য। যেমন মিউওন কণিকার কথাই ধরা যাক। মিউওন খুবই অস্থায়ী

একটি কণিকা, গড় আয়ু ২.২ মাইক্রোসেকেন্ড। এক সেকেন্ডের দুই লক্ষ্য ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই এর উৎপত্তি ঘটে আবার ধ্বংসও হয়ে যায়। তাই মহাকাশ থেকে (বায়ুমণ্ডলে এসে উৎপন্ন হয়) যখন কোনো মিউওন কণিকা পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেটি খুবই আশ্চর্যজনক লাগে। কেননা এই কণিকাগুলো যদি আলোর বেগের খুব কাছাকাছি বেগেও ছুটে, তবুও ৭০০ মিটার পার হবার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছানোটা একদম অসম্ভব। কিন্তু মিউওন যেহেতু আলোর বেগের খুব কাছাকাছি বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে, তাই আপেক্ষিকতা বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে মিউওনের নিজের সময় প্রায় ৩০ গুণ ধীর হয়ে গেছে। তাই আমাদের ঘড়ির হিসেবে মিউওন কণিকার পৃথিবীতে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে ধ্বংস হবার কথা থাকলেও, মিউওনের নিজের ঘড়িতে তখনো ২.২ মাইক্রোসেকেন্ড পার হয়নি।

আবার তেজস্ক্রিয় কোনো পদার্থের কথাই ধরা যাক। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য হলো একটি নিদিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরমাণুর ক্ষয় হয়। এবার যদি কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে মহাকাশযানে করে এক বছর ঘুরিয়ে আবার পৃথিবীতে ফেরত আনা হয়, তবে দেখা যাবে, এই মহাকাশযানে থাকা অবস্থায় এক বছরে যে পরিমাণ পরমাণু ক্ষয় যাবার কথা ছিল তার থেকে অনেক কম পরিমাণ পরমাণু ক্ষয় গিয়েছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এই সময় ধীর হবার বিষয়টি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনকি অণু-পরমাণুর ভাঙন বা কোনো কণিকার গড় আয়ুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে সময় ধীর হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের পর আইনস্টাইন এমন এক তত্ত্ব গঠন করেন যার ফলাফল আরও বেশি অদ্ভুত। সেই তত্ত্ব থেকে দেখা যাবে সময় শুধু ধীরই হয় না, এমনকি বেঁকেও যেতে পারে; ঘুরপাক খেতে পারে!!

আলোর বেগের সমস্যা নিয়ে কাজ করার পর আইনস্টাইন মহাকর্ষ বল নিয়ে কাজ করতে চাইলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মহাকর্ষ বল কেন কাজ করে তা খুঁজে বের করা। কিন্তু এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আবারও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললেন। তার গণনা থেকে বোঝা গেল, স্থানকে(মহাশূন্য) আমরা যেমন সমতল বলে ভাবি বিষয়টি আসলে মোটেই তেমন না। বরং স্থান হলো বক্র। আর স্থানের এই বক্রতার কারণেই মহাকর্ষ বলের উৎপত্তি ঘটে।

স্থানের বক্রতাকে সহজে বোঝার জন্য স্থানকে (মহাশূন্য) একটি পাতলা চাদরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা যদি এই চাদরের উপরে একটি ভারী পাথরকে রাখি তাহলে চাদরের মাঝের জায়গাটি বিকৃত হয়ে

BanglaBook.org

যাবে। এখন চাদরে যত ভারী পাথর চাপানো হবে, চাদরের বক্রতাও তত বেড়ে যাবে। ফলে এই চাদরের উপর কোনো বস্তুর চলার পথও একটি বাঁকা পথ হয়ে যাবে। এখন কোনো বস্তুকে চাদরের উপর ছেড়ে দিলে সেটি পাথরের দিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে চাইবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে ভারী পাথরটি যেন বস্তুটিকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু আসলে এটি কোনো আকর্ষণ নয়, বরং চাদরের বক্রতার কারণেই এটি বস্তুটিকে ভারী পাথরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের গণিত বলছে এটি কোনো বল নয়, বরং চাদরের বক্রতার কারণেই এই বলের উদ্ভব হচ্ছে। তেমনি স্থান-কালের বক্রতার কারণেই বস্তুগুলো একে অপরের দিকে আকর্ষিত হয়। কারণ প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্রই এভাবে তার চারপাশের স্থানকে বাঁকিয়ে দেয়। নিউটন এই আকর্ষণের নাম দিয়েছিলেন মহাকর্ষ। কিন্তু কেন এই টান কাজ করে তা তিনি বলতে পারেননি। মহাকর্ষ বল কেন কাজ করে, আইনস্টাইন তার রহস্য উদঘাটন করে ফেললেন। আশ্চর্য বিষয় হলো, স্থানের এই বক্রতা এমনকি আলোকেও বাঁকা পথে চলতে বাধ্য করে।

এই চাদরের বক্রতার বিষয়টি আমাদের সৌরজগতের সাথে তুলনা করা যাক। সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। আর সূর্য তার বিশাল ভরের কারণে তার চারপাশের স্থানকে বাঁকা করে দিয়েছে। ফলে আশেপাশের গ্রহগুলো সূর্যের প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করছে। আর এই আকর্ষণ নিউটনের ব্যস্তবর্গীয় নিয়ম মেনে চলার ফলে, প্রতিটি গ্রহই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ দিয়ে সূর্যের চারদিকে ভ্রমণ করে চলেছে।

সূর্যের মতো পৃথিবীও তার চারপাশের স্থানকে প্রতিনিয়ত বাঁকিয়ে চলেছে। আর সে কারণেই আমরা পৃথিবীর সাথে মাধ্যাকর্ষণের টান অনুভব করি। এই বক্রতা না থাকলে আমরা মহাশূন্যে ছিটকে যেতাম।

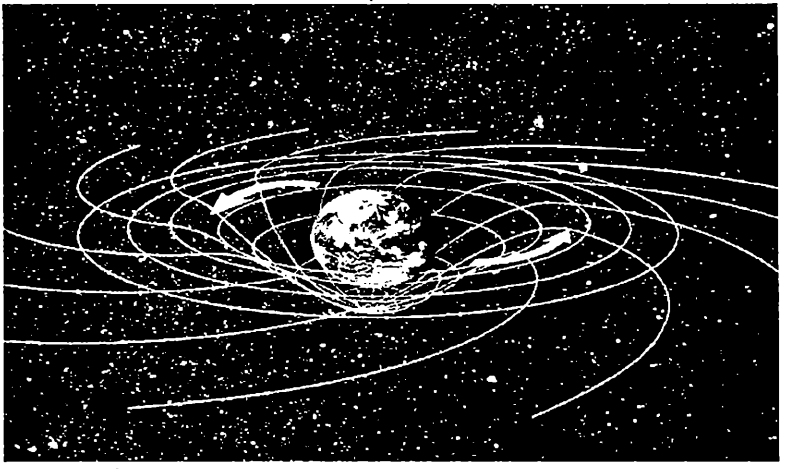

চিত্রঃ পৃথিবী তার ভরের কারণে চারপাশের স্পেস-টাইমকে বাঁকিয়ে চলেছে।

এখন লক্ষ করুন, বিশেষ তত্ত্ব থেকে আমরা জেনেছিলাম যে স্থান ও সময় মূলত একই সত্তা। ফলে স্থান ছাড়া সময় চিন্তাও করা যায় না। তাই স্থানের বক্রতার কারণে একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটে, তা হলো স্থান যদি বেঁকে যায় তবে সময়ও বেঁকে যাবে।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বকে ম্যাচেস প্রিন্সিপল (Mach's Principle) নামে একটি নীতির সাহায্যে সামারাইজ করা যায়। উপরে একটি উদাহরণে আমরা দেখেছিলাম, চাদরের উপর যত ভারী পাথর চাপানো যায়, চাদরের বক্রতাও তত বেশি হয়। তেমনি আইনস্টাইনের তত্ত্বকে সামারাইজ করে বলা যায়, ভর-শক্তির উপস্থিতি তার চারপাশের স্থান-কালের বক্রতা নির্ধারণ করে। আইনস্টাইন দেখালেন, স্থান-কালের বক্রতা সরাসরি ভর-শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

আইনস্টাইনের সমীকরণকে নিচের মতো করে লেখা যায়:

ভর-শক্তি -------->> স্থান-কালের বক্রতা

এই স্থান-কালের বক্রতার দ্বারা সবকিছুই প্রভাবিত হয়। সামান্য আলোক রশ্মি থেকে শুরু করে, মহাবিশ্বের সব বস্তু। এর আগে আমরা দেখেছিলাম, গতি বৃদ্ধির ফলে সময় ধীর হয়ে যায়। কিন্তু শুধু গতি বৃদ্ধির কারণেই যে সময় ধীর হয় তা কিন্তু না। কোনো বস্তুর মহাকর্ষ বলও সময়কে ধীর করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- পৃথিবীর ভর সূর্যের থেকে অনেক কম। ফলে পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের মহাকর্ষ বল অনেক বেশি। তাই আমরা যদি পৃথিবীতে অবস্থান করি তবে আমাদের সময় যেভাবে বয়ে চলবে সূর্যের ক্ষেত্রে আরও ধীরে চলবে। কেননা, সূর্যের মহাকর্ষ বল সময়কে ধীর করে দেবে।

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সময় ধীর হবার এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে আমরা জিপিএস (Global Positioning System) তৈরি করতে পেরেছি। জিপিএস মূলত একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করে থাকে। ধরুন আপনি আপনার স্মার্ট-ফোনের জিপিএস ব্যবহার করে আপনার অবস্থান জানতে চাচ্ছেন। এখন আপনার এই অবস্থান নির্ণয়ের কাজটি মূলত করা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে। আমরা জানি- পৃথিবীর মহাকর্ষ বল সব থেকে বেশি থাকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে বা নিচে যাওয়া যাবে এই বল তত কমতে থাকবে। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে অনেক উচ্চতায় অবস্থিত। তাই সেখানের মহাকর্ষ বল

BanglaBook.org

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কিছুটা কম। ফলে সেখানে সময়ের প্রবাহও কিছুটা দ্রুত। তাই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আপনার অবস্থান নির্ণয় করার জন্য যদি এই সময়ের ধীর হবার প্রভাব বিবেচনায় আনা না হয়, তবে আপনার সঠিক অবস্থান পাওয়া যাবে না। আইনস্টাইন যদি তার তত্ত্ব আবিষ্কার না করতেন, তাহলে জিপিএসের সাহায্যে নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হতো না। কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে আমাদের পৃথিবীর সময়ের ব্যবধান কিন্তু খুব সামান্য। কিন্তু আমরা যদি এই সামান্য প্রভাবকে গণনায় না ধরি তবে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যাবে না। সময়ের এই প্রভাব গণনায় না ধরলে জিপিএসের হিসেবে ১২ কিলোমিটার এদিক-ওদিক হয়ে যেত!

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে, সময় মূলত এক ধরনের নদীর মতো। নদী যেমন কোথাও ধীরে চলে, আবার কোথাও দ্রুত চলে তেমনি। স্থান-কালের বক্রতার ফলে আরও একটি মজার বিষয় ঘটে। স্থান-কালের বক্রতা যদি অনেক বেশি হয় তখন নদীর পানিতে যেমন ঘূর্ণি তৈরি হয়, স্থান-কালের বক্রতার ফলেও এমন ঘূর্ণি তৈরি হতে পারে। ফলে এমন ঘূর্ণিযুক্ত স্থানে ইচ্ছে করলেও সোজা চলা যাবে না, সময়ও যে শুধু সামনের দিকেই প্রবাহিত হবে এমনও বলা যায় না। আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে দেখা যায়, মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সময় ধীর হয়ে যায়, বেঁকে যায়, এমনকি নদীর পানিতে যেমন ঘূর্ণি তৈরি হয় তেমনি সময়ও ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ হতে পারে। তবে সময় ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হলেও সময় কখনো থেমে যাবে না। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণ তা অনুমোদন করে না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সময় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিলেও, কিছু ধোঁয়াশা এখনো রয়েই গেছে। ভাবছেন এ আবার কেমন কথা? ব্যাখ্যা যদি স্পষ্টই হয়, তবে ধোঁয়াশার কথা আসছে কেন! তাহলে একটু খোলাসা করেই বলি। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে সবকিছুর মূলে আছে চারটি মৌলিক বল। আমরা এই চারটির মধ্যে তিনটি বলের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু মহাকর্ষ বলের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখনো সফল না। সমস্যা হলো মহাকর্ষ বলকে কোয়ান্টানাইজ করতে গেলে তো সময়কে কোয়ান্টানাইজ করতে হবে (কারণ মহাকর্ষের সাথে সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত)। তাই একটি পরিপূর্ণ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির (মহাকর্ষ বলের কোয়ান্টাম তত্ত্ব) তত্ত্ব ছাড়া সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ বলা চলে না। তাই এখনো অল্প কিছু ধোঁয়াশা রয়েই গেছে।

BanglaBook.org

সময় বাতিলের প্রস্তাব

এমনিতে সময়ের কিছু বৈশিষ্ট্য একদম অপরিবর্তনীয়। আমরা না চাইলেও সময় তার গতিতে বয়ে চলে। অর্থাৎ একরকম বাধ্য হয়ে আমাদের সময়ের

স্রোতে বয়ে চলতে হয়। স্থানের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। স্থানে আমরা ইচ্ছে করলে চলতেও পারি আবার স্থিরও থাকতে পারি। কিন্তু সময়ের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার কোনো দাম নেই। মহাবিশ্ব সম্পর্কিত এই ধারণায় সময় মহাবিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

কিন্তু অনেক দার্শনিক এমনকি পদার্থবিদও আছেন যারা সময়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি। সেন্ট অগাস্টিন ছিলেন তেমন একজন দার্শনিক। তিনি 'কনফেশন অফ সেন্ট অগাস্টিন' নামে ১৩ খণ্ডের একটি আত্মজীবনীমূলক বই লিখেন। ৪০০ খ্রি. দিকের এক লেখায় তিনি সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি সময়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তার মতে, সময় আমাদের মস্তিষ্কের একটি বিভ্রম মাত্র। তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চাননি। তার মতে অতীত সে তো গতই হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ তো তাই, যা এখনো হয়নি। আর বর্তমান এমন একটি বিষয় যা ঠিক এই মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে অতীত হয়ে গেল। তাহলে এগুলোর কোনটা আসলে সময়? তার মতে এই অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তবে পুরোটা মিলেই সময়। তাহলে ঠিক সময় বলে কি আসলেই কিছু আছে? তার মতে পুরো সময়টিই মানে বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ একই সাথে ঘটে আছে। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতার কারণে তা বুঝতে পারছি না।

তিনি তার সময়ের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রশ্ন ছিল ঈশ্বর কি সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ? তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। তার মতে ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই তিনি সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। অর্থাৎ ঈশ্বর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সাথে জানতে পারেন।

সেন্ট অগাস্টিনের সময় সম্পর্কে এসব ধারণা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নয়। কিন্তু অগাস্টিনের মতো আমরাও 'সময়' ও সময় প্রভাবের অদ্ভুত অজানা ও আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখে অবাক হয়ে যাই। অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক ভাবতে পারে না, স্থান থেকে সময় কীভাবে আলাদা, আর কীভাবেই বা সম্পর্কিত। আমরা যদি স্থানের সামনে-পেছনে বা বিভিন্ন দিকে ভ্রমণ করতে পারি, তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে কেন পারি না? আমাদের প্রত্যেকেরই জীবকাল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভেবে অবাক হতে হয় আমরা অতীত মনে রাখি কিন্তু ভবিষ্যৎ কেন মনে রাখতে পারি না।

এতো গেল দার্শনিকের ধারণা। অনেক দার্শনিক ও সাধারণ মানুষের মতো কয়েকজন বিজ্ঞানীও সময়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চাননি। তেমন একজন ছিলেন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়ান বারবার। বারবার

BanglaBook.org

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর কলোগন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছেন। তবে তার মূল আকর্ষণ ছিল কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নিয়ে।

পদার্থবিজ্ঞানীরা সময়কে যেভাবে দেখেন বারবার তার চেয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সময় বিষয়টিকে বাদ দিয়ে নতুন এক ধরনের পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তার "The End of Time" বইয়ের মাধ্যমে তিনি সময়ের ধারণাকে উপেক্ষা করে এক নতুন মতবাদের সূচনা করেন। বারবারের মতে- সময় বলে আসলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, এটি শুধু মস্তিষ্কের কল্পনা। তিনি যুক্তি দেখান যে, আমাদের স্মৃতি ছাড়া অতীত বিষয়টির অন্য কোনো প্রমাণ নেই। তেমনি ভবিষ্যৎও আমাদের কল্পনামাত্র; এর সাপেক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তার মতে, বস্তুকণার স্থান পরিবর্তন করার বিষয়টি আমাদের মধ্যে 'সময়' নামক এক বিভ্রমের সৃষ্টি করে। কিন্তু আদতে প্রতিটি মুহূর্তই স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকতে পারে; আর তা সম্পূর্ণটাই একসাথে আছে। অর্থাৎ তার মতে পুরো সময়টাই বর্তমান। অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'Now।'

চিত্রঃ পদার্থবিদ জুলিয়ান বারবার

বারবারের তত্ত্বের কাছাকাছি আরও একটি তত্ত্ব আছে। একে ব্লক ইউনিভার্স তত্ত্ব (block universe theory) বলা হয়। ব্লক ইউনিভার্স তত্ত্বে, স্থান-কালকে একটি অপরিবর্তনীয় চারমাত্রিক পৃষ্ঠ হিসেবে দেখা হয়। এই তত্ত্ব মতেও সময়ের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সাথে ঘটেই আছে। এতে পরিবর্তন করার কিছু নেই বা প্রবাহেরও কিছু নেই। কিন্তু ব্লক তত্ত্বে বারবারের মতো সময়ের ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া হয়নি। ব্লক তত্ত্ব এমনিতেই অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু বারবারের তত্ত্ব সময়ের ধারণাকে বাতিল করে দেবার ফলে, সময়ের যে একটি মাত্রা আছে; স্থান আর কাল যে একই সত্তার একটি ভিন্ন মাত্রা মাত্র; সে ধারণাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই তত্ত্ব চূড়ান্ত রকম সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। তাই শুরু থেকে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই একে সন্দেহের চোখে দেখেছেন।

পরবর্তীতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ শন ক্যারল বারবারের সময়বিহীন মহাবিশ্বের ধারণাকে একরকম বাতিল করে দিয়েছেন। মজার বিষয় হলো, তিনি কিন্তু বারবারের তত্ত্বের কোনো বিপরীত তত্ত্ব প্রস্তাব করেননি বা তার ধারণাকে বাতিল করেও দেননি। তিনি একটি জিনিস স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে- বারবারের এই সময়বিহীন ধারণা পদার্থবিজ্ঞানে কোনো কাজেই আসবে না। অর্থাৎ এই ধারণা শুধু ধারণাতেই সীমাবদ্ধ, বিজ্ঞানে এর কোনো ব্যবহারই নেই। ফলে একে বাতিল না করলেও তা বিজ্ঞানের জায়গায় স্থান পাচ্ছে না।

সময়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন টিম মডলিন। তিনি মূলত বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে কাজ করেন। সময়ের ধারণার বিষয়ে মডলিনকে একদমই মৌলবাদী বলা যায়। তার ধারণাও একদম স্পষ্ট। মডলিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে সময়ের তীর একদম বাস্তব একটি বিষয়, অর্থাৎ সময় কোনো প্রতিসাম্যতা মানে না। আর পাশাপাশি বারবারের সময়হীনতার বিষয়টিকেও সরাসরি বাতিল করে দেন। তার যুক্তিগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে এমনিতেও সময়বিহীন মহাবিশ্বকে অসম্ভব মনে হবে। নিউটনের বিশ্বে সময়কে পরম ভাবলেও, সময় নিয়ে নিউটনীয় বলবিদ্যার তেমন কিছু করার ছিল না। কেননা নিউটনের পদার্থবিদ্যায় সময়ের কোনো উল্লেখই নেই। সেখানে সময়কে এক অর্থে শাশ্বত ধরে নেওয়া হয়েছে, আবার আরেক অর্থে হিসেবের মধ্যেই নেওয়া হয়নি। কিন্তু

BanglaBook.org

আইনস্টাইনের তত্ত্বে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। স্থানের মাত্রার সাথে সময়ও মহাবিশ্বের আরেকটি মাত্রা। ফলে এই মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো সময়। আর গতির সাথে সময়ের একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে। আইনস্টাইনের তত্ত্বে গতি বৃদ্ধির ফলে ভর বৃদ্ধি পায়, দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়, পাশাপাশি সময় ধীর হয়ে যায়। সময়ের যদি অস্তিত্বই না থাকত তবে সময় ধীর হবার প্রশ্ন আসত না। তাই আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারেও বারবারের সময়বিহীন মহাবিশ্বের ধারণা টিকছে না।

সময়কে বাতিল করার প্রস্তাবও যেমন এসেছে, তেমনি এর উল্টো প্রস্তাবও এসেছে। এমন একজন পদার্থবিদ হলেন লি স্মোলিন। তিনি মূলত একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কাজ করলেও পদার্থবিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সিরিজ আকারে বেশ কিছু থিসিস ও বই প্রকাশ করেন। ২০১৩ সালের এপ্রিলে তিনি, 'টাইম রিবর্ন' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইতে (পৃঃ ১৭৯) তিনি দেখান যে- স্পেস বা স্থান একটি ইল্যুশন হলেও হতে পারে, কিন্তু সময় অবশ্যই বাস্তব।

মনস্তাত্ত্বিক সময়

আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করার সময় মিউওন কণিকার সময় ধীর হয়ে যায়। অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে বলে ফেলেছেন- 'মিওয়ন কণিকার তাতে কি আসে যায়? এসব নিয়ে যত মাথাব্যথা আমাদের মতো মানুষের'। বেচারা মিউওনের তো কোনো চিন্তার ক্ষমতাই নেই। তবে বিষয়টি কিন্তু অবশ্যই ভাবার মতো। সময় ধীর হবার বিষয়টি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও, জড়জগৎ তো আর তা উপলব্ধি করতে পারছে না। শুধু মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর কাছে এই সময় ধীর হবার বিষয়টি গভীর তাৎপর্য বহন করে। সময় বিষয়টি ঠিক কি, তা না জেনেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সময়কে জয় করতে চেয়েছে। সময় নিয়ে এই যে সচেতনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা এটি শুধু মানুষেরই আছে। মানুষ সচেতনভাবে সময় নিয়ে চিন্তা করতে পারে। তারা ভাবতে পারে তাদের অতীতের সুখময় স্মৃতি ও দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের কিন্তু আবার সময় নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। এমনকি সময়কে তারা সঠিকভাবে উপলব্ধিও করতে পারে না।

BanglaBook.org

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের সময়-জ্ঞান কেমন তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেছেন। এর মধ্যে কানাডার 'ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর' প্রফেসর উইলিয়াম রবার্টসের গবেষণা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রবার্টস এবং তার সহকর্মীরা ইঁদুরের সময়-জ্ঞান নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষাগুলোতে তারা ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে চিজ খুঁজতে দেন। তাদের পরীক্ষাতে দেখা যায়, একটি ইঁদুর কতক্ষণ সময় ব্যয় করে এক টুকরো চিজ পেয়েছে সেটি তাদের মস্তিষ্ক জেনে রাখে। কিন্তু এখন থেকে কত সময় আগে বা পরে চিজটি পেয়েছে তা তারা জানে না। অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো অর্থ তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

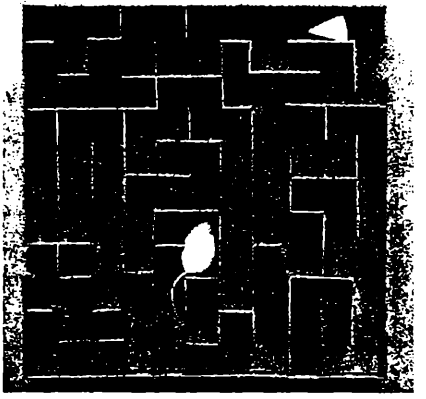

চিত্র: একটি ইঁদুর কতক্ষণ সময় ব্যয় করে এক টুকরো চিজ পেয়েছে সেটি তাদের মস্তিষ্ক জেনে রাখে। কিন্তু এখন থেকে কত সময় আগে বা পরে চিজটি পেয়েছে তা তারা জানে না

ইঁদুরের থেকে আরও উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি কিছুটা এমন। কুকুরের মালিকরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, কত সময় আগে বা পরে কোনো একটি ঘটনা ঘটল, সেটি তাদের কুকুর বুঝতে পারে না। কুকুর তার মালিককে পাঁচ মিনিট পরে দেখলেও যেমন খুশি হয়, পাঁচ ঘণ্টা পর দেখলেও একই রকম খুশি হয়। অর্থাৎ তাদের সময়প্রবাহের জ্ঞান নেই।

এখন অনেকেই হয়তো ভাবছেন, কোনো প্রাণীর যদি ভবিষ্যতের ধারণা একদমই না থাকে, তবে সে জীবন ধারণ করে কী করে? খাবার খাওয়া বা কোনো শিকার ধরার জন্যও তো কিছুটা পরিকল্পনা করতে হয়! হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। এরকম কাজের জন্য সামান্য হলেও ভবিষ্যতের ধারণা থাকতে হয়। তবে সেই ভবিষ্যৎ চিন্তা খুব সামান্য। একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি ঠিকমতো বোঝা যাবে। উপরে যেহেতু ইঁদুর ও কুকুরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তাই এই বিষয়টিও এসব প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা কিছু মজার পরীক্ষা করেছেন। এসব পরীক্ষা করার জন্য ইঁদুর বা এমন প্রাণীদের প্রথমে কিছুটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা কিছু ইঁদুরকে একটি প্রশিক্ষণ দিলেন যে- তোমরা যদি এই লিভারটিতে চাপ দাও তবে তোমরা এক টুকরো খাবার পাবে। দুই থেকে পাঁচবার এভাবে প্রশিক্ষণ দিলেই ইঁদুরগুলো লিভার চেপে খাবার সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি হয়, ইঁদুর আর এই বিষয়টি মনে রাখতে পার না। অর্থাৎ লিভার চাপা ও খাবার পাওয়া এই দুটি ঘটনার ব্যবধান ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি হলে সেটি ইঁদুরের সময়-জ্ঞানের বাইরে চলে যায়। ইঁদুর থেকে উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সময় আরও কিছুটা বেশি। বানরের ক্ষেত্রে এই সময় সর্বোচ্চ নব্বই সেকেন্ড। অর্থাৎ ইঁদুর ত্রিশ সেকেন্ড ও বানর নব্বই সেকেন্ডের বেশি ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না।

ইঁদুর, কুকুর বা বানরের সময়-জ্ঞান দেখে বোঝা যাচ্ছে, এসব প্রাণীরা মূলত বর্তমান সময়ে বাস করে। কিন্তু বর্তমান সময়টি কত দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু মানুষের সাথে অন্য প্রাণীদের অনেক তফাত রয়েছে। ভাবলে অবাক হবেন, এমনকি প্রায় সব প্রাণীর সময়প্রবাহই আলাদা আলাদা।

সিনেমা বা ডকুমেন্টারিতে অনেক সময়ই আমরা স্লো মোশনের ভিডিও দেখে থাকি। ভাবুন তো, যদি আমাদের একটি স্লো মোশনের বিশ্বে নিয়ে যাওয়া হয় তবে কেমন হবে! আশেপাশের সবকিছুর পরিবর্তন তখন খুব ধীরগতিতে হবে। তবে একই সাথে যদি আমাদের মস্তিষ্কও ধীরগতিতে কাজ করে, তাহলে আমরা বিষয়টি বুঝতেই পারব না। কিন্তু আশেপাশের সবকিছু যদি ধীর গতির হয়, আর আমাদের মস্তিষ্ক যদি ঠিকঠাক কাজ করে, তবে বেশ মজাই হবে। তখন ইচ্ছে করলেই টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া গ্লাস ধরে ফেলতে পারব। সমস্যা হবে খেলাধুলা নিয়ে। এমন সুবিধা পেলে গোলকিপারকে আর গোল দেওয়া যাবে না! কিছু প্রাণী ঠিক এমন কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। ওদের সময়প্রবাহ আমাদের থেকে আলাদা। ওরা জগৎটাকে দেখেও কিছুটা স্লো মোশনের ভিডিওর মত।

কুকুরের কথাই ধরা যাক। কুকুরের জীবৎকাল মানুষের প্রায় সাত ভাগের এক ভাগের সমান। অর্থাৎ কুকুরের এক বছর সমান মানুষের সাত বছর। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন আচ্ছা, তাহলে কুকুরের সময়প্রবাহ কি মানুষের তুলনায় ধীর? গবেষণায় দেখা গেল আসলেই তাই। কুকুরের সময়প্রবাহ মানুষের তুলনায় প্রায় পঁচিশ শতাংশ ধীর।

গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো প্রাণীর সময়প্রবাহের হার মূলত নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপর। একটি হলো শরীরের ওজন, আর অন্যটি বিপাকের

BanglaBook.org

হার। কোনো প্রাণীর ওজন যত কম হবে আর শরীরের ভেতর ঘটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া যত দ্রুত হবে, সেই প্রাণীর সময় তত বেশি ধীর হবে। তবে সময় প্রবাহের হার যত কম বা বেশিই হোক না কেন, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা মূলত বর্তমানেই বাস করে। অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা তাদের কাছে একদমই ঝাপসা।

মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর সময়-জ্ঞান না থাকলেও নিয়ান্ডারথাল মানবদের সময়-জ্ঞান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিয়ান্ডারথাল মানবরা ঠিক মানুষ না; তবে আধুনিক মানুষের (Homo sapiens) খুব কাছাকাছি[২]। আজ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত মানুষদের পাশাপাশি এই নিয়ান্ডারথাল মানবরাও পাশাপাশি বাস করত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হলো- 'শুধুমাত্র যোগ্যরাই টিকে থাকে'। প্রকৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে নিয়ান্ডারথালরা টিকতে পারেনি। চিরতরে হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। নিয়ান্ডারথালরা হারিয়ে গেলেও তাদের ইতিহাস হারিয়ে যায়নি। তারা দেখতে কেমন ছিল, তাদের খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল, আর তাদের বুদ্ধিমত্তা কেমন ছিল এসব বিষয়ে রয়ে গেছে শত শত আলামত।

চিত্রঃ নিয়ান্ডারথাল মানবের কম্পিউটার রিজেনারেটেড ছবি

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal

প্রাচীন মানব ও নিয়ান্ডারথাল মানবদের দেহাবশেষ ও ব্যবহার করা হাতিয়ার ইত্যাদিসহ অনেক প্রাচীন গুহা রয়েছে। তেমনি এক গুহার নাম শানিদার গুহা। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে ইরাক সীমান্তের এক উপত্যকার নাম শানিদার। শানিদার মানে হলো স্বপ্ন উপত্যকা। এই উপত্যকার এক পাশে অবস্থিত এই 'শানিদার গুহা'। এই গুহাটিকে নিঃসন্দেহে বিশেষ একটি স্থান বলা যেতে পারে। কারণ, কার্বন ডেট টেস্ট করে জানা গেছে, এই গুহাটিকে সেই ৫০০০০ বছর আগে থেকেই বসবাস করার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আজ থেকে প্রায় ৫০০০০ বছর আগে নিয়ান্ডারথাল মানবরা যেমন এই গুহাকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করেছে, তেমনি ১১০০০ বছর আগের আধুনিক মানুষরাও এই স্থানকে ব্যবহার করেছে। এমনকি আজও কিছু স্থানীয় কুর্দিস্তানিরা বছরের বিশেষ কিছু সময়ে এই স্থানকে এখনো ব্যবহার করে থাকে। গুহাটি খনন করার সময় চারটি স্তরে বিভিন্ন সময়ের বসবাস করা মানুষদের কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহার করা হাতিয়ার ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

চিত্রঃ শানিদার গুহা

শানিদার গুহার সর্বশেষ স্তরটিই মূলত সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রায় ১০টি নিয়ান্ডারথালদের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'শানিদার-৩' ও 'শানিদার-৪' কে যে ইচ্ছে করেই কবর দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা নিশ্চিত হতে পেরেছেন।[৩] আশাপাশি সেখানে থাকা বিভিন্ন জিনিস থেকে বোঝা যায় যে, তারা মৃত্যুর পরবর্তী সময় নিয়ে চিন্তা করেই এই কবরগুলো তৈরি করেছিল। অর্থাৎ নিয়ান্ডারথাল মানবদের যে সময়-জ্ঞান ছিল এটা নিশ্চিত। অন্যান্য প্রাণীদের মতো তারা শুধু বর্তমান সময়েই বাস করত না।

BanglaBook.org

[৩] শানিদার গুহায় পাওয়া ১০ টি নিয়ান্ডারথাল মানবদেহকে শানিদার-১, শানিদার-২ এভাবে নামকরণ করা হয়েছে।

এখন নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে, অন্য কোনো প্রাণীর সময়জ্ঞান না থাকলেও শুধু নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানুষের কেন সময়জ্ঞান থাকবে? এর নিশ্চয় কারণ আছে? মূলত, অতীত-ভবিষ্যতের ধারণা থাকার জন্য বিশেষ ধরনের মস্তিষ্কের গঠনের দরকার হয়। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নিউরন রয়েছে। এই নিউরনগুলো আবার বিশেষভাবে একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হয়ে নিউরাল সার্কিট তৈরি করেছে। এই নিউরাল সার্কিটগুলোই আমাদের স্মৃতি মনে রাখা, সচেতনভাবে ও যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছে। মজার বিষয় হলো, এই নিউরাল সার্কিট কিছুটা কম্পিউটারের লজিক গেটের মতো কাজ করে। কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেমন হ্যাঁ অথবা না প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যৌক্তিকভাবে কোনো সমস্যা সমাধান করা হয়; আমাদের মস্তিষ্কও কিছুটা সেভাবেই কাজ করে।

যে প্রাণীর মস্তিষ্কে যত বেশি নিউরন ও নিউরন থেকে নিউরনের সংযোগ থাকবে, সেই প্রাণী তত বেশি বুদ্ধিমান হবে। মস্তিষ্কে যদি যথেষ্ট পরিমাণ নিউরন ও আন্তঃনিউরোন সংযোগ থাকে, একমাত্র তখনই সময়-জ্ঞানের মতো উন্নত ধরনের ধারণা থাকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকা সম্ভব। আর এত উন্নত মস্তিষ্ক শুধু মানুষেরই আছে। আর তার কারণ- তাদের মস্তকটিও যথেষ্ট উন্নত। আসলে নিয়ান্ডারথালদের সাথে আধুনিক মানুষের খুব বেশি তফাত নেই। একদম সম্প্রতি, লরেন্স বার্কেলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির অ্যাডয়ার্ড রুবিন পরীক্ষা করে দেখেছেন- আধুনিক মানুষ ও নিয়ান্ডারথাল মানবের ডিএনএর মধ্যে মিল ৯৯.৫%-৯৯.৯% পর্যন্ত।[৪] নিয়ান্ডারথালরাও মানুষের মতো হাতিয়ার তৈরি করতে পারত। কিছু কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা তাদের সম্ভবত একটি ভাষাও ছিল। নিয়ান্ডারথালদের সময়-জ্ঞান থাকলেও সেটি কিন্তু আধুনিক মানুষের মতো উন্নত না। এটি মস্তিস্কের পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে। জন্ম নেবার পরেই মানবশিশুদের মস্তিষ্ক পরিনত মানুষের মস্তিস্কের মতো কাজ করতে পারে না। ফলে মানবশিশুদের ভবিষ্যৎ সময় সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট। বলা যায় শিশুরাও একরকম বর্তমান সময় নিয়েই ভাবে।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মস্তিষ্ক পরিণত হয়। আর সেই সাথে সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও ভালোমতো ভাবতে পারে। আর সময়কেও আরও সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশের বিষয়টি, মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম। মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানব জাতিরও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার বিকাশ ঘটেছে, সেই সাথে সময় সম্পর্কে উপলব্ধি আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। সেই

BanglaBook.org

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal#Genome

প্রাচীনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা দিন দিন পরিবর্তন হয়েই চলেছে।

প্রাচীনকালের মানুষরা খুব বেশি দূরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে পারত না। আগুণ জালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ জোগাড়, বাড়তি খাদ্য সংরক্ষণ এসবের মধ্যেই তাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সভ্যতা শুরু হবার পর মানুষ সময়কে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছে। তবে সে সময় তাদের কাছে সময় ছিল কিছুটা জাদুর মতো। তারা ভাবত, যেটা ঘটার সেটা সময় হলে ঘটবেই।

এসব ধারণার পেছনে মূলত আদিম ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকাটাই ছিল প্রধান। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শুরু হবার পর সময়কে কিছুটা আবর্তক মনে করা হতো। ওরা ভাবত সবকিছুই বুঝি ঘুরেফিরে আবার ঘটবে। কৃষিকাজ শুরু করার পর মানুষকে প্রকৃতির উপর খেয়াল রাখতে হতো। তারা দেখত - একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, শীত আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোও ফিরে ফিরে আসে। আদিম বিশ্বাস, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের অভাব, প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা মানুষকে সময় সম্পর্কে এমন আবর্তক ও ম্যাজিক্যাল ধারণা পেতে বাধ্য করেছে। তবে এর পেছনে কিছু মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাও ছিল। আদিম বিশ্বাসের কারণে তারা ভাবত সবকিছু যদি ফিরে ফিরে এসেই থাকে, তবে মৃত মানুষও বুঝি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে। কে চায় এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে। এসব মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তারা মৃতের কবরে ফুল, খাদ্য, হাতিয়ার ইত্যাদি রেখে দিত।

চিত্র প্রাচীন মানুষের খুব বেশি দূর-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারত না। তাদের চিন্তা শুধু খাদ্য জোগাড়, আগুনের জন্য কাঠ জোগাড় বা শিকারের জন্য হাতিয়ার তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

সময় সম্পর্কে এই আবর্তক ধারণা মানুষের মনে বেশ জোরালো প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীন ভারতীয়দের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় এই ধারণাই স্থায়ী আসন করে নেয়। তবে প্রাচীন ভারতীয়দের আবর্তক ধারণা কিছুটা আরও ব্যাপক আকারের। ওরা মনে করত, একই ঋতু বারবার ফিরে আসা, বিভিন্ন

প্রাকৃতিক ঘটনা ফিরে ফিরে ঘটা বা গ্রহদের ফিরে আসাই শুধু না; বরং সমগ্র মহাবিশ্বের সকল ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে, আবার ধ্বংস হবে আর এভাবে চলতেই থাকবে। প্রাচীনকালের বেশির ভাগ সভ্যতাই ছিল কৃষিনির্ভর। তাই এই আবর্তক ধারণা প্রায় সব প্রাচীন সমাজেই প্রভাব ফেলেছিল।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে সময়কে আমরা আজকে যেমন একটি রেখার মতো কল্পনা করি যে আমাদের পেছনে অসীম অতীত কাল ছিল, আর সামনেও অসীম ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, এমন ধারণাটা প্রাচীন সভ্যতার শুরু থেকেই ছিল না। সময়ের রৈখিক ধারণার শুরু হয় সেমেটিক ধর্মবিশ্বাস থেকে। আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে বিশ্বাস করা হয় যে এই মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট সময় আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেমেটিক ধারণা অনুযায়ী সময়ের রূপ কিছুটা 'রৈখিক'। ফলে এই ধারণাকে কিছুটা আধুনিক বলা যেতে পারে।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সময় নিয়ে সবচেয়ে সচেতন ছিল মধ্য অ্যামেরিকার মায়া সভ্যতা। মায়ানরাই সর্বপ্রথম নির্ভুলভাবে সময় হিসেব করতে শিখেছিল। ওরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গণনা করে খুব আধুনিক একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল। ভাবতে অবাক লাগবে আধুনিক সময় গণনার ভিত্তি হিসেবে আমরা যে গ্রেগির ক্যালেন্ডার ব্যাবহার করি, মায়াদের ক্যালেন্ডার তার থেকেও নির্ভুল ছিল। কারণ, গ্রেগির ক্যালেন্ডার প্রতি দশ হাজার বছরে তিন দিন পিছিয়ে যায়; আর মায়াদের ক্যালেন্ডার প্রতি দশ হাজার বছরে মাত্র দুই দিন এগিয়ে থাকে।

চিত্রঃ মায়ান ক্যালেন্ডার (পাথরে খোদাই করা)

মায়ানরা নির্ভুলভাবে সময় গণনার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও সময় সম্পর্কে তাদের ধারণা কিন্তু আজকালকার দিনের মতো ছিল না। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার মতো তাদের কাছেও সময় ছিল কিছুটা ম্যাজিক্যাল। প্রতিটি বছর, দিন বা মুহূর্তকে ওরা কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করত। আমরা যেমন ভাবি কোনো কিছু ঘটুক আর নাই ঘটুক, সময় বয়ে চলবেই। কিন্তু ওরা ভাবত ঐ বিশেষ ঘটনাগুলো ঘটার জন্যই বুঝি সময় বয়ে চলেছে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মন থেকে বিভিন্ন প্রকার ম্যাজিক্যাল ধারণা দূর হতে থাকে। সেই সাথে সময় সম্পর্কেও ম্যাজিক্যাল ধারণা বাতিল হয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা শুরু হতে থাকে। জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারই প্রথম সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণার ওপর জোর দেন। তিনি সময়কে প্রাণবাদ ও ম্যাজিক্যাল ধারণা থেকে মুক্ত করেন, পুরো মহাবিশ্বটিকেই একটি যান্ত্রিক ঘড়ি হিসেবে দেখার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে কেপলারের এই 'যান্ত্রিক ঘড়ি' ধারণার বিকাশ ঘটান রেনে ডেকার্তে, বেঞ্জামিন থম্পসন, লর্ড কেলভিনের মতো বিজ্ঞানীরা। মূলত তাদের চিন্তাধারাই সময়ের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবাত্মক চেষ্টা ছিল।
লক্ষ করলে দেখতে পাবেন উপরে বিভিন্ন প্রাণীর সময়-জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সময় একটি বিষয়ের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, সেটি হলো- 'কে কত দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে পারে'। কারণ, যে প্রাণী যত বেশি দূর-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বা পরিকল্পনা করতে পারে, তার সময়-জ্ঞান তত বেশি সূক্ষ্ম। সময়ের উপর থেকে ম্যাজিক্যাল ধারণা দূর হবার আগ পর্যন্ত আমরা আসলে খুব বেশিদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেও পারতাম না। আর একই কারণে খুব বেশিদূর অতীত নিয়েও ভাবতে পারতাম না। ফলে এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বটা আমাদের কাছে খুব বেশি পুরনো ছিল না। ডেকার্তে-কেপলারের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা শুরু হবার আগে পুরো ইউরোপেজুড়ে সেমেটিক বিশ্বাসই ছিল সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সেমেটিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। ফলে তার আগের বিষয় নিয়ে ভাবার কোনো দরকারই ছিল না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা শুরু হবার পর বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের চেষ্টা চলতে থাকে।

BanglaBook.org

কমটি ডি বাফুন নামে এক ফরাসি গণিতবিদ প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেন। তার হিসেবে দেখা যায়, পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে পঁচাত্তর হাজার বছর। পরবর্তীতে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের সঠিক উপায় আবিষ্কারের পর দেখা যায় পৃথিবীতে কয়েক শত কোটি বছর পুরনো পাথরের অস্তিত্ব রয়েছে। আর মহাবিশ্ব সৃষ্টির আধুনিক তত্ত্ব থেকে দেখা যায় ১৩.২ বিলিয়ন বছর আগে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মহাবিশ্ব সৃষ্টিরও কয়েকশ কোটি বছর পরে, মাত্র ৪৫০ কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আমরা আজ থেকে ৫০০ কোটি বা তারও বেশি সময় পরে এই পৃথিবী-সৌরজগতের অবস্থা কেমন হবে সেটাও ভাবতে পারছি। মূলত সৌরজগতের বিবর্তনের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগ পর্যন্ত আমাদের কাছে বৃহৎ সময় বলে তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব পাবার পর সময়ের অনেক বড় পর্যায় পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারি। এমনকি সময় শুরু এবং শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারি। অনেক বড় সময়ের পাশাপাশি অনেক ক্ষুদ্র সময় নিয়েও আমরা ভাবতে পারি। এখন আমাদের এক সেকেন্ডের কয়েক কোটি ভাগের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোয়ান্টাম কণিকার সংঘর্ষের পরিণতি মাপতে হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের সময়-জ্ঞান দিন দিন বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম হচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সময়ের তীর

১৯৪০ সালের দিকের কথা। জন হুইলার একদিন টেলিফোন করে রিচার্ড ফাইনম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন,

আপনি কি জানেন, ইলেকট্রন আর পজিট্রনের চার্জ আর ভর হুবহু এক কেন?

হঠাৎ করে এমন প্রশ্ন শুনে ফাইনম্যান আর কি বলবেন! জিজ্ঞেস করলেন,

কেন?

ফাইনম্যান হয়তো একটু বড়সড় উত্তর আশা করেছিলেন। কিন্তু হুইলার এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিলেন

কারণ ওগুলো সব একই ইলেকট্রন।

সে সময় ফাইনম্যান হুইলারের কথার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। তখন থেকেই ফাইনম্যান বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকেন। দীর্ঘ আট বছর গবেষণার পর ১৯৪৮ সালে তিনি তার বিখ্যাত ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের গাণিতিক কৌশল প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দেখান যে, অ্যান্টি-পার্টিক্যাল(Anti-particle) বা প্রতি-কণিকাগুলো মূলত একই রকম কণিকা; শুধু তাদের সময়ের প্রবাহ সাধারণ কণিকার বিপরীত। অর্থাৎ ইলেকট্রন সময়প্রবাহ অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে, আর পজিট্রনের সময় ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে যাচ্ছে। আর একারণেই ইলেকট্রনটিকে আমাদের কাছে পজিট্রন বলে মনে হচ্ছে।

আমরা যদি একটি লোকের হেঁটে যাবার দৃশ্যকে ভিডিও কর তাকে ভিডিওটিকে উল্টোদিকে চালিয়ে দিই, তাহলে কী দেখতে পাব? দেখা যাবে

BanglaBook.org

লোকটি পেছনের দিকে হাঁটছে। ক্লাউড চেম্বারে যখন একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রনের ছবি নেওয়া হয় তখন দেখা যায় ইলেকট্রন যেদিকে যাচ্ছে, পজিট্রন যাচ্ছে তার উল্টোদিকে।

চিত্রঃ ক্লাউড চেম্বারে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের চলার পথ।

ফাইনম্যানের এই গবেষণার ফলাফল ১৯৪৯ সালে, 'ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার' জার্নালে প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে অনেকেই পজিট্রনের এই সময়ের পেছন দিকে চলার ব্যাখ্যাকে শুধু একটি গাণিতিক কৌশল হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নতুন নতুন গবেষণা থেকে দেখা গেল, ফাইনম্যানের ব্যাখ্যাই সঠিক। মূলত ফাইনম্যানের এই ডায়াগ্রাম ছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গণনার কথা ভাবাই যায় না। এমনকি স্ট্রিং থিওরির বিভিন্ন হিসেব-নিকেশের জন্যও ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে আমরা যদি কোনো পরিপূর্ণ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির তত্ত্ব তৈরি করতে পারি, সেখানেও ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের ব্যবহার থাকবে। মোটকথা, কোয়ান্টাম কণিকাদের কোনো হিসেব করতে গেলেই ফাইনম্যানের ডায়াগ্রামের সহায়তা নিতে হয়।

পজিট্রনের আচরণ থেকে দেখা যাচ্ছে সময়ের উল্টোদিকে ছুটে চলাটাই তাদের স্বভাব। পজিট্রনের ভর, চার্জের মান, ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্য ইলেকট্রনের মতো। শুধু চার্জটা বিপরীত; ঋণাত্মক না হয়ে ধনাত্মক।

BanglaBook.org

একারণে এসব কণিকাকে, প্রতি-কণিকা/বিপরীত কণিকা বা অ্যান্টি-পার্টিক্যাল (Anti-Particle) বলা হয়। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই অ্যান্টি-পার্টিক্যালগুলো বাস্তবে আবিষ্কার করার আগেই এক বিজ্ঞানী ভবিষৎদ্বাণী করেছিলেন যে এমন বিপরীতধর্মী কণিকার অস্তিত্ব থাকা উচিত।

১৯২৫ সালের কথা। পল ডিরাক তখন সবেমাত্র ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সময়টি বিশেষ একটি সময়। বিজ্ঞানের জগতে তখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জোয়ার বইছে। বিশ্বের সব তরুণ বিজ্ঞানীরা তখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রতি দারুণ টান অনুভব করছেন। ডিরাকও কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে আগ্রহী হয়ে পরলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম (খুব ক্ষুদ্র) কণিকাদের আচরণ নিয়ে খুব অদ্ভুত কথা বলতে লাগলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল কথা ছিল যে, ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র কণিকাদের শুধু কণা হিসেবেই বর্ণনা করা যায় না, পাশাপাশি একটি তরঙ্গ হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ এসব কণিকা একইসাথে কণিকার মতো আচরণ করে আবার তরঙ্গের মতো আচরণ করে। শ্রোডিঞ্জারের সেই বিখ্যাত তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে এসব কণিকা আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়।

পল ডিরাক তখন শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন। তিনি এই সমীকরণের কিছু ত্রুটি লক্ষ করলেন। শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণের সাহায্যে কম গতিতে চলমান ইলেকট্রনের আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু উচ্চ গতিতে চলমান কণার আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। কারণ উচ্চ গতিতে চলমান যেকোনো বস্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম মেনে চলে। আর শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণটি আপেক্ষিক তত্ত্ব ছাড়াই গঠন করা হয়েছিল। ফলে এটি উচ্চ গতির কণিকার ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসবে না।

ডিরাক ভেবে দেখলেন, উচ্চ গতির ইলেকট্রনের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণের সাথে আপেক্ষিক তত্ত্বকে যুক্ত করা দরকার। আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণ গঠন করতে গিয়ে তাকে 'স্পিনর' নামের উচ্চতর গণিতের সহায়তা নিতে হয়েছিল। অবশেষে

BanglaBook.org

১৯২৮ সালে তিনি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে একীভূত করে, 'The quantum theory of the electron' নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রে তিনি 'ডিরাক ইকুয়েশন' নামে নতুন একটি সমীকরণ পরিচয় করিয়ে দেন। ডিরাকের এই আপেক্ষিক তত্ত্ব যুক্ত ইলেকট্রনের সমীকরণটি বিজ্ঞানী মহলে হৈচৈ ফেলে দেয়। কিন্তু ইলেকট্রনের জন্য নতুন তরঙ্গ সমীকরণ তৈরি করতে গিয়ে ডিরাক অবাক হয়ে লক্ষ করলেন- আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ আসলে সম্পূর্ণ সঠিক না! ভাবছেন কি যা তা বলছি! মূলত সঠিক সমীকরণটি হলো, $E= \pm mc^2$। যখন একটি কণিকা নিশ্চল থাকে, তখন সমীকরণটি হয় $E^4 = m^2c^4$। উভর পাশে বর্গমূল করে এই সমীকরণকে $E=mc^2$ হিসেবে লেখা হয়। বিজ্ঞানীরা সাধারণত ঋণাত্মক শক্তিকে অবাস্তব হিসেবে ধরে নিয়ে $E=mc^2$ আকারে লিখেন। কিন্তু ডিরাক তো আর সেটি পারবেন না। কারণ তাকে এখানে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সমন্বিত করতে হচ্ছে। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হ্যামিলটোরিয়ান অপারেটরের সাহায্যে গণনা করে আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণটি পেলেন $E= \pm mc^2$ আকারে। এই সমীকরণের ঋণাত্মক মানটি মূলত ইলেকট্রনের একটি বিপরীত কণিকা থাকার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

ডিরাকের সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছিল এই ঋণাত্মক শক্তির মানকে নিছক গাণিতিক ফলাফল ভেবে উপেক্ষা করা যাবে না। তিনি ১৯২৯ সালের একটি ফলোআপ পেপারে এই বিষয়ে বিস্তারিত লেখেন।[১] তিনি এই বিপরীত ইলেকট্রন থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য 'ডিরাক সি (Dirac see)' নামে একটি নতুন তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের প্রস্তাব করেন। সেখানে দেখানো হয়, ইলেকট্রনগুলো আসলে একটি ধনাত্মক তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের

BanglaBook.org

---

১ ডিরাকের ১৯২৯ সালের পেপারে একটি ভিন্ন সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন। তিনি সেখানে প্রোটনকে সেই ঋণাত্মক শক্তিস্তরের (সাগরের) একটি কনিকা বা দ্বীপ হিসেবে ভাবার কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রোটনের ভর তো ইলেকট্রনের থেকে অনেক বেশি। এই সমস্যার ব্যাপারে ডিরাকের মতো ছিল অন্য কোনো তত্ত্ব হয়তো এই অসামঞ্জস্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। পরে ১৯৩১ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার ডিরাকের সেই সম্ভাবনাকে বাতিল করে একটি পেপার পাবলিশ করেন। সেখানে তিনি দেখান যে প্রোটন কখনোই ইলেকট্রনের সেই বিপরীত কণিকা হতে পারে না।

ভেতর চলাচল করে, ফলে এদের চার্জ ঋণাত্মক হিসেবে দেখা দেয়। যখন এই ইলেকট্রনগুলোই একটি ঋণাত্মক তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে চলাচল করবে, তখন তাদের চার্জ ধনাত্মক হবে। তিনি এই ঋণাত্মক তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নাম দেন ডিরাক সি। ডিরাক বললেন, মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থায় সকল ঋণাত্মক শক্তিস্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকা 'এন্টি-ইলেকট্রন' বা পজিট্রনকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমরা যদি ঋণাত্মক শক্তিস্তর তৈরি করতে পারি তখন অবশ্যই পজিট্রনকে দেখা যাবে। তবে সে সময় ডিরাক সি'র এই ধারণা বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

চিত্রঃ বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান (বামে) ও পল ডিরাক (ডানে)।

অবশেষে সকল প্রকার ধোঁয়াশা দূর করে ১৯৩২ সালের ২ আগস্ট কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন। অবশ্য ১৯২৯ সালে দিমিট্রি কোরেস্টিন নামে একজন রাশিয়ান পদার্থবিদ উইলসন ক্লাউড চেম্বারের ভেতর দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা করার সময় প্রথম পজিট্রন দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেননি যে এটি পজিট্রন। তিনি ভেবেছিলেন একটি ইলেকট্রন বুঝি ভুল করে উল্টো দিকে চলা শুরু করেছে!

পজিট্রন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অ্যান্টি-পার্টিক্যাল শুধু তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না বরং বাস্তবেও এমন কণিকা আছে। পরবর্তীতে আরও চমকপ্রদ বিষয় আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল শুধু ক্লাউড চেম্বার বা কোনো

BanglaBook.org

শক্তিশালী পার্টিক্যাল এক্সিলারেটরেই বুঝি এমন অদ্ভুত কণিকা তৈরি করা সম্ভব। প্রকৃতিতে বুঝি এদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন, সোডিয়াম-২২ পরমাণু থেকে প্রাকৃতিকভাবেই পজিট্রন নিঃসরণ হয়। ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী প্রোটনের বিপরীত কণিকা 'অ্যান্টি-প্রোটন' আবিষ্কার করেন। এই কণিকার চার্জ ছাড়া সব ধর্মই প্রোটনের মত। এর এক বছর পর ১৯৫৬ সালে নিউট্রনের বিপরীত কণিকা অ্যান্টি-নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়।

আসলে ডিরাকের সমীকরণ থেকে দেখা যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান সকল বস্তুকণিকারই বিপরীত কণিকা রয়েছে। এই কণিকাগুলোও সাধারণ কণিকার মতই, পার্থক্য শুধু একটি মাত্রায়। মহাবিশ্বের চতুর্থ মাত্রা, সময়ের মাত্রায়। সাধারণ কণিকা যেখানে সময়ের দিকে বয়ে চলে, এরা চলে সময়ের বিপরীত দিকে। সাধারণ কণিকাগুলো যখন তাদের বিপরীত কণিকগুলোর সংস্পর্শে আসে তখন তারা নিজেরা পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে।

এখন অনেকেই ভাবছেন, অ্যান্টি-ইলেকট্রন, অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন যদি থেকে থাকে, তবে নিশ্চয় এন্টি-অ্যাটম বা বিপরীত পরমাণুও থাকা সম্ভব। হ্যাঁ, সেটি আসলেই সম্ভব। সার্নের ফার্মিল্যাবের বিজ্ঞানীরা অ্যান্টি-ইলেকট্রন আর অ্যান্টি-প্রোটনের সাহায্যে এন্টি-হাইড্রোজেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটি প্রোটনকে কেন্দ্র করে একটি ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে, আর এই অ্যান্টি-হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটি অ্যান্টি-প্রোটনকে ঘিরে একটি এন্টি ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের ইতিহাস রচনা করেন। CERN-এর বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দেন যে, তারা ৯টি অ্যান্টি-হাইড্রোজেন বানাতে সক্ষম হয়েছেন।

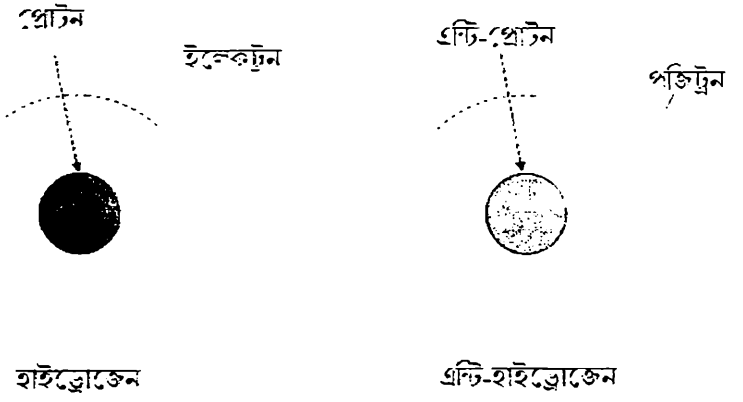

চিত্রঃ হাইড্রোজেন ও এন্টি- হাইড্রোজেন

মজার বিষয় হলো, যদি একটি বিপরীত পরমাণু থাকতে পারে, তবে তাত্ত্বিকভাবে বিপরীত বস্তু, বিপরীত বস্তুর রসায়ন, বিপরীত পৃথিবী, বিপরীত মানুষ এমনকি একটি বিপরীত মহাবিশ্বও থাকা সম্ভব।

সাধারণভাবে দেখলে একটি বিপরীত মহাবিশ্ব থাকাটা অসম্ভব না। কিন্তু এখানে কিছু শর্ত আছে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন, শুধু অ্যান্টি-পার্টিক্যাল দিয়েও একটি মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে। সেই মহাবিশ্বের সবকিছুই ঠিক থাকবে, শুধু সব কণিকাদের চার্জ হবে বিপরীত। এমন ভাবার অবশ্য কারণও ছিল। পদার্থবিজ্ঞানে কাইরাল সিমেট্রি (chiral symmetry) নামে একটি কথা আছে। কাইরাল সিমেট্রির অর্থ হলো- 'পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো পার্টিক্যাল ও তাদের অ্যান্টি-পার্টিক্যালের ক্ষেত্রে একই হবে।' পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো যদি অ্যান্টি-পার্টিক্যালের ক্ষেত্রে একই রকম হয়, তবে একটি অ্যান্টি-ইউনিভার্স থাকতে আর সমস্যা কি? তবে অনেকেই হয়তো ভাবছেন, অ্যান্টি-পার্টিক্যালের চার্জ তো বিপরীত, তাহলে সেই মহাবিশ্বের মহাকর্ষ বল কি উল্টো হবে? আমাদের মহাবিশ্বে মহাকর্ষ বলের কারণে সব বস্তুকণিকাই সব বস্তুকণিকাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই বিপরীত মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কী হবে? সেখানে কি সব বস্তু সব বস্তুকে বিকর্ষণ করবে? আর আলোর কণিকা ফোটন কি তখন আলোর বদলে অন্ধকার ছড়াবে? মজার বিষয় হলো এমন কিছুই হবে না। কারণ ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের মতো বস্তুকণিকাদেরই শুধু আলাদা একটি করে বিপরীত কণিকা থাকে। কিন্তু বলের কণিকাদের আলাদা কোনো বিপরীত কণিকা থাকে না। তারা নিজেই তাদের বিপরীত কণিকা। যেমন আলোর কণিকা ফোটন ও মহাকর্ষ বলের কণিকা গ্যাভিটনের বিপরীত কণিকা তারা নিজেরাই। ফলে কোনো অ্যান্টি-ইউনিভার্স থাকলে, সেখানেও সব বস্তু সব বস্তুকে আকর্ষণ করবে, আর ফোটন আলোই ছড়াবে।

কিন্তু সমস্যা আসলে ভিন্ন জায়গায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন নিউক্লিয়ার দুর্বল বল (weak nuclear force) এই কাইরাল প্রতিসাম্য মেনে চলে না। অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো সব ক্ষেত্রে এই প্রতিসাম্য মেনে চললেও দুর্বল বলের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা মানে না। ফলে বোঝা গেল শুধু বিপরীত কণিকা দিয়ে তৈরি একটি অ্যান্টি-ইউনিভার্স বলে কিছু থাকা সম্ভব না।

BanglaBook.org

তবে বিজ্ঞানীরা কিন্তু খুব সহজে আশা ছেড়ে দেবার পাত্র নন। কাইরাল সিমেট্রির মতো পদার্থবিজ্ঞানে আরেকটি সিমেট্রি আছে, প্যারিটি সিমেট্রি (Parity symmetry)। প্যারিটি সিমেট্রির অর্থ হলো, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো তাদের দর্পণ প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রেও একই হবে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যদি কণিকার স্থানে বিপরীত কণিকা নেওয়া হয় পাশাপাশি যদি তাদের দর্পণ প্রতিবিম্ব নেওয়া হয়, তাহলে বুঝি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ তারা এমন একটি মহাবিশ্বের কথা ভাবলেন, যেখানে সকল কণিকার জায়গায় তাদের বিপরীত কণিকা থাকবে, আর তারা দেখতেও হবে তাদের চেহারার উল্টো (আয়নায় আমরা যেমন ডান হাতকে বাম হাতের স্থানে দেখি তেমন)। বিজ্ঞানীরা একে বলেন কাইরাল ও প্যারিটির যুক্ত প্রতিসাম্য। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সে আশাও বাতিল হয়ে গেল। ১৯৬৪ সালে জে. ডব্লিউ ক্রোনিন ও ভ্যাল ফিচ নামে দুই অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, কে-মেসন নামে একটি কণিকা কাইরাল ও প্যারিটির যুক্ত প্রতিসাম্যটিও মেনে চলে না। ফলে এমন মহাবিশ্ব থাকাটাও সম্ভব না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটি জানতেন যে এই যুক্ত প্রতিসাম্যের সাথে যদি সময়কেও উল্টো দিকে প্রবাহিত করা হয়, তাহলে আর সমস্যা থাকে না। অর্থাৎ যদি কণিকার বদলে বিপরীত কণিকা থাকে, প্রতিটি কণিকারই দর্পণ প্রতিবিম্ব নেওয়া হয়, পাশাপাশি সময়ও যদি উল্টো দিকে চলে, তবে কিন্তু এমন একটি মহাবিশ্ব থাকা সম্ভব। অর্থাৎ সেই মহাবিশ্বের সবকিছুই হবে আলাদা। সবকিছু তৈরি হবে অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে, তারা দেখতেও হবে আয়নার ছবির মতো; অর্থাৎ ডান দিক থাকবে বাম দিকে, আর সময় প্রবাহিত হবে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে।

এই কথাগুলো শুনতে খুব আজগুবি লাগলেও, এমন একটি মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞান নিয়মগুলো একদম হুবহু মেনে চলবে। এর অর্থে এমন একটি মহাবিশ্ব থাকাটা খুবই বাস্তব। বিজ্ঞানীরা এমন মহাবিশ্বকে বলেন সিপিটি রিভার্স মহাবিশ্ব (CPT Reverse Universe)। এই মহাবিশ্ব কাইরাল সিমেট্রি, প্যারিটি সিমেট্রি ও টাইম সিমেট্রির যুক্ত প্রতিসাম্য মেনে চলে বলেই এমন নামকরণ।

BanglaBook.org

একটি মহাবিশ্বের সময় ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে যাচ্ছে, এটি শুনলে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু এই সিপিটির যুক্ত প্রতিসাম্যতা, পদার্থবিজ্ঞানে একটি প্রমাণিত উপপাদ্য। Julian Schwinger নামের একজন অ্যামেরিকান পদার্থবিদের কাজের মধ্য দিয়ে এই উপপাদ্যের বিষয়টি প্রথম বোঝা গিয়েছিল। পরে ১৯৫৪ সালে গারহার্ট লুডারস (Gerhart Lüders) ও উলফগ্যাং পাউলি এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন।[৫] একই বছর জন বেল নামে আরেক বিজ্ঞানীও পৃথকভাবে এই উপপাদ্যটি প্রমাণ করে দেখান।

সিপিটি উপপাদ্যের অর্থ হলো, যদি কোনো তত্ত্ব আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মগুলো মেনে চলে, তবে তাকে অবশ্যই সিপিটির যুক্ত প্রতিসাম্য মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত যে, যদি কোনো মহাবিশ্ব অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে তৈরি হয়, কণিকাগুলো দেখতে আয়নার ছবির মতো উল্টো হয় আর সময় ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে চলে, তবে তেমন একটি মহাবিশ্ব থাকাটা একদম বাস্তব। অন্তত পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব তাই বলে।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে এমন কোনো তত্ত্ব থাকলেও সত্যি সত্যি এমন কোনো মহাবিশ্ব থাকাটা সম্ভব না। মজার বিষয় হলো, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো যে শুধু আমাদের মহাবিশ্বের মতোই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। বরং এটি ভাবাটাই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কিছুটা অবৈজ্ঞানিক। কারণ, তাহলে প্রশ্ন চলে আসবে আমাদের মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো কেনই বা এমন হলো? অন্য রকমও তো হতে পারত। এই প্রশ্নের উত্তর দেয় স্ট্রিং থিওরি। স্ট্রিং থিওরি অনুসারে একদম শূন্য থেকে অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের মহাবিশ্বই যে একমাত্র মহাবিশ্ব এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আর বিষয়টি এমন নয় যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই মহাবিশ্বগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে সময়ের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই। কেননা আমাদের দুনিয়ার সময়ের সাথে সেই সময়ের কোনো যোগাযোগ নেই। সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায়, আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার আগেও যেমন অসংখ্য

BanglaBook.org

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry

মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আমাদের এই স্থান-কালের বাইরে শূন্য থেকেই আরও বিশ্ব সৃষ্টি হয়েই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আর এই প্রতিটি মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো যে আমাদের মতোই হতে হবে, তেমন না। আমাদের মতো নিয়মসমৃদ্ধ মহাবিশ্বও যেমন আছে, তেমনি সম্পূর্ণ আলাদা নিয়মের মহাবিশ্বও আছে অসংখ্য। প্রায় $১০^{৫০০}$ রকম আলাদা আলাদা নিয়মের মহাবিশ্ব সম্ভব। এই সংখ্যাটি একটি অকল্পনীয় রকম বড় সংখ্যা। ফলে এমন একটি মহাবিশ্ব থাকাটা পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই বাস্তবসম্মত।

সিপিটি উপপাদ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সময়ের উল্টোদিকে চলা একটি মহাবিশ্ব থাকা সম্ভব। আর এটা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই আমরা পেয়েছি। তবে এমন মহাবিশ্ব থাকলেও আমরা কিন্তু সেই মহাবিশ্বের প্রাণীদের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারব না। কারণ তাদের সময়প্রবাহ আমাদের বিপরীত। আমরা যত দ্রুতই তাদের সাথে যোগাযোগ করি না কেন, তারা সেটি মনে রাখতে পারবে না। আমরা তথ্য পাঠানোর সাথে সাথেই তাদের সময়ে সেটা ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে। আবার তারা যদি আমাদের কোনো তথ্য পাঠায়, আমরা পাবার আগেই সেটি ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে। ফলে আমরাও সেই এলিয়েনদের পাঠানো কোনো তথ্য পাব না। ফলে সময়ের বিপরীত দিকে চলা মহাবিশ্বের প্রাণীদের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব না।

সময়ের উল্টো দিকে চলার মতো একটি মহাবিশ্ব থাকার পাশাপাশি আমাদের মহাবিশ্বের মধ্যেও এমন স্থান থাকতে পারে, যেখানে সময় বিপরীত দিকে বয়ে চলেছে।

হোয়াইট হোল

আমরা আগেই জেনেছি, মহাবিশ্বে যত রকম ঘটনা ঘটে তার মূলে রয়েছে চারটি মাত্র মৌলিক বল। মহাকর্ষ বাদে চারটি মৌলিক বলের তিনটিই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স তিনটি মৌলিক বলকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও, মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করতে পারে না (আমরা এখনো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্যে মহাকর্ষ বলের হিসেব-নিকেশ করতে শিখিনি)। মহাকর্ষকে বাদ দিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের

BanglaBook.org

সাহায্যে যখন একটি ব্ল্যাকহোলকে বর্ণনা করতে যাওয়া হয়, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটে। আমরা সময়কে সামনের দিকে অথবা পিছন দিকে যেদিকেই চালনা করি না কেন, এটি একটি ব্ল্যাকহোলের মতোই আচরণ করবে! কিন্তু যদি ঘটনার দিকে তাকাই তাহলে কি দেখতে পাব? দেখা যাবে ব্ল্যাকহোলটি এমন একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছে যা থেকে ক্রমাগত বস্তু ও শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোকিছুই এর ভেতরে প্রবেশ করছে না। ঠিক এমন বস্তুকেই হোয়াইট হোল বলা হয়। অর্থাৎ হোয়াইট হোল হচ্ছে ব্ল্যাকহোলের ঠিক বিপরীতধর্মী।

হোয়াইট হোল মূলত মহাবিশ্বের একটি হাইপোথিটিক্যাল বৈশিষ্ট্য। এখনো হোয়াইট হোল থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু নতুন কিছু গবেষণা হোয়াইট হোল থাকার বিষয়টিকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে। প্রথমে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেও, হোয়াইট হোল মূলত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের এক ধরনের সমাধান। আপেক্ষিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহাবিশ্বে যদি ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব থাকতে পারে তবে হোয়াইট হোলেরও অস্তিত্বও থাকতে পারে। একটি ব্ল্যাকহোলের সময়কে উল্টোদিকে প্রবাহিত করলে যা পাওয়া যাবে এটি মূলত তাই।

হোয়াইট হোলের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় তাত্ত্বিক সমস্যাটি তৈরি হয় এনট্রপি নিয়ে। এনট্রপি হলো কোনো সিস্টেমে বিশৃঙ্খলার পরিমাপ। তাপগতিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে, কোনো একটি ব্যবস্থার এনট্রপি শুধু বৃদ্ধি পেতে পারে, কখনোই কমতে পারে না (এনট্রপি কমা এক অর্থে সময় অতীতের দিকে প্রবাহিত হবার মতো)। হোয়াইট হোলের ক্ষেত্রে দেখা যায়- এটি সময়ের সাথে এনট্রপি কমাতে থাকে। অর্থাৎ সময় এখানে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে প্রবাহিত হয়।

ব্ল্যাকহোল ও হোয়াইট হোল দুটোই স্থান-কালের একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। এই ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থাগুলোকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এই দুই ধরনের বস্তুই সিঙ্গুলারিটির ফল হলেও দুই ধরণের সিঙ্গুলারিটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ব্ল্যাকহোলের সিঙ্গুলারিটিকে বলা হয় 'সংরক্ষিত সিঙ্গুলারিটি'। স্থান-কালের কোনো অবস্থানে যদি এমন সংরক্ষিত সিঙ্গুলারিটি থেকেও থাকে, তবুও আমরা তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে

BanglaBook.org

পারব না। এর মহাকর্ষীয় প্রভাব থেকে বুঝতে হবে যে এখানে একটি ব্ল্যাকহোল আছে। কারণ এর তীব্র মহাকর্ষ শক্তি আলোসহ কোনো প্রকার তথ্যই বাইরে পাচার হতে দেবে না। এই ধরনের সিঙ্গুলারিটির স্থানগুলো একটি ঘটনাদিগন্ত দিয়ে বেষ্টিত থাকে। ঘটনাদিগন্তের ভেতরে কী হচ্ছে তা কোনোভাবেই দেখা সম্ভব না। মূলত এই ঘটনাদিগন্তই এই ধরনের সিঙ্গুলারিটিকে সংরক্ষিত করেছে। গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, স্থান-কালের গঠন যখন ভেঙে পড়ে তখন সিঙ্গুলারিটি তৈরি হয়। আর এমন অস্বাভাবিক ঘটনাকে স্বাভাবিক স্থান-কাল থেকে আলাদা করতেই প্রকৃতি ঘটনাদিগন্তের মতো ব্যবস্থা তৈরি করে(?)

ব্ল্যাকহোলের সিঙ্গুলারিটি সংরক্ষিত হলেও, হোয়াইট হোলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন না। হোয়াইট হোলের সিঙ্গুলারিটিকে বলা হয় ন্যাকেড সিঙ্গুলারিটি। এসব ক্ষেত্রে কোনো ঘটনাদিগন্ত থাকে না। সমস্যা হলো, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছু সমাধান, এমন ন্যাকেড সিঙ্গুলারিটি অনুমোদন করে না। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধারণাটিকে, 'কসমিক সেন্সরশিপ হাইপোথিসিস' বলা হয়। তবে বিভিন্ন গাণিতিক সিমুলেশন ও কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সাম্প্রতিক তত্ত্ব এমন ধরনের সিঙ্গুলারিটি থাকার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়।

১৯৮০-এর দশকে হোয়াইট হোল থাকার ব্যাপারে খুবই ব্যতিক্রমধর্মী ও আকর্ষণীয় কিছু তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়। এই তত্ত্বগুলোর মূল কথা ছিল যে, একটি ব্ল্যাকহোল তৈরি হবার সময়, ব্ল্যাকহোলটির কেন্দ্রে একটি বিগ ব্যাং হওয়া সম্ভব, যা কিনা নতুন একটি মহাবিশ্ব তৈরি করবে। আর এই নতুন শিশু মহাবিশ্বটি (Baby Universe) মূল মহাবিশ্বের (Parent Universe) বাইরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

এ সংক্রান্ত প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। এলান গুথ ও ফারহি এডওয়ার্ড, 'ফিজিক্স লেটার বি' জার্নালে, 'An Obstacle to Creating a Universe in the Laboratory' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সেখানে তারা দেখান যে, ব্ল্যাকহোলের মতো একটি সিঙ্গুলারিটি তৈরি হবার সময় একটি নতুন বিগ ব্যাং ঘটতে পারে। তারা মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (Theory of cosmic inflation) ওপর ভিত্তি

BanglaBook.org

করে তাদের গণনাগুলো করেছিলেন। যদি এমনটি ঘটে থাকে, তবে কেন্দ্রে ঘটা বিগ ব্যাংটিকে এক ধরনের হোয়াইট হোল বলে মনে হবে। তবে হোয়াইট হোল থাকার বিষয়টি তাদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল না। গুথ ও এডওয়ার্ড মূলত দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কোনো সিঙ্গুলারিটি ছাড়া একটি মহাবিশ্বের শুরু হতে পারে না। ফলে গবেষণাগারে একটি বিগ ব্যাং ঘটানো সম্ভব না।

এরপর লি স্মোলিন মহাবিশ্বের বিবর্তনসংক্রান্ত একটি হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেন। তার এই হাইপোথিসিসেও গুথের মতো একটি ব্ল্যাকহোলের ভূমিকা ছিল। স্মোলিনের প্রস্তাবের মূলকথা ছিল- একটি ব্ল্যাকহোল ভেঙে পড়ার সময় তার ভেতরে একটি নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে স্মোলিন কিছু নতুন ধরণের ধারনার উপস্থাপনা করেছেন। তার হাইপোথিসিসের এই মহাবিশ্বটি জীবজগতের বিবর্তনের মতো বিবর্তিত হতে পারবে। জীবজগতে যেমন কোনো একটি প্রাণীর দেহে মিউটেশন বা অন্যান্য কারণে অনেক পরিবর্তন হয়ে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী প্রাণীটি টিকে থাকে, তেমনি স্মোলিনের এই মহাবিশ্বও কিছুটা তেমনভাবে বিবর্তিত হতে পারবে। অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে বিগ ব্যাং হবার ফলে নতুন নতুন যে মহাবিশ্ব তৈরি হবে সেটির পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বা মৌলিক ধ্রুবকগুলোর মান (যেমন- প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, ইলেকট্রনের ভর ইত্যাদি) মূল মহাবিশ্বের মতো নাও হতে পারে। এখন এই নতুন মহাবিশ্বের নিয়মগুলো যদি সুস্থিত হয়, তবে সেটি মূল মহাবিশ্বের মতো টিকে থাকবে। আর যদি টিকে থাকার মতো না হয়, তবে সেটির তাপীয় মৃত্যু হবে। এভাবে বিভিন্ন নিয়মযুক্ত মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটতে পারে। অর্থাৎ জীবজগতের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো, টেকসই মহাবিশ্বগুলোই শুধু টিকে থাকবে। স্মোলিনের ১৯৯৭ সালের, The Life of the Cosmos বইতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। স্মোলিনের এই ধরনের মহাবিশ্বকে বলা হয় ফিকান্ড ইউনিভার্স (Fecund universes)।

BanglaBook.org

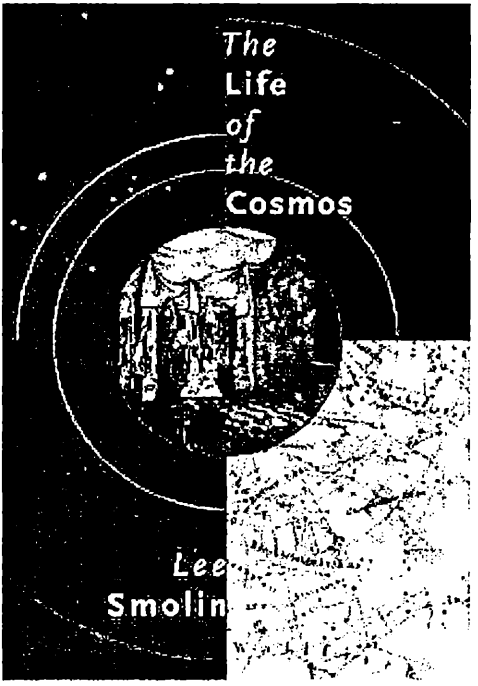

চিত্রঃ লাইফ অফ দ্যা কসনস বইয়ের প্রচ্ছদ

হোয়াইট হোলের প্রমাণিত না হলেও, এখনই এটাকে বাতিল করে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ গুথের গবেষণাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। আর গুথের বর্ণনা করা বিগ ব্যাং দেখতে একটি হোয়াইট হোলের মতোই মনে হবে।

সময়ের উল্টো দিকে চলা মহাবিশ্ব বা হোয়াইট হোলের মতো তত্ত্বীয় জিনিসের ক্ষেত্রে সময় বিপরীত দিকে চললেও, আমাদের বাস্তব জীবনে অতীত ও ভবিষ্যৎ খুব নির্দিষ্ট একটি বিষয় বাস্তবে কখনোই আমরা সময়কে বিপরীত দিকে যেতে দেখি না। পাশাপাশি কোনটি অতীত আর কোনটি ভবিষ্যৎ তা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ একটি ঘটনার কোনটি শুরু আর কোনটি শেষ তা নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া যায়।

খুব সাধারণ একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরুন টেবিলের উপর একটি কাচের পাত্র রাখা আছে এবার আমরা যদি পাত্রটিকে নিচে ফেলে দেই, তাহলে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে

BanglaBook.org

পড়ে থাকবে। এই ঘটনাটি যদি আমরা কোনো ভাল ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে ধারণ করি, তাহলে ঘটনার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে পরে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে। ভিডিওটি চালিয়ে দিলে দেখা যাবে প্রথমে কেউ একজন পাত্রটিকে আঘাত করল, তারপর তা মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। আবার ভিডিওটিকে উল্টো করে চালিয়ে দিলে দেখা যাবে পড়ে থাকা টুকরোগুলো প্রথমে জোড়া লেগে যেতে থাকল। এরপর একসময় তা টেবিলের নিচ থেকে উপরে উঠে টেবিলের উপর গিয়ে স্থির হয়ে থাকল। এখন ভিডিওটি সম্পর্কে আমরা কিছু না জেনেও বলে দিতে পারব ঘটনাটি আসলে কী ঘটেছিল। এমনকি যেকোনো ছোট বাচ্চাও বলে দিতে পারবে ভিডিওটিতে সময়ের দিক কোনদিকে। এটি সম্ভব হয় কারণ আমরা কখনোই একটি পাত্রকে টুকরো অবস্থা থেকে জোড়া লাগতে দেখি না। ফলে এই ঘটনাতে সময়প্রবাহের একটি নির্দিষ্ট দিক আছে। আর বাস্তব জীবনে আমরা তার কোনো ব্যতিক্রম দেখি না।

সময়প্রবাহের এই যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, অর্থাৎ অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাওয়া, আমাদের বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তা একদম সুনির্দিষ্ট। ফলে কোনটি অতীত আর কোনটি ভবিষ্যৎ তা বুঝতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হয় না। সময় প্রবাহের এই নির্দিষ্ট নিয়মকে সময়ের তীর (Arrow of Time) বলা হয়। 'সময়ের তীর' অর্থ হলো-সময়প্রবাহের একটি নির্দিষ্ট একমুখী দিক আছে।

ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন ১৯২৭ সালে প্রথম সময়ের তীর(Arrow of Time) ধারণা প্রস্তাব করেন। এডিংটনের প্রস্তাব করা ধারণা অনুসারে- সময় সব সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে সময়ের প্রবাহকে অপ্রতিসম (Asymmetric) বলে ভাবা হয়।

এডিংটন মূলত অণু-পরমাণুদের একটি নির্দিষ্ট সজ্জার ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকেই একটি চারমাত্রিক মানচিত্রের মতো ধরে নিয়েছিলেন। তার মতে, অণুগুলো সব সময় সুশৃঙ্খল সজ্জা থেকে একটি বিশৃঙ্খল

BanglaBook.org

অবস্থার দিকে যেতে চায়। এডিংটনের মতে, অণুদের এই বিশেষ একটি দিকে যাবার বিষয়টি তীরের মতো।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সময়ের তীর আবিষ্কার করা হয়েছে।

তাপগতীয় সময়ের তীর (The thermodynamic arrow of time)

মহাজাগতিক সময়ের তীর (The cosmological arrow of time)

তেজস্ক্রিয় সময়ের তীর (The radiative arrow of time)

কার্য-কারণসংক্রান্ত সময়ের তীর (The causal arrow of time)

কণা পদার্থবিজ্ঞানের (দুর্বল বলের) সময়ের তীর (The particle physics (weak) arrow of time)

কোয়ান্টাম সময়ের তীর (The quantum arrow of time)

সময়ের কোয়ান্টাম উৎস (The quantum source of time)

মনস্তাত্ত্বিক সময়ের তীর (The psychological/perceptual arrow of time)

উপরে যেসব সময়ের তীরের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটির প্রভাব আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সময়ের তাপগতীয় তীর, মহাজাগতিক তীর ও মনস্তাত্ত্বিক তীর।

সময়ের তাপগতীয় তীর মূলত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসে। সময়ের তাপগতীয় তীরের অর্থ হলো সময়ের সাথে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, কোনো একটি বদ্ধ সিস্টেমে (close system) সময়ের সাথে এনট্রপির (Entropy) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোনো একটি সিস্টেমের বিশৃঙ্খলার পরিমাপকেই এনট্রপি বলা হয়। তার মানে, বিশৃঙ্খলা যত বেশি এনট্রপিও তত বেশি। আমরা বাস্তব জীবনেও এই সূত্রের প্রভাব লক্ষ করি। যেকোনো সজ্জাই সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সহজেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু বিশৃঙ্খল অবস্থান থেকে কখনোই সুশৃঙ্খল অবস্থায় যেতে দেখি না। ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ কাজ করলেই ঘরটি এলোমেলো হয়ে যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে না গোছালে তা

BanglaBook.org

কখনোই গোছানো অবস্থায় চলে আসে না। এটি এক ধরনের মারফির বিধি (Murpy's law); জিনিসপত্র সব সময়ই এলোমেলো হয়ে যেতে চায়। উপরের দেওয়া কাচের পাত্র ভাঙার উদাহরণটিও মারফির বিধির একটি সুন্দর উদাহরণ। ইচ্ছে করলেই টেবিলের উপর থেকে একটি কাচের পাত্রকে ভেঙে ফেলা যায়, কিন্তু তাকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়াটা সম্ভব না।

মহাজাগতিক সময়ের তীরের অর্থ হলো সময় প্রবাহের দিক আর মহাবিশ্বের প্রসারণের দিক একই থাকে। অর্থাৎ সময়ের যে অভিমুখে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, সময়ও সেই অভিমুখে বয়ে চলবে।

সময়ের যতগুলো তীর আছে এর ভেতর আমাদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, 'সময়ের মনস্তাত্ত্বিক তীর'। আমরা যে অভিমুখে সময়ের প্রবাহ অনুভব করি সেটিই হলো সময়ের মনস্তাত্ত্বিক তীর। আমরা অতীত মনে রাখাতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। ফলে আমাদের মস্তিষ্কের কাছে সময়ের এই তীরটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের এই তীর কার্যকর থাকার কারণে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সাহায্য নিয়ে আমরা প্রজাতি রক্ষা করতে পারি। মস্তিষ্কের এই ক্রিয়া অনেক সময় আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সিনেস্থেসিয়া (Synesthesia) নামে একটি বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীরা সময়ের প্রবাহ দেখতে পারে (আক্ষরিক অর্থে নয়, তবে তারা মাস ও দিনকে তাদের নিজেদের স্থানের চারদিকে দেখে থাকে। এমনকি কিছু লোক সময়কে তাদের চারপাশে একটি ঘড়ির আবর্তের মতো দেখে)।

আমরা সময়ের এই একমুখী প্রবাহের সাথে পরিচিত হলেও বিজ্ঞানের নিয়মগুলো কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। উপরে যে বিপরীত মহাবিশ্বের কথা বলা হয়েছে সে কথা যদি বাদও দিই, তবুও আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি, সেই মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞনের যে সূত্র রয়েছে তার সবগুলোতেই সময়ের বিপরীতমুখিতা গ্রহণযোগ্য। আমাদের মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক ঘটনামালার বর্ণনায় যেসব সমীকরণে সময়

BanglaBook.org

একটি ধনাত্মক রাশিরুপে উপস্থিত হয়, সেখানে যদি ঋণাত্মক রাশিরূপে সময়কে ব্যবহার করা হয়; অর্থাৎ "t" এর পরিবর্তে যদি "-t" বসানো যায়, তাহলেও সেই সমীকরণগুলো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। এই বিষয়টি নিউটনের বলবিদ্যা, আইনস্টাইনের তত্ত্ব, শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণ বা ডিরাকের সমীকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো যদি এমনই হয়, তবে বাস্তব জীবনে কেন সময় একমুখী আচরণ করে? আসলে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য, 'বাস্তব সময়' ও 'কাল্পনিক সময়' সম্পর্কে কিছু কথা জানা দরকার। পাশাপাশি, 'প্রান্তহীনতার শর্ত' সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন।

কাল্পনিক সময়

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে স্থান-কালের প্রকৃতি খুব ভালোমতোই ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মহাবিশ্বকে ভালোমতো বোঝার জন্য সব সময় এই তত্ত্ব দিয়ে কাজ চলে না। যেমন অতি-পারমাণবিক কণিকাদের আচরণ ব্যাখ্যার জন্য আইনস্টাইনের তত্ত্ব কোনো কাজে আসে না। এসব ক্ষুদ্র কণিকার আচরণ ব্যাখ্যার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্য নেওয়া হয়। অতি-পারমাণবিক কণিকাদের আচরণ ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবই সফল। কিন্তু শুধু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্যে আবার বৃহৎ জগতের কোনো বস্তুর আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে প্রকৃতিতে এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুটোই ব্যবহার করতে হয়।

একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ব্ল্যাকহোলের কথাই ধরা যাক। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে কী ঘটছে তা জানার জন্য আমাদের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুটোই ব্যবহার করতে হবে। কারণ ব্ল্যাকহোলের প্রচণ্ড ভর, স্থান-কালকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেয় যে, সেখানে আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণ ভেঙে পড়ে। আর ব্ল্যাকহোলের ভেতরটায় পদার্থ কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; ভেঙেচুরে এমন অবস্থায়

BanglaBook.org

থাকে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ছাড়া সেই অবস্থা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। তবে এত বিশাল ভরের বস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্যতো আপেক্ষিক তত্ত্বেরও দরকার। ফলে এমন পরিস্থিতিতে আমাদের একই সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিক তত্ত্ব দুটোরই প্রয়োজন হয়।

আবার সৃষ্টির একদম শুরুতেও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সমীকরণগুলো কাজ করে না। শুরুটা ছিল একই সাথে একটি কোয়ান্টাম ঘটনা ও স্থান-কালের বক্রতার সৃষ্ট। সেই সময়টা ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের দুটি তত্ত্বকে একই সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বুঝতে হলে আমাদের একই সাথে স্থান-কালের বক্রতা আর বস্তুর কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য দুটোই জানতে হবে। তাই এই পরিস্থিতিতে আমাদের আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্বের সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সমন্বিত করতে হয়।

মহাকর্ষের সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সমন্বিত করা হলে কাল্পনিক সময় (Imaginary Time) বলে একটি জিনিস পাওয়া যায়। কাল্পনিক সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই সময়ের সম্মুখ দিক ও বিপরীত দিকের সাথে কোনো পার্থক্য করা সম্ভব না। অর্থাৎ স্থানের ক্ষেত্রে যেমন কেউ চাইলেই উত্তর বা দক্ষিণ যেকোনো দিকেই যেতে পারে, তেমনি কাল্পনিক সময়ে কেউ চাইলে ইচ্ছে করলেই অতীতে যেতে পারে আবার দিক ঘুরিয়ে ভবিষ্যতেও চলা শুরু করতে পারে। অর্থাৎ এই সময়ের কোনো নির্দিষ্ট তীর বলে কিছু নেই।

এই কাল্পনিক সময়ের নাম 'কাল্পনিক' দেখে হেলাফেলা করার কিছু নেই। আমাদের বাস্তব সময় যেমন মহাবিশ্বের একটি গাঠনিক উপাদান, তেমনি মহাবিশ্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে এই কাল্পনিক সময়ও তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু আমরা কাল্পনিক সময়ে বিচরণ করতে পারি না বলে এর নাম কাল্পনিক সময় হয়ে গেছে। কিন্তু মহাবিশ্বের নিজস্ব গঠনের কাছে এই সময় ঠিকই বাস্তব।

BanglaBook.org

প্রান্তহীনতার শর্ত

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ও জেমস হার্টলি দেখিয়েছেন সৃষ্টির মুহূর্তে কাল বা সময় বলে কিছু ছিল না। সে সময় চারটি মাত্রাই ছিল স্থানের। এই বিষয়টিকে গণিতের সাহায্যে চিত্রায়িত করলে বলা যায়, মহাবিশ্বের আকারের মতো এর ইতিহাসও কোনো বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্র হতে পারে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। একটি গোলকের পৃষ্ঠের কোনো কেন্দ্র বা শেষ থাকে না। পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর কোনো শেষ সীমানা নেই। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা যাবে পুরো পৃথিবী ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে আসতে হবে। কেননা এর দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠটি বাঁকা হয়ে একটি ত্রিমাত্রিক গোলকে পরিণত হয়েছে। আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তেমনই হবে। আমরা মহাবিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে সোজা ভ্রমণ করতে থাকলে, পুরো মহাবিশ্ব ভ্রমণ করে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসব। কারণ আমাদের মহাবিশ্বটি একটি ত্রিমাত্রিক গোলক হয়েও স্থানের বক্রতার কারণে বেঁকে একটি চতুর্মাত্রিক হাইপার-স্ফেয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই এই মহাবিশ্বেরও কোনো শেষ নেই। এখন মজার বিষয় হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তে যদি সময়ও স্থানের আরকটি মাত্রা হিসেবে থাকে, তাহলে মহাবিশ্বের স্থানের মতো এর ইতিহাসও (সময়) একটি বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্র হতে পারে!!! (কিন্তু এই গোলকটি সাধারণ গোলক নয়, এটি হাইপার-স্ফেয়ার বা উচ্চমাত্রিক গোলক)। এক্ষেত্রে সময়ও একটি বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্রে আবদ্ধ, আর সময়ের শুরু বা শেষ বলে কিছু নেই। এই ধারণাটিকে বলা হয়, 'প্রান্ত-হীনতার শর্ত' বা 'No boundary Condition।'

BanglaBook.org

এই প্রান্তহীনতার শর্ত মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিকল্প ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে একটি কণিকা শুধু একটি নির্দিষ্ট পথেই ভ্রমণ করে না, বরং সম্ভাব্য সকল পথ দিয়েই চলাচল করে। ফলে এসব কণিকার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট একটি

অতীত থাকে না। এই বিকল্প অতীতের কথা শুনতে একটু অদ্ভুত শোনালেও এগুলো সবই পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা ফলাফল।

১৯৯৯ সালে অস্ট্রিয়ার একদল বিজ্ঞানী ৬০টি কার্বন পরমাণু দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের অণু তৈরি করেন। এগুলো দেখতে ছিল ফুটবলের মতো গোল। ফুটবল আকৃতির এসব বলকে বাকিবল নামে ডাকা হয়। তাদের পরীক্ষাটি বেশ সহজ। তারা বাকিবলগুলোকে একটি নির্দিষ্ট বেগে একটি দেয়ালের দিকে ছুড়ে দেবেন। দেয়ালটিতে দুটি ছিদ্র থাকবে। তারা দেয়ালের পেছনে একটি পর্দার মতো একটি বস্তু বসিয়েছিলেন যাতে ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাওয়া বলগুলোকে নির্ণয় ও গণনা করা যায়।

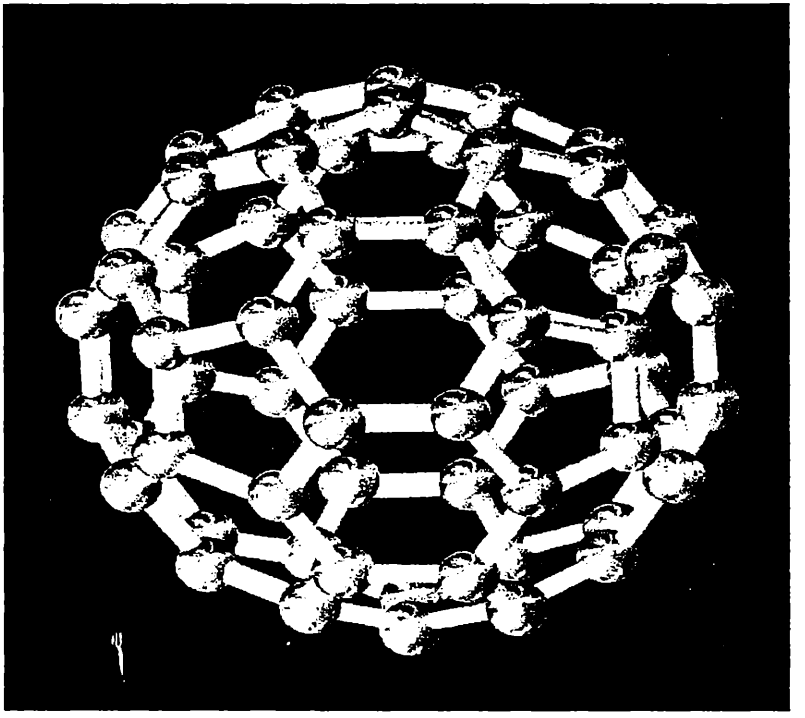

চিত্র : ৬০টি কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি বাকিবল।

আমরা এই পরীক্ষাটিকে সত্যিকারের ফুটবল ও দুটি ফাটলবিশিষ্ট একটি দেয়ালের সাহায্যেও করতে পারি। যদি কেউ একটি ফুটবল দিয়ে এই দেয়ালের দিকে লাথি মারতে থাকে তাহলে কিছু বল দেয়ালে গায়ে লেগে ফিরে আসবে, আর যেগুলো ফাটল বরাবর যাবে সেগুলো ফাটল দিয়ে বেরিয়ে দেয়ালের ওপারে চলে যাবে। এখন এই ফাটল দুটির আকার যদি

স্রেফ ফুটবলের আকারের থেকে একটু বেশি হয় তাহলে আমরা দেয়ালের অপর পাশে দুটি নির্দিষ্ট জায়গায় বলগুলোকে আসতে দেখব। এখন ফাটলগুলোর আকার যত বড় করা যাবে, ফুটবলগুলোও তত বেশি ছড়িয়ে পড়বে (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

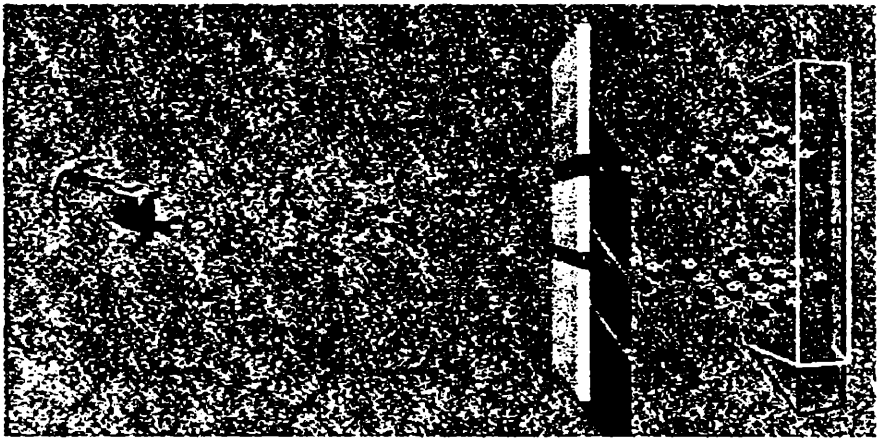

ছবির উৎসঃ দ্যা গ্র্যান্ড ডিজাইন, স্টিফেন হকিং

লক্ষ করুন, আমরা যদি দুটি ফাটলের মধ্যে একটি ফাটল বন্ধ করে দিই তাহলে কী হবে সেটা আমরা সবাই জানি। এখন যে ফাটলটি খোলা আছে শুধু সেই ফাটল দিয়ে বলগুলো বের হয়ে আগে যেখানে পৌঁছাত সেখানে যাবে। আর বন্ধ ফাটল দিয়ে বল বের না হতে পারার কারণে আগে এই ফাটল দিয়ে যেখানে বল পৌঁছাত সেখানে কোনো বলই পৌঁছাবে না। একটি ফাটল বন্ধ করে দিলে অন্য খোলা ফাটল দিয়ে বের হয়ে যাওয়া বলের উপর তার কোনো প্রভাবই পড়বে না। এখন আবারও যদি দ্বিতীয় ফাটলটি খুলে দেওয়া হয় তাহলে আগের ছিদ্র দিয়ে তো বল আসবেই, পাশাপাশি নতুন ফাটল দিয়েও বল আসা শুরু করবে। তার মানে বলা যায়, কোনো একটি ছিদ্র বন্ধ করলে বা খুলে দিলে অন্য ছিদ্র দিয়ে বল আসার পরিমাণ বাড়বে-কমবে না।

কিন্তু বাকিবল দিয়ে বিজ্ঞানীরা যে পরীক্ষাটি করলেন তার ফলাফল কিন্তু মোটেও এরকম না। তারা দেখতে পেলেন যখন দুটি ছিদ্রই খোলা ছিল তখন: একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বেশ কিছু বল আছে, আর এর মাঝের জায়গাগুলোতে কোনো বলই নেই (নিচের চিত্র)।

BanglaBook.org

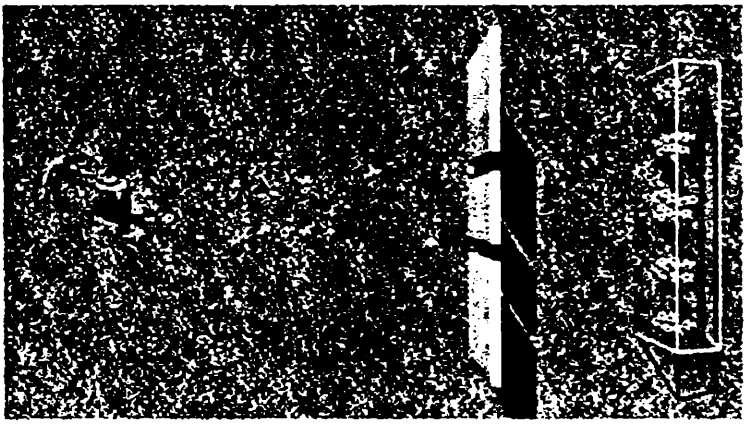

ছবির উৎসঃ দ্যা গ্র্যান্ড ডিজাইন, স্টিফেন হকিং

কিন্তু এরকম কেন হবে? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এরকম হওয়া পুরোপুরি অসম্ভব। কারণ আগের চিত্রের মতো যেখানে ফাটল আছে শুধু সেই বরাবর বলগুলোকে পাবার কথা।

উনবিংশ শতাব্দীতে থমাস ইয়ং নামে একজন ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম উপরের এই পরীক্ষাটি করেন। তার নাম অনুসারে এই পরীক্ষাটিকে ইয়ং-এর দ্বি-চির পরীক্ষা বলা হয়। ইয়ংয়ের পরীক্ষা আর আমাদের পরীক্ষাটি একই রকম। শুধু বাকিবলের বদলে তিনি আলো ব্যবহার করেছিলেন। তিনি পরীক্ষাটি করেছিলেন আলোর তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণ দেওয়ার জন্য। ইয়ং আলো নিয়ে যখন পরীক্ষাটি করলেন, তখন দেখা গেল ছিদ্রযুক্ত দেয়ালের পেছনে কিছুটা জায়গা আলো তারপর আবার কিছুটা জায়গা অন্ধকার, এরপর আবারও কিছুটা জায়গা আলোর পরে আবারও অন্ধকার। এভাবে আলো-অন্ধকারের একটি ডোরাকাটা ছাপ পড়েছে। এই ডোরাকাটা দাগগুলোকে শুধু আলোর তরঙ্গ ধর্ম দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি একটি তরঙ্গ যখন আরেকটি তরঙ্গের উপর আছড়ে পড়ে তখন দুটি তরঙ্গ সমদশায় থাকলে গঠনমূলক ব্যাতিচার হয় আর বিপরীত দশায় মিলিত হলে একে অন্য ধ্বংস করে ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার ঘটে। আলোর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। দুটি ভিন্ন ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা দুটি আলোর তরঙ্গ যখন সমদশায় মিলিত হয়েছে তখন গঠনমূলক ব্যাতিচার হয়েছে; আর তরঙ্গের এই উপরিপাতনটি পর্দার যেসব জায়গায়

BanglaBook.org

হয়েছে সেখানে সাদা ছাপ পড়েছে। আবার যেখানে দুটি বিপরীত দশার আলোর তরঙ্গ মিলিত হয়েছে সেখানে একটি আলোর তরঙ্গ অন্যটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, ফলে সেখানে কোনো আলোই পড়েনি। তাই সেসব জায়গা অন্ধকার রয়ে গেছে। এই দ্বি-চির পরীক্ষার সাহায্যেই ইয়ং নিউটনের কণাতত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন আলো আসলে একধরনের তরঙ্গ।

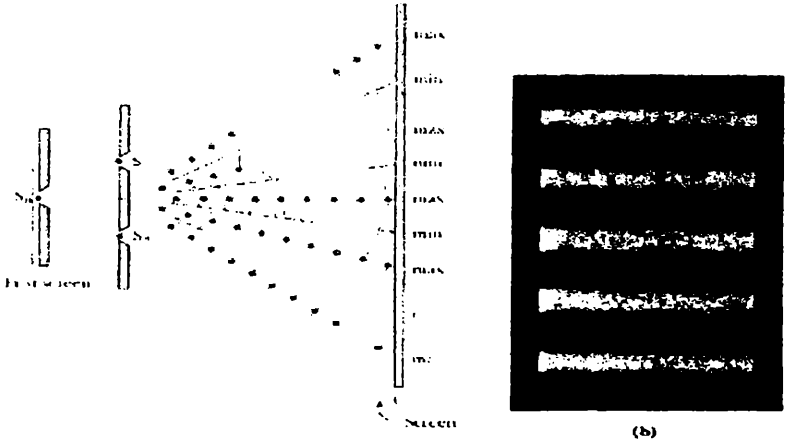

চিত্র : ইয়ং এর দ্বী-চীর পরীক্ষায় আলো ও অন্ধকারের ব্যাতিচারী ছাপ দেখা যাচ্ছে।

ইয়ং-এর পরীক্ষায় তো আলোর মতো একটি তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই আমরা দেয়ালের পেছনের পর্দায় ব্যাতিচারী ছাপ পেলাম। কিন্তু আমাদের অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদরা তো কোনো তরঙ্গ ব্যবহার করেননি। তাদের পরীক্ষায় ৬০টি পরমাণু দিয়ে তৈরি বড়সড় একটি অণু ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে পর্দার পেছনে ব্যাতিচারের ছাপের মতো অণুগুলোকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পাওয়া গেল কেন?

আণুবীক্ষণিক কণাদের এই ব্যাতিচার ধর্ম রিচার্ড ফাইনম্যানকে খুব ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। অতিক্ষুদ্র কণিকাদের ওপর করা বিভিন্ন পরীক্ষার থেকে ফাইনম্যান বেশ কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান, আমাদের বাস্তব জগতের সাথে যার কোনো মিলই নেই। ফাইনম্যানের বিবরণ অনুযায়ী, পারমাণবিক কণিকারা কোনো নির্দিষ্ট পথে চলাফেরা করে না। বরং তারা সম্ভাব্য সকল পথেই চলাফেরা করে। অন্যভাবে বলা যায় একটি কণিকার শুধু একটি

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট ইতিহাস থাকে না, বরং এর সকল সম্ভাব্য ইতিহাস থাকে। তার মতে, যখন আমাদের পরীক্ষায় দুটি ফাটলই খোলা ছিল, তখন বাকিবলগুলো একই সাথে দুটি পথ দিয়েই পার হয়ে, নিজেই নিজের উপর উপরিপাতন হয়ে ঐরকম ব্যাতিচারী আচরণ করে! তাই যদি কেউ বাকিবলের মতো ক্ষুদ্র আকার ধারণ করতে পারে তবে অনায়াসেই একই সময় দুটি জায়গায় থাকতে পারবে।

এই পরীক্ষার সাহায্যে বোঝা গেল যে কোয়ান্টাম কণিকা শুধু একটি পথে চলাচল না করে, একটি জায়গা থেকে অন্য আরেকটি জায়গায় যাওয়ার সবগুলো পথ দিয়ে একই সাথে যায়। ধরুন আপনার বাসা থেকে ১ কিলোমিটার দূরে একটি বড় খেলার মাঠ আছে। এই মাঠে যাবার জন্য আপনার বাসা থেকে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। আপনি ইচ্ছা করলেই কোনো রিকশা নিয়ে সোজা রাস্তায় সরাসরি মাঠে চলে যেতে পারেন, আর আপনি নিয়মিত তাই করেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, আপনি যদি কোনো ইলেকট্রনকে এই কাজটি করতে দেন, তাহলে সে শুধু সোজা রাস্তায়ই যাবে না। আপনার বাসা থেকে ঐ মাঠে যাবার যতগুলো রাস্তা উপায় আছে সে সব উপায়েই যাবে। এমনও হতে পারে এটি পুরো পৃথিবীকে দু-তিনবার ঘুরে তারপর মাঠে গিয়ে পৌঁছাবে। আর সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, এটি কিন্তু প্রথমে একটি রাস্তা দিয়ে যাবে তারপর আরেক রাস্তা দিয়ে যাবে এরকম না। বরং সে একই সাথে সকল রাস্তা দিয়েই যাবে। এসব শুনে কারও মনে হতে পারে এ আবার কেমন বৈজ্ঞানিক নিয়ম! কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এরকম উদ্ভট অনুসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা পরীক্ষার ফলাফলের সাথে হুবহু মিলে যায়।

উপরের পরীক্ষার মূল বিষয় হলো একটি সিস্টেম শুধু একটি নির্দিষ্ট ঘটনা প্রবাহ থাকে না বা কোনো একক ইতিহাস থাকে না। তার বদলে প্রতিটি ঘটনার অনেকগুলো বিকল্প ইতিহাস থাকে।

এবার আমাদের উপরের পরীক্ষাটির কথা ভাবা যাক। আমরা দেখেছিলাম, যখন দুটি ছিদ্রই খোলা ছিল, তখন বাকিবলগুলো উভয় ছিদ্র দিয়ে একই

BanglaBook.org

সাথে পার হয়ে পর্দায় ব্যাতিচারী ছাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরেকটি নিয়ম আরও ভূতুড়ে। এই নিয়ম অনুযায়ী, আমরা যদি কোনোভাবে দেখে ফেলতে পারি যে বাকিবলগুলো আসলে কোনো ছিদ্র দিয়ে পার হয়েছে, তখন এটি একটি নির্দিষ্ট ছিদ্র দিয়েই পার হবে। তার মানে আমরা যদি পর্যবেক্ষণ না করি তাহলে কণাগুলো একই সাথে দুটি ছিদ্র দিয়েই পার হবে, কিন্তু আমরা পর্যবেক্ষণ করলে সেটি ঠিকই নির্দিষ্ট কোনো ছিদ্র দিয়েই যাবে। সত্যিই যখন গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাটি আবার করলেন তখন পর্দার আগেই মাঝপথে দুটি ডিটেক্টর লাগিয়ে দিলেন, যেন বোঝা যায় বলটি কোনো ছিদ্র দিয়ে গেছে এবং তখন দেখা গেল ডিটেক্টর লাগানো অবস্থায় বলগুলো কোনো ব্যাতিচারী ছাপ ফেলছে না। কিন্তু ডিটেক্টর খুলে দিলেই আবারও আগের মতোই ব্যাতিচারী ছাপ দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখলাম ডিটেক্টর না লাগিয়ে পরীক্ষাটি করলে ব্যাতিচারী ছাপ তৈরি হয়, কারণ অণুগুলো তখন একই সাথে দুটি পথ দিয়ে পার হয়। আবার ডিটেক্টর লাগালে অণুগুলো একটি নির্দিষ্ট ফাটল দিয়েই পর্দায় পৌঁছে।এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, আমাদের ডিটেক্টর যখন অণুগুলোকে শনাক্ত করেছে, তখন কিন্তু অণুগুলো ইতিমধ্যেই ফাটল দিয়ে পার হয়ে ফেলেছে। কিন্তু তারপরও কণাটি একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে পর্দায় পৌঁছাবে কিনা তা নির্ধারিত হচ্ছে শুধু আমাদের পর্যবেক্ষণের কারণে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলাফলও পর্যবেক্ষণের পরে নির্ধারিত হচ্ছে। কেননা অণুটি কি একটি ফাটল দিয়ে পার হয়েছে, নাকি উভয় দিয়ে পার হয়েছে সেটি আগেই ঘটে গেছে। তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মই এমন, এমনকি ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলাফলও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে। যতক্ষণ না আমরা পর্যবেক্ষণ করব ততক্ষণ আসলে কিছুই নির্ধারিত হবে না।

BanglaBook.org

এই বিষয়টি, সময় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তন করে দিচ্ছে। কারণ এসব বিবেচনায় আনলে দেখা যায় অতীতের কোনো নির্দিষ্ট

রূপ নেই। ভবিষ্যতে কী হবে আমরা যেমন জানি না, তেমনি অতীত সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা রয়েছে! উপরের কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে করা কোনো পর্যবেক্ষণও কোনো ব্যবস্থার অতীতকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

এই অতীত পরিবর্তন হবার বিষয়টি কিন্তু আমরা আরও বড় পরিসরে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। হুইলার এই কাজটি করার জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। এক্ষেত্রে বাকিবলের বদলে থাকবে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসা ফোটন (আলোর কণিকা)। এ ধরনের আলোকরশ্মিকে দুটি পথে ভাগ করা যায়। কারণ এত দূর থেকে আসার সময় এগুলো মধ্যবর্তী কোনো গ্যালাক্সির মহাকর্ষীয় লেন্সের মাধ্যমে ফোকাস হয়ে পৃথিবীতে আসে। যদিও এই পরীক্ষা আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির নাগালের বাইরে, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রযুক্তিগত উন্নতি হলে এমন পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। যদি আমরা কোনোভাবে এরকম দূরবর্তী উৎস থেকে আসা যথেষ্ট পরিমাণ ফোটন সংগ্রহ করতে পারি তাহলে দেখা যাবে তারা অবশ্যই ব্যাতিচারী ছাপ তৈরি করবে। আর যদি ফোটন ডিটেক্টরে ফোটন পৌঁছানোর আগেই আমরা দেখে ফেলি কোনো পথ দিয়ে কণিকাটি এসেছে, তাহলে সেটি আর ব্যাতিচারী ছাপ তৈরি করবে না। ফোটনটি মধ্যবর্তী গ্যালাক্সিটি পার হবার সময় দুটি পথের কোনটি দিয়ে পার হয়েছে সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে বিলিয়ন বছর আগে, হয়তো আমাদের পৃথিবী ও সৌরজগৎ সৃষ্টিরও আগে। তবুও বিলিয়ন বছর পরে করা আমাদের কোনো পর্যবেক্ষণ, সেই সুদূর অতীতকে প্রভাবিত করবে।

BanglaBook.org

আমরা আগেই জেনেছি মহাবিশ্বের শুরু ব্যাখ্যা করার জন্য শুধু আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব হলেই চলে না, কোয়ান্টাম মেকানিক্সেরও সাহায্য নিতে হয়। অর্থাৎ এটি একটি কোয়ান্টাম ঘটনা। আর আদি মহাবিশ্বের জন্য তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মগুলোও প্রযোজ্য।

এখন মজার বিষয় হলো মহাবিশ্বের শুরুটা যদি একটি কোয়ান্টাম ঘটনা হয়ে থাকে তবে উপরের আলোচনা করা বিকল্প ইতিহাসের বিষয়টি মহাবিশ্বের নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ফলে আমরা যে ভাবছি মহাবিশ্বের শুধু একই রকম ইতিহাস বিদ্যমান সেই ধারণা আর টিকে থাকছে না। তার পরিবর্তে সকল সম্ভাব্য ইতিহাসযুক্ত মহাবিশ্বের কথা মেনে নিতে হচ্ছে।

আমরা উপরে যে প্রান্তবিহীন প্রস্তাবনার কথা বলেছি, সে অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্বকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ধরা হয়। বিষয়টিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা যেতে পারে। ধরা যাক মহাবিশ্বের ইতিহাসের শুরু বা সময়ের শুরু হলো উত্তর মেরুতে। এখন পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা যদি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকি তাহলে পৃথিবীর অক্ষাংশের বৃত্তগুলোর আকার বড় হতে থাকবে। এই বিষয়টিকে আমাদের মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করলে বলা যায়- কাল্পনিক কাল বরাবর উত্তর মেরু থেকে যত দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাবে ততই মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে থাকবে (বিগ ব্যাং-এর পরে সময়ের সাথে মহাবিশ্বের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে)। এখন লক্ষ করার মতো বিষয় হলো উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে অক্ষাংশের বৃত্তগুলোর আয়তন শূন্য হলেও এই বিন্দুগুলো কিন্তু অনন্য কিছু না। অর্থাৎ উত্তর মেরুতে পৃথিবী শুরু হয়ে থাকলেও এই বিন্দু পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্য যেকোনো বিন্দুর মতোই সাধারণ বিন্দু। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিবেচনা না করলে (কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বকে সমন্বিত না করলে) গণনা থেকে দেখা যায় এই বিন্দুগুলো অনন্য (Contain Singularity of Gravitational field), আর এখানে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কাজ করে না। কিন্তু এই প্রান্তবিহীন প্রস্তাবনা ও বিকল্প ইতিহাসের সাহায্যে গণনা করা হলে দেখা যায়- এখানেও কোনো অনন্যতা নেই। ফলে কাল্পনিক কালের সমগ্র মহাবিশ্ব ভ্রমণ করা যায় অতীত বা ভবিষ্যতে। এখানে অতীতে বা ভবিষ্যতে ভ্রমণ করার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। আর মহাবিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র বিন্দুতে ঘুরে এলেও কোনো অনন্যতার দেখা পাওয়া যাবে না বা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম কোথাও ভেঙে পড়বে না।

BanglaBook.org

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম মহাবিশ্বের নিজের কাছে (For self-contained universe itself) কাল্পনিক কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই কাল্পনিক কালে সময়ের যেকোনো অভিমুখে ভ্রমণ করা যায়। এখানে সময়ের কোনো নির্দিষ্ট তীর নেই। কিন্তু বাস্তব সময়ের ক্ষেত্রে তাকালে দেখা যাবে, সময়ের সামনের দিকে ও পেছনের দিকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এসব বিষয় ভাবলে আমাদের সামনে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন চলে আসে।

অতীত ও ভবিষ্যতের এই পার্থক্যের উৎস কী?

বাস্তব সময়ের কেন একটি নির্দিষ্ট তীর থাকবে?

আমরা আগে সময়ের যে তিনটি তীর নিয়ে আলোচনা করেছি, সেই তিনটি তীরই কেন একই দিকে হবে?

কাল্পনিক কালের সাহায্যে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যায়। আমরা মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করছি। এই সময়টি বিগ ব্যাং থেকে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পরের একটি সময়। এখন একটি বিষয় ভালোমতো বুঝতে হবে যে, কাল্পনিক কালের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা মহাবিশ্বের সকল বিকল্প ইতিহাস বিবেচনায় আনলে। স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাবিশ্বের কাছে এই সময় বিদ্যমান হলেও, আমরা কিন্তু মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসে অবস্থান করছি। ফলে আমাদের কাছে এই কাল্পনিক সময় দৃশ্যমান হবে না। এক কথায় বললে বলা যায়, আমরা বাস করছি মহাবিশ্বের অনেকগুলো বিকল্প ইতিহাসের মধ্যে শুধু একটি ইতিহাসের বাস্তব সময়ে। আর বাস্তব সময়ের ক্ষেত্রে তো সময়ের নির্দিষ্ট তীর রয়েছে। ফলে আমাদের কাছে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে রয়েছে অনেক বড় পার্থক্য।

তাহলে এবার প্রশ্ন হলো, 'বাস্তব সময়ের তিনটি তীরই কেন একই দিকে হবে?' স্টিফেন হকিং তার 'ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম' বইতে এই প্রশ্নটির খুব সুন্দর একটি সমাধান দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, তাপগতীয় তীরই মনস্তাত্ত্বিক তীরকে নির্ধারণ করে। প্রথমে তাপগতীয় তীর নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি সুশৃঙ্খল অবস্থার চাইতে বিশৃঙ্খল

BanglaBook.org

অবস্থার সংখ্যা সব সময়ই বেশি হয়। আর এই বিষয়টি থেকেই মূলত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি বেরিয়ে আসে। জিগ-স (Jigsaw) পাজলের দিকে ভালো করে লক্ষ করলেই অবশ্য বিষয়টি বোঝা সম্ভব। জিগ-স (Jigsaw) পাজলের সাথে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। এই খেলায় অনেকগুলো টুকরো ছবি থাকে। টুকরোগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে একটি নির্দিষ্ট ছবি তৈরি করা যায়। এই টুকরোগুলোকে ইচ্ছে করলে অনেকভাবে সাজানো যায়। কিন্তু শুধু একটি বিন্যাসের ফলেই ছবিটি তৈরি হয়। এই বিন্যাস বাদে অন্য যেকোনো বিন্যাসেই কোনো ছবি তৈরি হবে না।

লক্ষ করুন, বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা অনেক হলেও সুশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা মাত্র একটি। একটি জিগ-স পাজলকে যদি সুশৃঙ্খল অবস্থায় রাখা যায়, তাহলে সেটি একটি ছবি তৈরি করবে। এবার এই পাজলটিকে এলোমেলোভাবে একটি ঝাকি দিলে সম্ভবত সেটি একটি বিশৃঙ্খল বিন্যাস হবে। ফলে এটি আর কোনো চিত্র গঠন করতে পারবে না। এখন এই পাজলকে যত বেশি বার ঝাঁকি দেওয়া যাবে, সুশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা ততই কমে যেতে থাকবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুএকটি অংশের স্থানীয় শৃঙ্খলা সৃষ্টি হলেও সমগ্র চিত্রের বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। এমন হবার কারণ হলো, 'বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সুশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা মাত্র একটি'। ফলে এমন একটি পাজলকে ঝাঁকি দেওয়া হলে সব সময়ই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোনো সিস্টেমে সর্বোচ্চ সুশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা থাকে মাত্র একটি। আর বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। ফলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে সিস্টেমের বিশৃঙ্খলার পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আর একারণেই সময়ের তাপগতীয় তীরের উদ্ভব হয়। এবার প্রশ্ন হলো- তাপগতীয় তীরের সাথে মনস্তাত্ত্বিক তীরের সম্পর্ক কী?

মনস্তাত্ত্বিক তীর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মানুষের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেননা স্মৃতিই মানুষকে অতীত আর বর্তমানের

BanglaBook.org

মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়। আমরা সময়ের স্রোত অনুভব করতে পারি। কার্যকারিতার দিকে থেকে মানুষের স্মৃতির সাথে কম্পিউটারের স্মৃতির মিল আছে। আর তাই কম্পিউটারের তীর আর মানবীয় তীর অবশ্যই অভিন্ন হবে। মানুষের মস্তিষ্কের মতো কম্পিউটারও তার স্মৃতিতে জমানো তথ্য ব্যবহার করেই হিসেব করে থাকে। ফলে কম্পিউটারের স্মৃতিও আমাদের মতোই; অতীত মনে রাখতে পারলেও ভবিষ্যৎ মনে রাখতে পার না। অবশ্য ভবিষ্যৎ মনে রাখতে পারলে কম্পিউটার দিয়ে হিসাব করেই শেয়ারবাজারের দর মনে রাখা যেত; রাতারাতি সম্পদশালী হতে আর সময় লাগত না।

কম্পিউটারের স্মৃতিতে একটি জিনিস জমা করার আগে তা একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। আর আমরা জানি, কম্পিউটারের স্মৃতি মূলত তথ্যের একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা (এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করেনির্দিষ্ট তথ্যকে কিছু মেমোরি সেলের মধ্যে জমা রাখা হয়)। কিন্তু কম্পিউটারের তথ্যকে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে এই সুশৃঙ্খল অবস্থায় নিতে হলে কিছু পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হবে। এই শক্তি ক্ষয় হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ফলে মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বাড়ে। এই শক্তি ক্ষয় সব সময়ই শৃঙ্খলা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হবে। বিজ্ঞানীরা তা পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিত হয়েছেন। তাহলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা হলো, কম্পিউটার ঠান্ডা রাখার পাখা যে তাপশক্তি নিঃসরণ করে, তার ফলে মহাবিশ্বের মোট বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর এর বিনিময়ে কম্পিউটারের স্মৃতিতে কিছু সুশৃঙ্খল স্মৃতি জমা করা যায়। তাই বলা যায়, কম্পিউটার সময়ের যে অভিমুখে অতীতকে স্মরণ করে সেই অভিমুখেই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং সময়ের মনস্তাত্ত্বিক তীর মূলত মহাবিশ্বের তাপগতীয় তীরের ক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বিষয়টিকে অন্যভাবে বললে বলা যায় সময়ের প্রবাহের সাথে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, কারণ, যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, সেই অভিমুখেই আমাদের মস্তিষ্ক সময় পরিমাপ করে।

কিন্তু এখনো প্রশ্ন থেকে যায়। তাপগতীয় তীর আর মনস্তাত্ত্বিক তীর এক হলেও, মহাজাগতিক সময়ের তীরও কেন একই অভিমুখে হবে? মহাবিশ্বের সীমানা-হীনতার শর্ত অনুযায়ী মহাজাগতিক কালের তীরের অভিমুখ,

BanglaBook.org

মহাবিশ্বের ইতিহাসের পুরো সময় জুড়েই একই দিকে থাকবে না। কিন্তু আমরা তো সবসময়ই এই তীর একই অভিমুখে দেখি। এর উল্টোটা কেন দেখি না? অর্থাৎ যে অবস্থানে সময়ের তীর মহাজাগতিক তীরের সাথে তাপগতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক তীরের সাথে বিপরীত দিকে হবে, আমাদের অবস্থান কেন সেই সময়ে হলো না?

এই বিষয়টিকে উইক এন্থ্রপিক প্রিন্সিপালের (Weak anthropic principle) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এই নীতি অনুসারে, আমাদের অবস্থান সময়ের দুই অভিমুখের হতে পারে। কিন্তু যখন এই তিনটি সময়ের তীরের অভিমুখ একই দিকে হয়, শুধু তখনই বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ সম্ভব হয়। আর আমাদের অবস্থান তিনটি একমুখী তীরের অভিমুখে বলেই, এই প্রশ্ন করার জন্য আমরা টিকে আছি!

আসলে, বুদ্ধিমান প্রাণী বিকাশের জন্য শক্তিশালী তাপগতীয় তীরের প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মতো প্রাণীদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়; আর খাদ্য তো শক্তির একটি সুশৃঙ্খল রূপ। যদি শক্তিশালী তাপগতীয় তীর না থাকে, তবে খাদ্য বলে কিছু থাকাই সম্ভব না। খাদ্যের এই সুশৃঙ্খল রূপ পরিণত হয় তাপে। তাপ শক্তির একটি বিশৃঙ্খল রূপ। আমাদের অবস্থান যদি মহাবিশ্বের প্রসারণের উল্টো দিকে হত, তখন নক্ষত্রগুলো পুড়ে যাবার ফলে তাপগতীয় তীরের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। আর তাপগতীয় তীরের অস্তিত্ব না থাকলে খাদ্যের মতো শক্তির সুশৃঙ্খল রূপ তৈরি হওয়াও সম্ভব হতো না। আর এ কারণেই মহাবিশ্বের সেই সময়ে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকা সম্ভব না। তবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলেই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। বরং সম্প্রসারণশীল দশায় তাপগতীয় তীর থাকার কারণে শুধু এই দশায়ই বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হতে পারে। আর কেন এমন হবে– তা প্রশ্ন করার জন্য আমরা থাকি!! এক কথায় 'সময়ের তাপগতীয় তীরই মনস্তাত্ত্বিক তীরকে ঠিক করে দেয়, আর এই দুই তীর শুধুমাত্র মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীল দশায়ই আছে। তাই আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীরা সেই দশায় বসেই প্রশ্ন করার সুযোগ পাই- এই তিনটি তীর কেন একইমুখী হবে?'

BanglaBook.org

টাইম ট্র্যাভেল ও টাইম মেশিন

সুনিও একটি টাইরেনোসুরাস রেক্স ডাইনোসরের ফসিল হয়ে যাওয়া নখ জোগাড় করেছে। এবার সবাইকে দেখানোর পালা। এই দুর্লভ জিনিস সবাইকে হাতে নিয়ে দেখতে দিলেও, নবিতা দেখার আগেই সুনিও সেটি সরিয়ে নিয়ে যায়। আর এতে রেগে যায় নবিতা। সে সবার সামনে ঘোষণা করে যে সবাইকে একটি জীবন্ত ডাইনোসর এনে দেখাবেই দেখাবে! অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাটির নিচ থেকে লক্ষ বছর পুরনো একটি ডিমের সন্ধান পায় নবিতা। সেটাকে টাইম র‍্যাপ কাপড় দিয়ে একদম আগের অবস্থায় নিয়ে আসে; তা দিয়ে বাচ্চা পর্যন্ত ফুটিয়ে ফেলে। কিন্তু ডাইনোসরটি আকারে বড় হবার পর অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। নবিতা তার রোবট ডোরেমনের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, টাইম মেশিনে চড়ে ওরা এটিকে সেই ক্রিটেসিয়াস যুগে রেখে আসবে। কিন্তু টাইম মেশিনে চড়ার পর তারা টাইম হান্টারদের কবলে পড়ে যায়। এরপর অনেক কাহিনী। তবে শেষ পর্যন্ত তারা ডায়নোসরটিকে ঠিকঠাক রেখে আসতে সক্ষম হয়।

উপরের ঘটনাটি ডোরেমন সিরিজের একটি গল্প। ডোরেমন মূলত একটি জাপানি অ্যানিমেশন সিরিজ। জাপানিরা এগুলোকে বলে মাঙ্গা সিরিজ। জাপানে এই সিরিজটি ভয়াবহ জনপ্রিয়তা পাবার পর হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচার হতে থাকে। তারপর বাকিটা ইতিহাস! ডোরেমন এখন এশিয়ার দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাচ্চাদের কাছে এক জনপ্রিয় নাম। ডোরেমনের কাহিনীগুলোতে ভবিষ্যতের অনেক অবিশ্বাস্য প্রযুক্তির মধ্যে

BanglaBook.org

টাইম মেশিন জিনিসটিও থাকে। বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন সিনেমাসহ ডোরেমনের মতো সিরিজগুলোর কারণে আজকের দিনের বাচ্চাদের কাছে টাইম মেশিন খুবই জনপ্রিয় একটি শব্দ। এমনকি এসব ছেলেমেয়ের বেশির ভাগের কাছেই টাইম মেশিন কোনো অবাস্তব জিনিস না। ওরা ভাবে, টাইম মেশিন আজকের দিনে নেই তো কী হয়েছে, কয়েক শত বছর পরেই বিজ্ঞানীরা টাইম মেশিন তৈরি করে ফেলবেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে, নিউটনের বর্ণনা করা মহাবিশ্বে টাইম মেশিন বলে কোনো কিছু থাকাটা এককথায় অসম্ভব ছিল। নিউটনের মহাবিশ্বে সময়কে একটি অপরিবর্তনীয় জিনিস হিসেবে দেখানো হয়েছে। নিউটনের ধারণা ছিল- মহাবিশ্বে যাই ঘটে যাক না কেন, সময়ের উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। নিউটনের মহাবিশ্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সময়কে একটি বিশ্বজনীন ধ্রুবক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি এক সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয় তবে সমগ্র মহাবিশ্বেই এক সেকেন্ড অতিবাহিত হবে।

কিন্তু সময় বিষয়ে এমন চিন্তা বেশিদিন টিকল না। আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রস্তাব করে এই ধারণা বাতিল করে দেন। তিনি তার তত্ত্বে দেখালেন যে, সময় কিছুটা নদীর মতো আচরণ করে। বয়ে চলার সময় বিভিন্ন স্থানের প্রকৃতি অনুসারে এটি কখনো খুব দ্রুত বয়ে চলে আবার কোথাও বা ধীরে। আবার কোনো বাঁধের ফলে এটি এত ধীর হতে পারে যে তা একরকম থেমে যাবার মতো (ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে)। তাই পৃথিবীতে এক সেকেন্ড অতিবাহিত হলে যে সমগ্র বিশ্বেই তা হবে বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিভিন্ন গ্যালাক্সির গ্রহ-নক্ষত্রে সময়ের প্রবাহ আলাদা।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের গণনা থেকে আমরা দেখেছি, রকেটের গতিবেগ বাড়ালে সময় ধীর হতে শুরু করে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, গতিবেগ যদি আলোর বেগের থেকেও বাড়ানো হয়, তবে সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে অর্থাৎ অতীতে ভ্রমণ শুরু হয়। কিন্তু অতীতে চলে যাওয়ার বিষয়টি শুধু হিসেব করেই দেখানো যায়, বাস্তবে সম্ভব না।

এছাড়া বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি মৌলিক স্বীকার্যই হল, মহাবিশ্বের কোনো কিছুই আলোর বেগ থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করতে পারে না। আর

BanglaBook.org

আলোর বেগই হলো এই মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণার জন্য গতির সর্বোচ্চ সীমা। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা সাধারণত বিভিন্নভাবে আলোর গতির থেকে বেশি গতি অর্জন করার প্রযুক্তির কথা বলেন। ফলে সেখানে অতীত ভ্রমণ করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে যেসব উপায়ের কথা বলা হয় তার কোনোটিই বাস্তবে সম্ভব নয়, কেননা এসব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে অমান্য করে।

আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করার ব্যাপারে সীমানা টেনে দিয়েছে। তবে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করা যে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না, এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আমরা যদি কোনো স্থানীয় জড় প্রসঙ্গকাঠামোর সাপেক্ষে চিন্তা করি, তবে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করাটা আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যকে অমান্য করা হয়। কিন্তু স্থান-কালের নিজের ক্ষেত্রে এই নিময় কিন্তু খাটে না। যেমন মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ভাগ সময়ের মধ্যে মহাবিশ্বের স্থান-কাল বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ প্রসারিত হয়েছিল। আবার আমরা যদি আপেক্ষিক তত্ত্বের বাইরে গিয়ে চিন্তা করি তবেও আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করা সম্ভব। ভাবছেন কীভাবে? আপেক্ষিক তত্ত্ব কোনো অতিরিক্ত মাত্রার কথা না বললেও, একীভূত তত্ত্বগুলোতে অতিরিক্ত মাত্রার সাহায্যেই মহাবিশ্বের গঠন ব্যাখ্যা করা হয়। আসলে অতিরিক্ত মাত্রার সাহায্য না নিয়ে মৌলিক বলগুলোকে একীভূত করা সম্ভব না। যদি অতিরিক্ত মাত্রার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে সেই অতিরিক্ত মাত্রা ব্যাবহার করে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করা সম্ভব। তেমনি এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে হাইপারস্পেস ড্রাইভ।

হাইপারস্পেস তত্ত্ব নিয়ে প্রথম কাজ করেন বার্কহার্ড হেইম নামে একজন অখ্যাত জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। প্রথম জীবনে তিনি বিস্ফোরক নিয়ে গবেষণা করতেই পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বিস্ফোরক প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন। আর এখানেই বাধে বিপত্তি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই এক বিস্ফোরণ দুর্ঘটনায় তার দুই হাত উড়ে যায়, শক্তিশালী বিস্ফোরণের কারণে তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির প্রায় নব্বই ভাগই নষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধ থেমে যাবার পর এই মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি নিয়েই তিনি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতে শুরু করেন।

BanglaBook.org

পদার্থবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

হেইমের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজে একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করা। যে কাজ আইনস্টাইন করতে চেয়েও সফল হতে পারেননি সেই অসাধ্য সাধন করতে হেইম মনোযোগ দিলেন। এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি আইনস্টাইনের থেকেও সঠিক ছিল বলা যায়। আইনস্টাইন শেষ জীবনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ভুল প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন। আইনস্টাইন তার একীভূত তত্ত্ব তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে বাদ দিয়েই। তবে হেইম কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে একীভূত করা না গেলে কখনোই একীভূত তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব না। পঞ্চাশের দশকের দিকে তিনি কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তিতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণগুলোকে লিখতে থাকেন। আর এই কাজটি করতে গিয়েই তিনি অতিরিক্ত মাত্রার আশ্রয় নেন। তার গণনা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে স্থান-কালের শুধুমাত্র চারটি মাত্রা থাকা সম্ভব না। স্থান-কালের চার মাত্রার বাইরে অবশ্যই আরও মাত্রা থেকে থাকবে। তিনি চার মাত্রার সাথে আরও দুটি মাত্রা যোগ করেন। তার তত্ত্বমতে, এই ছয়টি ডাইমেনশন মিলেই আমাদের মহাবিশ্বকে ধরে রেখেছে, আর মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথস্ক্রিয়া ঘটাচ্ছে।

চিত্রঃ বার্কহার্ড হেইন

তিনি তার তত্ত্বে দেখান, মহাকর্ষ বল ও তড়িৎ-চুম্বক বল নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়। এমনকি মহাকর্ষ বলকে তড়িৎ-চুম্বক বলে রূপান্তরিত

করা সম্ভব এবং তা থেকে আবার মহাকর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব! তার গণনা থেকে দেখা যায়, একটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র মহাকর্ষ বলকে কমিয়ে আনতে পারে এবং সেটি যথেষ্ট শক্তিশালী হলে একটি মহাকাশযানকেও উৎক্ষেপণ করতে পারবে।

এই তত্ত্ব প্রকাশ হবার পর বিজ্ঞানী মহলে আলোচনার ঝড় চলে। হেইম তার তত্ত্বের আরও বিস্তারিত গবেষণা করতে গিয়ে এই তত্ত্ব থেকেই মৌলিক কণিকাগুলোর ভর নির্ণয়ের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হেইমের এই আবিষ্কারটি মারাত্মক রকমের কার্যকরী। কারণ হেইমের নতুন আবিষ্কার করা সমীকরণগুলো দিয়ে বর্তমানে গ্লুওন ও কোয়ার্কের মতো কণিকাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হিসেব-নিকেশ করা হয়। এই সফলতার পরে হেইম আর হাইপারস্পেস তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাই এটি দীর্ঘদিন চাপা পড়ে ছিল।

এরপর ১৯৮০ সালের দিকে ওয়াল্টার ড্রসচার নামে এক অস্ট্রিয়ান হেইমের লেখাগুলো পড়ে হাইপারস্পেস থিওরির প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করেন। মজার বিষয় হলো, আইনস্টাইনের মতো ড্রসচারও ছিলেন পেটেন্ট অফিসের কর্মচারী। তিনি হেইমের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে তত্ত্বে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ড্রসচার হেইমের ছয় মাত্রার সাথে আরও দুটি মাত্রা যোগ করেন। হেইমের হাইপারস্পেস থিওরি দেবার সময় সবগুলো মৌলিক বল সম্পর্কে ভালো জানা ছিল না। কিন্তু আশির দশকে আমাদের চারটি মৌলিক বলে প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়ে গেছে। ড্রসচার দাবি করেন, তার তত্ত্ব প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকেই ব্যাখ্যা করতে পারে।

নতুন এই তত্ত্ব এখন 'হেইম-ড্রসচার স্পেস থিওরি' নামে পরিচিত। ড্রসচার-হেইমের সূত্রানুযায়ী প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের পাশাপাশি আরও দুটি মৌলিক শক্তি প্রকৃতিতে বিদ্যমান। একটি হলো বিকর্ষণধর্মী মহাকর্ষ বল। এই বিপরীতধর্মী মহাকর্ষ বল ডার্ক এনার্জির জন্য দায়ী। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা 'হেইম-ড্রসচার' তত্ত্বের অতিরিক্ত মাত্রাগুলোর সৃষ্টি হয়। ড্রসচারের তত্ত্ব মতে, এই অতিরিক্ত মাত্রাগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে গ্যাভিটোপ্রোটন নামে এক ধরনের কণিকার সৃষ্টি হয়। এই কণিকাগুলোর বিনিময়ের ফলে তড়িৎ-চুম্বক বল ও মহাকর্ষ বল পরস্পরের

BanglaBook.org

সাথে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। এবং মহাকর্ষ বলের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে।

চিত্র ঃ ওয়াল্টার ড্রসচার

কিন্তু শুধু তত্ত্ব হলেই তো হবে না। তাকে পরীক্ষা করার উপায়ও তো বের করতে হবে। ড্রসচার মূলত পদার্থবিজ্ঞানী নন। তিনি জোকেম হাউসার নামে এক পদার্থবিদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীর সাথে মিলে তার তত্ত্বকে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন। তার দুজন মিলে, 'Guidelines for a space propulsion device based on heim's quantum theory' নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাদের এই গবেষণাপত্রের জন্য 'American Institute of Aeronautics and Astronautics'-এর পুরস্কারও পেয়েছিলেন। নাসার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেহেতু মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করতে হয়, তাই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি নিয়ে নাসা বেশ কিছু গবেষণা আগে থেকেই করেছিল। কিন্তু ড্রসচারের বক্তব্য ছিল যে- তাদের এই তত্ত্ব মূলত অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি নিয়ে নয়, বরং নতুন একটি বলক্ষেত্র নিয়ে।

ড্রসচার ও হাউসার বলেন, একটি বিশাল আংটি আকৃতির বস্তুকে যদি প্রচণ্ড বেগে ঘোরানো হয়, আর তার নিচে যদি সুপার কন্ডাক্টিং উপকরণ দ্বারা তৈরি করা কয়েল প্যাঁচানো থাকে, তবে এই ধরনের বলক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব। একটি ১৫০ টন ওজনের মহাকাশযানকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করতে ২৫ টেলসা পরিমাণ চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োজন। যা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র থেকেও প্রায় পাঁচ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। তাদের তত্ত্ব থেকে হিসেব কষে দেখা যায়, আংটিটির আকার যদি আরও বড় হয় ও খুব দ্রুত ঘোরানো যায় তবে এর থেকে উৎপন্ন গ্যাভিটোপ্রোটনগুলো মহাকর্ষ বলের সাথে

BanglaBook.org

(মহাকর্ষ বলের কণিকা গ্যাভিটনের সাথে) সংযোগ স্থাপন করবে। এবং অ্যান্টি-গ্যাভিটি বল উৎপন্ন করবে। এটি তখন হাইপারস্পেসের অতিরিক্ত মাত্রাগুলো দিয়ে চলতে শুরু করবে। তখন প্রকৃতির মৌলিক এককগুলোর মান আর আগের মতো থাকবে না। আলোর গতিও অস্বাভাবিকরকম বৃদ্ধি পাবে। এটি যদি করা যায় তবে তিন দিনের মধ্যে মঙ্গলে আর ১১ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রে ৮০ দিনের মধ্যেই পৌঁছানো সম্ভব। আর চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি আরও বৃদ্ধি করলে আলোর বেগের থেকেও বেশি বেগে ভ্রমণ করা সম্ভব।

নিউ মেক্সিকোর স্যান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবে একটি শক্তিশালী এক্স-রে জেনারেটর আছে। নাম- Z Pulsed Power Facility, তবে এটি 'Z machine' নামেই বেশি পরিচিত। এই যন্ত্রটি যে পরিমাণ চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করতে পারে, তার দ্বারা ড্রসচার-হাউসার বর্ণিত পরীক্ষাটি করা সম্ভব। তবে এর পরিচালক রজার লেনার্ড মনে করেন, এই তত্ত্বের গানিতিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান তত্ত্বটির গাণিতিক ভিত্তি একটু নড়বড়ে বলে তার ভিত্তিতে এই পরীক্ষাটি করা উচিত হবে না। শক্ত গাণিতিক ভিত্তি তৈরি করতে পারলে এই যন্ত্র দ্বারাই ড্রসচারের তত্ত্বটির পরীক্ষা করা যাবে।

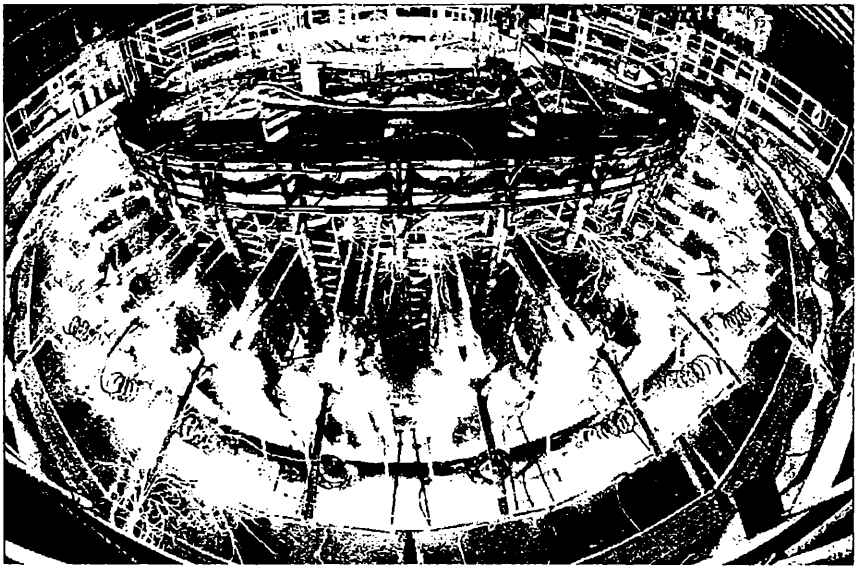

চিত্র ঃ নিউ মেক্সিকোর স্যান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবের এক্স-রে জেনারেটর -Z Machine "

আমরা যদি ড্রসচার-হাউসারের পদ্ধতিতে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করতে পারি, তবে কি আমরা অতীতে ভ্রমণ করতে পারব? ড্রসচার-হেইমের তত্ত্বে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কথা বলা নেই। মূলত, আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করলে কীভাবে অতীতে ভ্রমণ সম্ভব, তার কোনো ভৌত রূপায়ণ নেই। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের গণনা থেকেই দেখা যায় যে আলোর বেগ ছাড়িয়ে গেলে সময় পেছন দিকে যাবে। আর তাছাড়া, এভাবে আলোর গতির থেকে বেশি গতি অর্জনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখনই হেইম-ড্রসচারের তত্ত্বকে তো আর সঠিক বলা যাচ্ছে না। অন্যান্য "Faster Than Light" তত্ত্বের মতো এই তত্ত্বকেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। পোশেল নামে এক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ছাত্রাবস্থা থেকেই হেইমের তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তার মতে, পদার্থবিদ্যার নিরিখে হাইপারস্পেস তত্ত্বকে অনুধাবন করাও কষ্টকর। তিনি এটিও বলেছেন যে- 'এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ।' সে যাই হোক, হেইমের তত্ত্বকে অবশ্যই বাতিল করে দেওয়া যায় না। স্ট্রিং থিওরি ছাড়াও আরও কিছু তত্ত্ব, অতিরিক্ত মাত্রার ব্যাখ্যার সাহায্যেই চূড়ান্ত একটি একীভূত তত্ত্ব গঠন করার কথা ভাবছে। তাই হেইমের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ হলেও বাতিল করার সময় এখনো আসেনি।

হেইমের তত্ত্ব ছাড়াও আরও কিছু ধারণা আছে যেগুলোতে আলোর থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করার কথা বলা হয়। ১৯৯৪ সালে মিগুয়েল অ্যালকিউবার মোয়া নামে এক মেক্সিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এমন একটি উপায়ের কথা বলেছেন। এটি 'অ্যালকিউবার ড্রাইভ' বা 'অ্যালকিউবার মেট্রিক' নামে পরিচিত। 'অ্যালকিউবার ড্রাইভ' ধারণাটি মূলত আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র সমীকরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অ্যালকিউবার আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণের এমন একটি সমাধান বের করেন যেখানে দেখা যায়, আমরা যদি শূন্যস্থানের থেকে যথেষ্ট পরিমাণ কম শক্তি-ঘনত্বের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারি, তবে তা দিয়ে একটি মহাকাশযানকে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে চালানো যাবে। শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে তাই না? শূন্য স্থানের থেকে

BanglaBook.org

কম শক্তি-ঘনত্ব আবার হয় নাকি? হ্যাঁ হয়, তবে তার জন্য আমাদের ঋণাত্মক ভরসম্পন্ন পদার্থ প্রয়োজন। [৬]

চিত্র ঃ নিগুয়েল অ্যালকিউবার

অ্যালকিউবারের বর্ণনা করা পদ্ধতিটা সত্যি অন্য রকম। এখানে মহাকাশযান নিজেই আলোর থেকে বেশি বেগে ছুটবে না। তার বদলে এটি তার সামনের স্পেসকে সংকুচিত আর পেছনের স্পেসকে প্রসারিত করে ছুটে চলবে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। আমরা দেখেছি গাড়ি চলার সময় গাড়ি নিজেই এগিয়ে চলে। রাস্তার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কিন্তু নদীতে যান্ত্রিক নৌকা চলাচলের সময় একটি পাখার সাহায্যে পেছনের পানিকে ঠেলে দেওয়া হয়, ফলে নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এখানে নৌকার গতি তৈরি হয় পানির ধাক্কার কারণে। তেমনি অ্যালকিউবারের বর্ণনা করা পদ্ধতিতেও একই রকম কৌশল নেওয়া হবে। পেছনের স্পেস মহাকাশযানটিকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

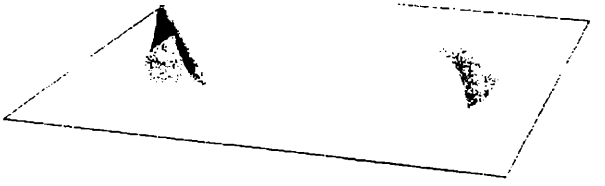

চিত্র ঃ অ্যালকিউবার ড্রাইভের চিত্রায়ণ

[৬] ঋণাত্মক ভর নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অ্যালকিউবারের এই পদ্ধতিতে বড় একটি সুবিধা আছে। এতে করে কোনো একটি জড় প্রসঙ্গের সাপেক্ষে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করতে হচ্ছে না। বরং স্পেসকে সংকুচিত ও প্রসারিত করার মাধ্যমে মহাকাশযানটি আলোর গতির থেকে বেশি গতিতে চলতে পারছে। ফলে আপেক্ষিক তত্ত্বের শর্তও অমান্য করতে হচ্ছে না।

অ্যালকিউবারের প্রস্তাব করা মেট্রিক গাণিতিকভাবে বৈধ। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।[৭] কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতো হলো, এটির কোনো ভৌত অর্থ নেই। এই মেট্রিকের ক্ষেত্রে আরেকটি অসুবিধা হলো- এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে একীভূত না। ফলে এটি যে আসলেই সঠিক তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কোয়ান্টাম গ্যাভিটির তত্ত্ব হাতে পেলে বোঝা যাবে অ্যালকিউবারের গণনার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

অতীতে ভ্রমণ করার জন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে অ্যালকিউবারের মতো অনেকেই আলোর থেকে বেশি বেগে ছোটার উপায় খুঁজতে চেয়েছেন (এখানে জেনে রাখা ভালো যে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে না ছুটেও অতীতে ভ্রমণ করা যায়, তখন আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রকে অমান্য করার প্রয়োজন পড়ে না)। তবে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা কিন্তু একদম স্বাভাবিক একটি বিষয়। আর ভবিষ্যতে ভ্রমণের বিষয়টি এখন পর্যন্ত প্রায় হাজার বারেরও বেশি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে- আমাদের মহাকাশচারীরা প্রায়সই সামান্য একটু ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে থাকে। ওয়েলসের গল্পের হিরো যেমন ভবিষ্যতে ভ্রমণ করেছিল, তা বাস্তবেও সম্ভব। কোনো মহাকাশচারী যদি আলোর বেগের খুব কাছাকাছি বেগে আমাদের পাশের কোনো নক্ষত্র থেকে এক মিনিটের জন্য ভ্রমণ করে আসে, তবে ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে চার বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু মহাকাশচারীর কাছে কিন্তু মাত্র এক মিনিট সময়ই অতিবাহিত হবে। আমার আপনার বয়স এর মধ্যে চার বছর বেড়ে যাবে। কিন্তু মহাকাশচারীর কাছ মনে হবে যেন মাত্র এক মিনিট সময় অতিবাহিত হয়েছে। এর কারণ হলো গতি বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ঐ মহাকাশযানের ভেতরের সময় ধীর হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মহাকাশচারীরা প্রতি ঘণ্টায় ২৮৯৬৮ কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করতে পারে। ফলে মহাকাশ স্টেশনে এক বছরের মিশন

BanglaBook.org

[৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Alcubierre_drive

সম্পন্ন করে যখন তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে তখন তারা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পরিমাণ ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে থাকে।
সম্প্রতি রাশিয়ান মহাকাশচারী সার্জেই আভডায়েভ ৭৪৮ দিন মহাকাশে থেকে এসেছেন। গণনা করে দেখা গেছে এই মহাকাশ ভ্রমণের ফলে তিনি .০২ সেকেন্ড ভবিষ্যতে ভ্রমণ করেছেন। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি যদি আরও বেশি গতিতে ভ্রমণ করার মতো রকেট প্রস্তুত করতে পারত, তবে তিনি হয়তো কয়েক সেকেন্ড ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে ফেলতেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ভ্রমণ করার টাইম মেশিন তৈরি করার জন্য আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বই আমাদের উপায় বলে দিচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা আরও অনেক বেশি গতি অর্জন করতে পারব। ফলে তখন বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করার মতো ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু অতীতে ভ্রমণ করার বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে?

অতীতে ভ্রমণ করতে গেলে বৈজ্ঞানিক সমস্যার আগে কিছু সাধারণ দার্শনিক সমস্যা চোখে পড়বে। আমরা যদি অতীতে ভ্রমণ করতে পারি তবে ইতিহাস লেখাটাই অসম্ভব হয়ে যাবে। ধরুন কোনো ইতিহাসবিদ সুন্দর করে ঘটে যাওয়া ইতিহাস লিখে ফেলেছে, কিন্তু একজন যদি সময় ভ্রমণ করে অতীতে গিয়ে ঘটনা পরিবর্তন করে ফেলে, তখন তাকে ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে। টাইম মেশিন শুধু ইতিহাসবিদদেরই রুজি-রোজগারই বন্ধ করবে না, পাশাপাশি চাইলেই ইচ্ছামতো সবকিছু পরিবর্তন করেনিতে পারবে। ফলে যার কাছে একটি টাইম মেশিন থাকবে, সবকিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ইচ্ছামতো। এমনকি খুব ছোট পরিবর্তনের ফলে পুরো মানব জাতির ইতিহাসই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কেউ যদি সময় ভ্রমণ করে কোটি বছর আগে চলে গিয়ে মানব প্রজাতির পূর্বপুরুষ কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীকে মেরে ফেলে, তাহলে এমনকি মানুষ নামে আমাদের এই প্রজাতি তার অস্তিত্বও হারিয়ে ফেলতে পারে!

আরও একটি বিষয় হলো এভাবে অতীতে চলে যাওয়া সম্ভব হলে ইতিহাসের কোনো শেষ থাকবে না। যে কেউ টাইম মেশিন দিয়ে বারবার ভ্রমণ করে যেকোনো ফলাফলে বদলে দিতে পারবে। আবার অনেকেই

BanglaBook.org

হয়তো ঐতিহাসিক সময়ের ছবি তুলতে গিয়ে ভালো একটি ক্যামেরা পজিশনের জন্য পুরো ঐতিহাসিক মুহূর্তটিই নষ্ট করে ফেলে দিতে পারেন। এতসব দার্শনিক সমস্যার দিকে তাকালে মনে হতে পারে অতীত ভ্রমণ করা গেলেও বুঝি বাস্তবে সেটি করাটা মোটেও ঠিক হবে না। কিন্তু এই অতীত ভ্রমণ বিষয়টি এমনই আকর্ষণীয় যে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী এই অতীত ভ্রমণের নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারেননি।

টাইম ট্র্যাভেল ও একজন পদার্থবিজ্ঞানী

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ স্টিফেন হকিংই সম্ভবত সব থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি ব্ল্যাকহোলের জটিল গাণিতিক সমীকরণ ও টাইম ট্র্যাভেল সম্পর্কিত তত্ত্বের জন্য নিজেকে বিখ্যাত করে তুলেছেন। হকিং মূলত আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায়ই যারা নিজেদের একজন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন তিনি মোটেই তেমন কোনো ছাত্র ছিলেন না। যুবক বয়সে তিনি কোনো বিশেষ মেধার পরিচয় দেননি। তবে তিনি যে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তার শিক্ষকরা সে কথা অনুমান করতে পেরেছিলেন। হকিং এর শিক্ষকরা জানতেন তিনি তার মেধার পুরোপুরি ব্যবহার করার ব্যাপারে কখনই সচেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু ১৯৬২ সালের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃসংবাদে সবকিছুই অন্য রকম হয়ে যায়। সেই বছর অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রি শেষ করার পর তার শরীরে একটি মারাত্মক ও বিরল রোগের লক্ষণ দেখা যায়। মারাত্মক এই রোগের নাম এমিওট্রপিক লেটারাল স্ক্লেরোসিস (ALS)। এটি এক ধরনের মোটর নিউরোন ডিজিজ। মোটর নিউরোন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে একে একে শরীরের সর্বপ্রকার মোটর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর রোগীর মৃত্যু এড়ানোর কোনো উপায় থাকে না। তিনি ডাক্তারের কাছে জানতে পারেন, তিনি খুব তাড়াতাড়িই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। সংবাদটি শোনার পর তার কাছে এটি খুবই হতাশাজনক ছিল। এত দ্রুত মারা গেলে তার পিএইচডি ডিগ্রিটি নিয়ে কী হবে?

BanglaBook.org

কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর হতাশা দূর হবার পর তিনি নিজের জীবনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তার জীবনের সময় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভেবে, তিনি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছু মারাত্মক সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। এর মধ্যে কিছু সমস্যা ছিল যা নিয়ে কাজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ৭০ সালের প্রথমদিকের মধ্যে অনেকগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যাতে তিনি দেখান যে, আইনস্টাইনের তত্ত্বের যেসব অনন্যতা আছে (যেমন- বিগ ব্যাং-এর শুরুতে বা ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষ ক্ষেত্র অসীম হয়ে যাওয়া) এগুলো সাধারণ আপেক্ষিকতার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এগুলোকে ইচ্ছে করলেই এত সহজে বাতিল করে দেওয়া যাবে না। ১৯৭৪ সালে হকিং তার গবেষণায় দেখান, ব্ল্যাকহোলকে যেমন সম্পূর্ণ কালো বলে ভাবা হয় এগুলো আসলে তেমন নয়। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে দেখান কোনো বিকিরণ কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টানেল করে মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এমনকি ব্ল্যাকহোল থেকেও। হকিং-এর এই গবেষণাপত্রটি ছিল সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে প্রথম বড় ধরনের কোনো কাজ। আর এই গবেষণাপত্রটিকে তার সেরা কাজ হিসেবে ধরা হয়।

রোগের লক্ষণ অনুসারে এই পদার্থবিদের হাত, পা এমনকি কণ্ঠনালি পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত (Paralyzed) হয়ে পড়ে। ফলে তিনি কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এই অবশ হবার প্রক্রিয়া ডাক্তারের অনুমান থেকে অনেক ধীর গতিতে হয়েছিল। ফলে তিনি তার জীবনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করতে পারেন। ইতিমধ্যে তিনি তিন সন্তানের জনক(এমনকি বর্তমানে তিনি একজন পিতামহ)। ১৯৯১ সালে প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে চার বছর পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি ইলাইন ম্যাসনকে বিয়ে করেন, যিনি চিকিৎসারত অবস্থায় তার নার্সের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার স্ত্রী আরেকটি পরিচয় হলো, তিনি সেই ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন যিনি কৃত্রিম কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করেছেন!

BanglaBook.org

২০০৬ সালে হকিং চিন্তা করেন তার এই স্ত্রীর সাথে তার ডিভোর্স নেওয়া উচিত।

এই অসার শরীর নিয়ে ২০০৭ সালে তিনি জেট বিমানে করে শূন্য অভিকর্ষের (ওজনহীন অবস্থার) অভিজ্ঞতা নেন। আর সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হন। তার সারা জীবনের ইচ্ছা পূরণ হয়। এই বিজ্ঞানীর পরবর্তী লক্ষ্য হল মহাশূন্যে ভ্রমণ করা। তিনি এখন আক্ষরিকভাবেই সম্পূর্ণ প্যারালাইজড। শুধু চোখের সঞ্চালনের মাধ্যমে সব কাজ করে থাকেন। কৃত্রিম ভয়েসের সাহায্যে কথা বলেন। কম্পিউটারচালিত হুইলচেয়ারের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন। এই মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি নিয়েও তিনি এখনো কৌতুক করেন, বই লিখেন, গবেষণা করেন এমনকি বিতর্ক করেন। অবাক করা তথ্য হলো শুধু চোখের সঞ্চালনের মাধ্যমেরই তার টিমের সুস্থ অন্য বিজ্ঞানীদের থেকেও বেশি কাজ করতে পারেন

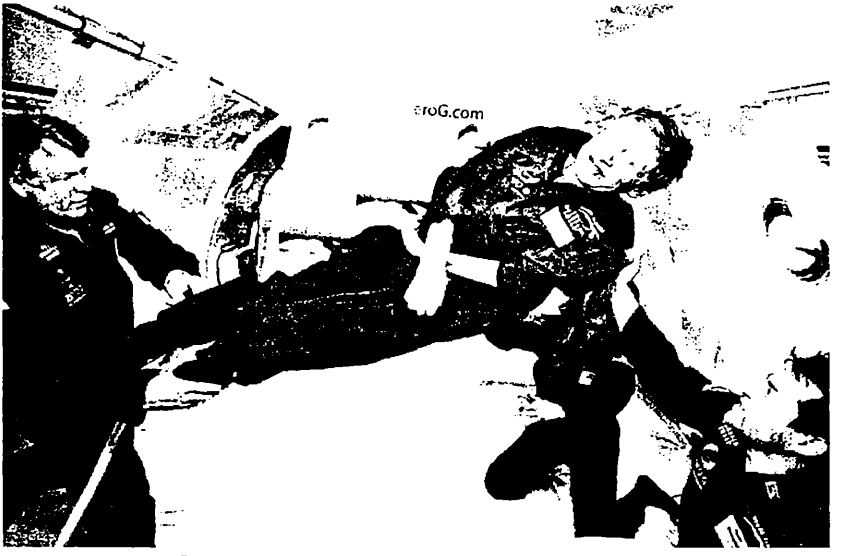

চিত্র ঃ চূড়ান্ত শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও হকিং শূন্য মহাকর্ষের অভিজ্ঞতা নিয়েছেন।

ইংল্যান্ডের রানি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জ্যোতির্বিদ ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হকিং এর সহকর্মী, স্যার মার্টিন রিস একবার তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ড. মিচিও কাকুকে বলেছিলেন, তার শারীরিক অসুস্থতা তাকে বিভিন্ন জটিল গণনা করতে সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা না থাকলে তিনি আরও অনেক বেশি কাজ করে একদম শীর্ষ অবস্থানে থাকতে পারতেন। এই সমস্যার

BanglaBook.org

জন্য হকিং জটিল গণনা করার বদলে একদম নতুন নতুন ধারণা উদ্ভাবন করেন আর এর জন্য প্রয়োজনীয় গণনাগুলো তার ছাত্রদের দিয়ে করিয়ে নেন।

১৯৯০ সালের দিকের কথা। হকিং-এর কিছু সহকর্মী মিলে তাদের নিজেদের টাইম মেশিনের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি তাদের গবেষণাপত্রগুলো পড়ে দেখেন। পড়ার কিছুদিন পরেই তিনি এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার মনে হয়েছিল টাইম ট্র্যাভেল কোনোভাবেই সম্ভব না। তিনি টাইম ট্রাভেলের বিপক্ষে একটি বিখ্যাত যুক্তি দিয়েছেন। তার যুক্তিটি অবশ্য খুবই মজার। হকিং যুক্তি দেখান যে- টাইম ট্র্যাভেল যদি সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যৎ থেকে আসা দর্শকরা কোথায়? সময়ে ভ্রমণ করা সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ থেকে ভিডিও ক্যামেরা হাতে অনেকেই আমাদের কাছে ভিড় জমাত (হয়তো সেলফিও তুলত!)।

এই যুক্তি ছাড়াও হকিং পদার্থবিদদের সামনে আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেন। তার মতে, প্রকৃতিতে নিশ্চয় এমন একটা নিয়ম আছে যার ফলে টাইম ট্র্যাভেল সম্ভব না। পড়ে তিনি টাইম ট্র্যাভেলের ধারণাকে বাতিল করার জন্য "Chronology Protection Conjecture" প্রস্তাব করেন। এই কনজেকচারে মূল কথাই হলো প্রকৃতি অতীত ভ্রমণ অনুমোদন করে না। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, হকিং অতীত ভ্রমণে কতটা কট্টর ছিলেন!

এখান মজার বিষয় হলো, পদার্থবিদরা শত চেষ্টা করেও প্রকৃতির এমন কোনো নিয়ম খুঁজে পাননি যার ফলে বলা যায় টাইম ট্র্যাভেল বিষয়টি অসম্ভব[৮]। এমনকি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, টাইম ট্র্যাভেলের ধারণা সঠিক। টাইম ট্র্যাভেলের বিরুদ্ধে প্রকৃতির কোনো নিয়ম খুঁজে না পেয়ে অবশেষে হকিং তার মতো বদলেছেন। পরে তিনি লন্ডনের একটি পত্রিকার শিরোনামে বলেন- Time travel may be possible, but it is not practical.। অর্থাৎ তার মতে টাইম ট্র্যাভেল সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে করাটা হয়তো সম্ভব না।

BanglaBook.org

[৮] ফিজিক্স অফ দ্যা ইমপসিবল, মিচিও কাকু।

টাইম ট্র্যাভেল একসময়ের উপেক্ষা করা বিজ্ঞান হলেও, এই সময়ে এসে তা অনেক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সচল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ক্যাল-টেকের কিপ থর্ণ বলেছেন, Time travel was once solely the province of science fiction writers. Serious scientists avoided it like the plague-even when writing fiction under pseudonyms or reading it in privacy. How times have changed! One now finds scholarly analyses of time travel in serious scientific journals, written by eminent theoretical physicists Why the change? Because we physicists have realized that the natureof time is too important an issue to be left solely in the hands of science fiction writers.

টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে এত রকম উত্তেজনাকর বিতর্ক ও বিভ্রান্তির কারণও আছে। আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো বিভিন্ন ধরনের টাইম মেশিন অনুমোদন করে। এর মধ্যে কিছু কিছু ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের চ্যালেঞ্জে টিকে গেছে, কিন্তু কয়েকটি নিয়ে এখনো কিছু সমস্যা আছে।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব closed timelike curve (CTC) নামে একটি টার্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা অতীতে ভ্রমণকে সমর্থন করে। ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ মূলত গাণিতিক পদার্থবিদ্যার একটি বিষয়। এই টার্মটির অর্থ হলো কোনো একটি বস্তুকণা স্থান-কালের ভেতর চলাচল করে আবার নিজের মূল অবস্থানে ফিরে আসতে পারে। কার্ট গোডেল ১৯৪৯ সর্বপ্রথম সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি সমাধান থেকে এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেন। তাঁর সমাধানটি গোডেল মেট্রিক নামে পরিচিত। গোডেলের সমাধানের পরে আরও বেশ কয়েকটি সমাধান পাওয়া গেছে যেগুলো ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ অনুমোদন করে। কিছু কিছু পদার্থবিজ্ঞানীর ধারণা, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আগামী দিনের সমাধান থেকেও এমন টাইম কার্ভের অনুমোদন পাওয়া যাবে। তবে স্টিফেন হকিং-এর মতো কয়েকজন বিজ্ঞানী আবার এর বিরোধিতাও করেছেন। হকিং এই কার্ভের বিরোধিতা করে chronology protection conjecture প্রস্তাব করেছিলেন। তবে আমরা আগেই জেনেছি তাঁর এই মতকে তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং তা এক সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম পর্যন্ত হয়েছে। ক্লোজ

BanglaBook.org

টাইম লাইক কার্ভ অনুমোদন করা মহাবিশ্বে সময় ভ্রমণ করে অতীতে গিয়ে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসাও সম্ভব। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের অনেকগুলো সরাসরি সমাধান পাওয়া গেছে, যেগুলো 'ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ' বা সময় ভ্রমণ অনুমোদন করে। এই সমাধানগুলো নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখে নেওয়া যাক।

১. মিসনার স্পেস (The Misner space): যা মূলত মিনকোস্কি স্পেস অরবিফোল্ড।

২. কার ভ্যাকুয়াম (The Kerr vacuum): এটি মূলত একটি চার্জবিহীন ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল।

৩. একটি ঘূর্ণায়মান বিটিজেড ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তর (The interior of a rotating BTZ black hole)।

৪. ভ্যান স্টোকাম ডাস্ট (The van Stockum dust): ডাস্ট সল্যুশন মূলত সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি ফ্লুয়িড সল্যুশন। আর স্টোকাম ডাস্ট হলো ডাস্ট সল্যুশনের একটি প্রতিসম সিলিন্ডিক্যাল গঠন।

৫. গডেল ল্যামডাডাস্ট বা গডেল ল্যামডাভ্যাকুয়াম সল্যুশন (The Gödel lambdadust or Gödel lambdavacuum solution): এটি এমন একটি ডাস্ট সল্যুশনের মডেল, যেখানে খুব সতর্কতার সাথে (ইচ্ছা করে বসিয়ে নেওয়া) একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক বসিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৬. টিপলার সিলিন্ডার (The Tipler cylinder): এটি এক ধরনের সিলিন্ডিক্যাল প্রতিসম মেট্রিক যা 'ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ' সমর্থন করে।

৭. বোন্নোর স্টেডম্যান সল্যুশন (Bonnor Steadman solutions): পরীক্ষাগারে করে দেখার মতো একটি সমাধান। বিশেষ ধরনের দুটি ঘূর্ণায়মান বল দিয়ে এটি করা যাবে।

৮. কসমিক স্ট্রিং (Cosmic strings): কসমিক স্ট্রিং মূলত স্ট্রিং তত্ত্বের একটি সমাধান। তবে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বও এটি সমর্থন করে (স্ট্রিং থিওরির স্থান-কালের ব্যাখ্যাটি আসলে সাধারণ

BanglaBook.org

আপেক্ষিক তত্ত্বের মতো স্থান-কালের জ্যামিতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। এই তত্ত্বে পদার্থের উৎপত্তিসহ পদার্থবিজ্ঞানের সবকিছুই স্থান-কালের জ্যামিতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়)।

উপরের উল্লেখ করা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধানগুলোর নাম দেখে খুব বেশি কাঠখোট্টা মনে হতে পারে। তবে এদের বিকট নাম দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। মূল ধারণাগুলোকে বর্ণনা করলে অনেক সহজ মনে হবে। এদের প্রতিটি সমাধান ব্যবহার করেই টাইম মেশিনের নকশা তৈরি করা করা যায়। এই অধ্যায়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নকশা করা বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রস্তাবিত টাইম মেশিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। আর পরের অধ্যায়ের এগুলোর কার্যপ্রণালী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে বলে রাখা ভালো আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ক্ষেত্র তত্ত্বের (সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের) অনেক রকম সমাধান হয়। এই সমাধানগুলো হলো সমীকরণের ভৌত রূপায়ণ (Physical interpretation)। একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু জানে না যে, পদার্থবিজ্ঞানের এসব সমীকরণকে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। তাই কারও হাতে একটি সমীকরণ ধরিয়ে দিলে সে এর কোনো বোধগম্য অর্থ বের করতে পারবে না। কিন্তু এগুলোর ভৌত বিশ্লেষণ করার পর সেগুলোকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব। উপরে উল্লেখ করা সমাধানগুলো ছাড়াও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আইনস্টাইনের সমীকরণের শতাধিক সমাধান পেয়েছেন যেগুলো অতীত ভ্রমণকে অনুমোদন করে।

প্রথমে যে ধরনের টাইম মেশিন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, এটি মূলত একটি ওয়ার্মহোলকে ব্যবহার করে নকশা করা। আইনস্টাইনের সমীকরণের অনেকগুলো সমাধান আছে যেগুলো স্থানের দুটি ভিন্ন বিন্দুকে একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তার মাধ্যমে যুক্ত করে। এই সংক্ষিপ্ত পথকেই ওয়ার্মহোল বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা যদি পাশের এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে যেতে চাই তাহলে আমাদের এত বেশি সময় লাগবে যে এন্ড্রোমিডা থেকে ঘুরে এসে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব নাও পেতে পারি। এসে হয়তো দেখা

BanglaBook.org

যাবে পৃথিবীর সব মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতের পক্ষে-বিপক্ষে লড়াই করেনিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলেছে। কারণ এন্ড্রোমিডা আমাদের থেকে ২.৯ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আমরা যদি আলোর বেগেও ভ্রমণ করি তাহলেও আমাদের কমপক্ষে (২.৯+২.৯)= ৫.৮ মিলিয়ন বছর সময় লাগবে। কিন্তু আমরা যদি একটি ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে এই কাজটি করতে পারি তাহলে হয়তো মাত্র কয়েক মাস বা আরও কম সময়ের মধ্যে এন্ড্রোমিডা থেকে ঘুরে আসতে পারব।

এখন মজার বিষয় হলো, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে স্থান আর সময় আলাদা কোনো স্বত্তা নয়। তাই একটি ওয়ার্মহোল স্থানের দুটি ভিন্ন বিন্দুকেই সংযুক্ত করে না বরং পাশাপাশি দুটি ভিন্ন সময়কেও যুক্ত করে। তাই আমরা যদি একটি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে একটি ভ্রমণ করতে পারি তাহলে আমরা অতীতেও ভ্রমণ করতে পারব (অন্তত গাণিতিকভাবে)। এভাবে এমনকি আমরা আমাদের জন্মের পূর্বের সময়েও চলে যেতে পারব। কিন্তু সমস্যা হলো ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে যে ওয়ার্মহোল থাকে এমন একটি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে যাবার রাস্তাটা একমুখী। একে বলা হয়, One way trip। পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড গট একবার বলেছিলেন, ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে একজন চাইলে তার অতীতে ভ্রমণ করতে পারবে, এ নিয়ে আমি কোনো সন্দেহ দেখি না, কিন্তু প্রশ্ন হলো আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে কিনা?

অন্য আরেক ধরনের টাইম মেশিন আছে যা একটি ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্বের (Cosmological model of a rotating universe) সাথে সম্পর্কিত। ১৯৪৯ সালে কার্ট গোডেল আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান করেন যা থেকে দেখা যায় পুরো মহাবিশ্ব নিজেই ঘূর্ণায়মান। যদি কোনো মহাবিশ্ব নিজেই ঘূর্ণায়মান হয় তবে, কেউ যদি এই মহাবিশ্বে যথেষ্ট দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে সে যে সময়ে যাত্রা করেছিল সেই সময়ের আগেই পূর্বের অবস্থানে উপস্থিত হতে পারবে। ফলে ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্বের চারদিকে দ্রুত বেগে ভ্রমণ করলে অতীতে চলে যাওয়া যাবে। একদল জ্যোতির্বিদ যখন ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিতে ঘুরতে গিয়েছিল তখন গোডেল

BanglaBook.org

তাদের কাছে খুব উৎসুক হয়ে জানতে চান যে আমাদের মহাবিশ্ব আসলেই ঘুরছে কিনা? কিন্তু জ্যোতির্বিদের কাছ থেকে যে এই বিষয়ে কোনো সুসংবাদ পাবার আশা নেই এটি সম্ভবত গোডেল নিজেও জানতেন। কারণ আমরা জানি আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারমান, আর এর নিট স্পিন শূন্য।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ধরনের ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্ব হাবলের প্রসারণকে বাতিল করে দেয়। ফলে এটি নিশ্চিত আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি তা এই ধরনের না। গোডেলে যে সমাধান পেয়েছেন সেটি আমাদের মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য না হলেও আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুসারে এমন একটি ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্বও সম্ভব। আমাদের মহাবিশ্বটি এমন হলে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে টাইম ট্র্যাভেল বিষয়টি একটি সাধারণ ভ্রমণে পরিণত হতো। আর ইতিহাস বলেও সম্ভবত কিছু থাকত না।

কেউ যদি অসীম দৈর্ঘ্যের একটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার দিয়ে চলতে শুরু করে তাহলে সে তার ছেড়ে যাবার আগেই সেখানে পৌঁছুতে পারবে। গোডেলের টাইম মেশিন প্রস্তাব করার আগেই ১৯৩৬ সালে ডব্লু. জে. ভ্যান স্টোকাম এই সমাধান খুঁজে পান। মজার বিষয় হলো, এই সমাধান বের করা সময় স্টোকাম নিজেও ভালোমতো জানতেন না যে তার সমাধান টাইম ট্রাভেলের একটি উপায় হতে পারে। এই ধরনের একটি সিলিন্ডারের ভেতর যদি আপনি জানুয়ারি মাসে ভ্রমণে বের হন, তাহলে ঘুরে এসে হয়তো দেখবেন ডিসেম্বর মাস চলছে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড গট সম্প্রতি টাইম ট্রাভেলের জন্য আরেক ধরনের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তার এই সমধানটি প্রয়োগ করার জন্য আমাদের এক ধরনের দৈত্যাকার কসমিক স্ট্রিং (Cosmic string) ব্যবহার করতে হবে। বিগ ব্যাং ঘটার সময় বিস্ফোরণের উচ্ছিষ্ট উপাদান হিসেবে এই স্ট্রিংগুলো তৈরি হয়েছিল। গটের চিন্তা অনুসারে এসব কসমিক স্ট্রিংগুলো প্রায়ই সংঘর্ষ করে থাকে। কেউ যদি দ্রুত বেগে এই সংঘর্ষরত কসমিক স্ট্রিংগুলোর চারপাশে ঘুরতে পারে, তাহলে সে অতীতে ফিরে যেতে পারবে। এ ধরনের টাইম মেশিনের একটি সুবিধা হলো আমাদের কোনো অসীম দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার প্রয়োজন হচ্ছে না, কোনো ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্বেরও

BanglaBook.org

দরকার নেই বা কোনো ওয়ার্মহোলও দরকার নেই। গট উল্লেখ করেছেন, এক বছর অতীতে ফিরে যাবার জন্য আমাদের এমন কসমিক স্ট্রিং দরকার যার ভর-শক্তির পরিমাণ হতে হবে একটি গ্যালাক্সির সমান।

টাইম মেশিনের জন্য সবচে আশাপ্রদ নকশাটি করা হয় একটি ট্রান্সভার্সেবল ওয়ার্মহোল (Transversable wormhole) দিয়ে। এই বিশেষ ধরনের ওয়ার্মহোল দিয়ে কেউ সময়ের দিক, এমনকি বিপরীত দিক; উভয় দিকেই ভ্রমণ করতে পারে। এই ওয়ার্মহোল সংক্রান্ত গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে, কেউ চাইলে এই ওয়ার্মহোল দিয়ে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ভ্রমণ করতে পারবে আর সময়ের উভয় দিকেই চলতে পারবে। এই ওয়ার্মহোলের জন্য একটি অপরিহার্য জিনিস হলো- ঋণাত্মক শক্তি।

একটি 'ট্রান্সভার্সেবল ওয়ার্মহোল টাইম মেশিন' দুটি বিশেষ ধরনের প্রকোষ্ঠ দিয়ে গঠিত। এই প্রকোষ্ঠগুলোর প্রতিটি দুটি সমকেন্দ্রিক গোলকের দ্বারা গঠিত হবে। আর এই দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব হবে অস্বাভাবিক রকম ক্ষুদ্র। বাইরের গোলকটিকে কেন্দ্রীভূত করলে কাসিমির ইফেক্টের ফলে এদের মধ্যে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি হবে। ধারণা করা হয় টাইপ-৩ সভ্যতার প্রাণীরা এমন দুটি প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করে দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পারবে (স্থান-কালের ফেনা থেকে ওয়ার্মহোলকে আলাদা করতে পারবে)। এখন প্রথম প্রকোষ্ঠকে তুলে নিয়ে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে মহাশূন্যে পাঠালে, বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে ঐ প্রকোষ্ঠের সময় ধীর হয়ে যাবে। ফলে কেউ যদি দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠতে থাকে, তবে তার সময়ের চেয়ে প্রথম প্রকোষ্ঠের সময় আরও অতীতে হবে। এখন প্রথম প্রকোষ্ঠ থেকে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ যত দূরেই হোক না কেন, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ থেকে সাথে সাথেই প্রথম প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করা যাবে। এভাবে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ থেকে প্রথম প্রকোষ্ঠে গেলে অতীতে ভ্রমণ করা যাবে।

আমরা আগেই জেনেছি, বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সমীকরণের এ পর্যন্ত শতাধিক সমাধান পেয়েছেন যেগুলো টাইম ট্রাভেল অনুমোদন করে। কিন্তু এদের সবগুলো নিয়ে এখনো কাজ করা হয়নি (টাইম মেশিনের নকশা করার জন্য)। ভবিষ্যতে আমরা হয়তো 'ট্রান্সভার্সেবল ওয়ার্মহোল টাইম

BanglaBook.org

মেশিন' এর থেকেও আরও সহজ কোনো উপায় খুঁজে পাব। ফলে প্রচুর ঋণাত্মক শক্তি অর্জন করার জন্য আমাদের আর শত শত বছর অপেক্ষা করা লাগবে না। এই অধ্যায়ে মূলত টাইম মেশিন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক আলোচনা করা হলো। পরের অধ্যায়ে এসব টাইম মেশিনের কার্যপ্রণালির পাশাপাশি এসব মেশিন কীভাবে তৈরি করা যাবে সেসব প্রযুক্তির নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল ও স্থান-কালে ভ্রমণ

২০৭০ সাল। এ সময় ফ্রেড্রিক হাল্লাম নামে এক বিজ্ঞানী লক্ষ করেন যে, সাধারণ টাংস্টেন-১৮৬ ভেঙে প্লুটোনিয়াম-১৮৬ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্লুটোনিয়ামের এই আইসোটোপটিতে তো অনেক বেশি প্রোটন আছে, ফলে এমনটি ঘটা এককথায় অসম্ভব। রহস্যময় এই ঘটনা কেন ঘটছে এর কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল না। হাল্লাম পরে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে করতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের ব্যাখ্যা খুঁজে পান। তার মতে এই প্লুটোনিয়ামগুলি অন্য কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্ব থেকে আসছে, যেখানে নিউক্লীয় বলগুলো আরও অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই এই প্রোটনগুলো নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ এড়িয়ে টিকে থাকতে পারছে।

এই প্লুটোনিয়াম-১৮৬ ব্যবহার করে হাল্লাম তার বিখ্যাত, 'হাল্লাম ইলেকট্রন পাম্প' নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেন, যা থেকে নিরবচ্ছিন্ন ইলেকট্রন সরবরাহ পাওয়া যায়। এই বিশাল পরিমাণ শক্তি পৃথিবীর শক্তির সংকট কাটাতে সাহায্য করে। আর এ থেকে তিনি পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ শক্তি পাওয়া গেলেও এখানে একটি বড় সমস্যা আছে। যদি প্রচুর পরিমাণ বহির্বিশ্বের প্লুটোনিয়াম-১৮৬ আমাদের মহাবিশ্বে প্রবেশ করতে থাকে, তাহলে আমাদের মহাবিশ্বের নিউক্লীয় বলের শক্তিমাত্রা অনেক বেড়ে যাবে। আর এটি কিন্তু খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ নিউক্লীয় বলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেলে, সূর্যের ফিউশন বিক্রিয়ায় আরও বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে

BanglaBook.org

থাকবে। ফলে সূর্যের তাপমাত্রাও স্বাভাবিক থেকে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। এমনকি এই শক্তির পরিমাণ যদি দিন দিন বাড়তেই থাকে তাহলে সূর্য একসময় বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। আর এমন হলে তো আমাদের সৌরজগৎটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

অন্যদিকে এলিয়েনদের মহাবিশ্বের বিষয়টি কিন্তু আলাদা। তাদের মহাবিশ্ব মরে যেতে বসেছে (তাপগতীয় মৃত্যু)। সেই মহাবিশ্বের নিউক্লীয় বলের শক্তি অনেক বেশি বলে সেখানে নক্ষত্রগুলো খুব তাড়াতাড়ি তাদের জীবন শেষ করে বিস্ফোরিত হয়ে যাচ্ছে। আর সে কারণেই তারা তাদের মহাবিশ্বের প্লুটোনিয়াম-১৮৬ এর সাথে আমাদের মহাবিশ্বের টাংস্টেন-১৮৬ বদল করেনিচ্ছে। এই টাংস্টেন-১৮৬ তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। কারণ তারা এই টাংস্টেন-১৮৬ দিয়ে পজিট্রন পাম্প তৈরি করে তাদের মহাবিশ্বের দ্রুত মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারবে। তাদের এই কাজের ফলে যে আমাদের মহাবিশ্বের নিউক্লীয় বলের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের নক্ষত্রগুলোর মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে, এটি কিন্তু তারা ঠিকই বুঝতে পারছে। কিন্তু তাদের মহাবিশ্ব রক্ষার স্বার্থে তারা আমাদের আসন্ন মৃত্যু নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়।

পৃথিবীর সামনে তখন বড় ধরনের বিপদ। মানবজাতি হাল্লামের সেই সস্তা শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তাৎক্ষনিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে তারা বিশ্বাস করতে চাইছে না যে, কিছুদিন পরেই সূর্য বিস্ফোরিত হয়ে সবার মৃত্যু ডেকে আনবে। হাল্লামের সমসাময়িক আরেকজন বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি বুঝতে পারেন আসলেই একটি সমান্তরাল মহাবিশ্ব রয়েছে, যা থেকে আমাদের মহাবিশ্বের সাথে নিউক্লীয় বল রদবদল করার চেষ্টা চলছে। তিনি মানবজাতিকে এই প্রহেলিকা থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তিনি শেষ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী অ্যাটম স্ম্যাসারকে এমনভাবে তৈরি করতে সক্ষম হন যা একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পারে। এই ওয়ার্মহোলটি আবার একটু বিশেষ ধরনের। ওয়ার্মহোলটি ব্যাবহার করে তিনি আমাদের মহাবিশ্ব থেকেই বিভিন্ন সমান্তরাল মহাবিশ্ব খুঁজে দেখতে পারতেন। তিনি এমন একটি মহাবিশ্বের খোঁজ করতে থাকেন যেখানে প্রচুর শক্তি আছে কিন্তু তার নিউক্লীয় বলের শক্তিমাত্রা আমাদের মহাবিশ্ব থেকে অনেক কম।

BanglaBook.org

অবশেষে তিনি এমন একটি 'কসমিক এগ' খুঁজে পান, যেখানে প্রচুর শক্তি জমা থাকলেও নিউক্লীয় বলের শক্তিমাত্রা অনেক কম। হাল্লামের মতো তিনিও একটি বিশেষ পাম্প তৈরি করেন। এই পাম্পের সাহায্যে একই সাথে সেই কসমিক এগ থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যাচ্ছিল, আবার আমাদের মহাবিশ্বের নিউক্লীয় বলের শক্তিও কমে যাচ্ছিল। এভাবে তিনি আমাদের সূর্যকে বিস্ফোরিত হওয়া থেকে বাঁচান। কিন্তু এর ফলে সেই কসমিক এগ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল। কসমিক এগটি তার শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি পাবার ফলে বিস্ফোরিত হয়ে একটি নতুন বিগ ব্যাং-এর জন্ম দেয়। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এই নতুন বিজ্ঞানী যেন এক মহাজাগতিক ধাত্রীর ভূমিকা পালন করছে!!

উপরের গল্পটি আইজাক আসিমভের লেখা একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যার সুফল কীভাবে মানুষকে লোভ, বিদ্বেষ আর অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা তিনি খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলেই কি সমান্তরাল মহাবিশ্ব বা ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব আছে? আসলে আমরা এখনো কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্ব বা ওয়ার্মহোল কোনোটিই খুঁজে পাইনি। কিন্তু মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্ব (Cosmic inflation theory) ও আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণগুলো বিশ্লেষণ করলে এগুলো নিয়ে না ভেবেও উপায় নেই। অনেকে ভাবতে পারেন, ওয়ার্মহোল বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের যদি অস্তিত্ব থেকেও থাকে, এগুলো নিয়ে গবেষণা করে আমাদের কী লাভ? আসলে মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে যেসব বিজ্ঞানী চিন্তা করেন, তাদের অভিমত হলো মহাবিশ্বের পরিণতি যেমনই হোক না কেন, মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানী ওয়ার্মহোল বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের মতো জিনিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই বিষয়গুলোর সাথে আবার টাইম ট্র্যাভেল শব্দটিও জড়িত। ব্ল্যাকহোল বা ওয়ার্মহোলের মতো স্থান-কালের অদ্ভুতাগুলো সম্পর্কে খুব ভালোমতো না জানলে আমরা টাইম মেশিন তৈরি করা বা অন্য কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্বে পারি দেওয়া, এগুলোর কোনোটিই করতে পারব না।

BanglaBook.org

চলুন তাহলে টাইম মেশিন তৈরি করার আগে এই অনন্যতাগুলো (Singularity) সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানা যাক।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকেই প্রথম স্থান-কালের এই অনন্যতাগুলো সম্পর্কে আভাস পাওয়া গিয়েছিল। অনেক বিজ্ঞানী বলেন, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কিছুটা ট্রোজান ঘোড়ার মতো। সাধারণ দৃষ্টিতেই একে দেখতে অনেক জমকালো মনে হয়। এই তত্ত্বের কিছু স্বতঃসিদ্ধের ওপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের প্রকৃতি, বিগ ব্যাং, আলোর বেঁকে যাওয়া সবকিছুই বের করে ফেলা যায়। অবাক বিষয় হলো, যদি আমরা ইচ্ছে করে আদি মহাবিশ্বের জন্য একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক যোগ করি (যেটা আইনস্টাইন নিজে করেছিলেন) তাহলে এমনকি এই তত্ত্ব থেকেই মহাজাগতিক স্ফীতি পর্যন্ত বের করে ফেলা যায়। এই তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে ব্ল্যাকহোল, হোয়াইট হোল, ওয়ার্মহোল, টাইম মেশিনের মতো জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে, যা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের একদম পরিপন্থী। এই বিষয়গুলো এমনই বিভ্রান্তিকর ছিল যে, আইনস্টাইন নিজেও এসবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। আইনস্টাইনের তত্ত্ব সঠিক হলে, ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব– এই কথাটি আইনস্টাইনকে অনেক বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি নিজের তত্ত্বের এই অনুসিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র এক ধরনের গাণিতিক ফলাফল বলে বাতিল করে দিয়েছেন। আজকের দিনে আমরা জানি, এগুলোকে এত সহজেই বাতিল করে দেওয়া যায় না। উপরের উল্লেখ করা সবগুলো জিনিসই সাধারণ আপেক্ষিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর মজার বিষয় হলো, আমাদের মহাবিশ্ব যখন বিগ ফ্রিজ বা বিগ চিলের মাধ্যমে বুদ্ধিমান প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে তখন এসব ব্যবহার করেই আমরা আমাদের সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে পারব।

BanglaBook.org

স্থান-কালের অনন্যতা ব্ল্যাকহোল

১৭৮৩ সালের কথা। জন মিচেল নামে এক ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ একটি অদ্ভুত বিষয় ভেবে বের করেন। একটি নক্ষত্র যদি অনেক অনেক বড় আকারের হয়, তাহলে তা থেকে আলো নিজেও বেরিয়ে আসতে পারবে না। তিনি জানতেন যে যেকোনো মহাজাগতিক বস্তুরই একটি মুক্তি বেগ

থাকে। এই বেগের বেশি বেগ হলে সেই বস্তুর মহাকর্ষীয় টান অতিক্রম করে বের হয়ে আসা যায়। যেমন- আমাদের পৃথিবীর মুক্তিবেগ হলো প্রতি ঘণ্টায় ২৫০০ মাইল। তাই কোনো রকেট যদি পৃথিবীর মহাকর্ষ টান অতিক্রম করে মহাকাশে পারি জমাতে চায়, তাহলে তাকে কমপক্ষে এই গতিবেগ অর্জন করতে হবে।

মিচেল ভেবে অবাক হলেন যে একটি নক্ষত্রের মুক্তি বেগ যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেই নক্ষত্র থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারবে না। এর প্রবল মহাকর্ষ বল সবকিছুকেই টেনে রাখবে। তাই বাইরে থাকা সবার কাছে একে কালো মনে হবে। এমনকি কোনোভাবেই একে দেখতে পাওয়া যাবে না। ঠিক যেন একাটি অদৃশ্য বস্তু। মিচেলের কাছে মনে হয়েছিল মহাকাশে এমন কোনো বড় নক্ষত্র থাকলেও একে খুঁজে পাওয়াটা একদম অসম্ভব।

মিচেলের এই অদৃশ্য নক্ষত্রের কথা প্রায় দেড়শ বছর চাপা পড়ে থাকে। ১৯১৬ সালের কথা। কার্ল সোয়ার্জচিল্ড নামে এক জার্মান পদার্থবিদ এই দানবীয় তারকাদের জন্য আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান তৈরি করার পর বিষয়টি নতুন করে আবার সবার নজরে আসে। এমনকি আজকের দিন পর্যন্তও সোয়ার্জচিল্ডের ঐ সমাধানকেই সবচে সহজ ও সুন্দর সমাধান হিসেবে মনে করা হয়। আইনস্টাইন দেখতে পেলেন সোয়ার্জচিল্ড তার সমীকরণের জটিল টেনসর সমীকরণগুলোর ভেতর থেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বের করেনিয়ে এসেছে যা এক কথায় অভিনব। সোয়ার্জচিল্ডের সমীকরণ থেকে খুব সহজেই একটি সাধারণ তারকা কীভাবে তার মহাকর্ষের দ্বারা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেবে তা নির্ণয় করা যায়। আইনস্টাইন দ্রুত সোয়ার্জচিল্ডের সমাধান ব্যবহার করে, আগে নিজের করা আনুমানিক ফলাফলগুলো পরীক্ষা করেনিলেন। এই কাজের জন্য আইনস্টাইন সোয়ার্জচিল্ডের ওপর অনেক খুশি ছিলেন। কারণ এর ফলে সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়া কোনো তারকার আলো ঠিক কতটা বেঁকে যাবে এসব হিসেব করায় অনেক সুবিধা হয়েছিল (১৯১৯ সালে এই সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেই আইনস্টাইনের তত্ত্ব পরীক্ষা করা হয়)।

BanglaBook.org

চিত্রঃ বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জচিল্ড

কিন্তু সোয়ার্জচিল্ডের দ্বিতীয় পেপারে তিনি সেই দৈত্যাকার তারকাদের ক্ষেত্রে একপ্রকার জাদু গোলকের কথা প্রমাণ করে দেখান। একে জাদু গোলক বললাম তার কারণ, এই গোলকের বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই অদ্ভুত। এখানে একবার যা প্রবেশ করবে তা ফিরে আসার আর কোনো উপায় থাকে না। এই জাদু গোলকের ভেতরে প্রবেশ করার পর সবকিছুই তার অকল্পনীয় মহাকর্ষের প্রভাবে সেখানে আটকে যায়। কোনোভাবেই এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই। এমনকি আলো নিজেও সেই মহাকর্ষের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সোয়ার্জচিল্ড আইনস্টাইনের সমীকরণ ব্যবহার করেনিজের অজান্তেই মিচেলের সেই অন্ধকার নক্ষত্রকে পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলেন।

এরপর তিনি এমন দানবীয় তারকাদের জাদু গোলকের ব্যাসার্ধ কত হতে পারে তা গণনা করে বের করেন। একে বলা হয় সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধ (Schwarzschild radius)। আমাদের সূর্যের সমান কোনো তারকার ক্ষেত্রে এই ব্যাসার্ধ হবে প্রায় ৩ কি.মি. (মোটামুটিভাবে ২ মাইলের মত)। আমাদের পৃথিবীর সমান কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধ হবে এক সেন্টিমিটারের মতো। অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের সূর্যকে কোনোভাবে চেপেচুপে ৩ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে এটি একটি অদৃশ্য তারকাতে পরিণত হবে। তখন এমনকি আলোও এর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না।

পরীক্ষামূলকভাবে এই জাদু-গোলকের অস্তিত্ব কোনো সমস্যা করে না, কারণ সূর্যের সমান কোনো বস্তুকে চেপে ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে

BanglaBook.org

নিয়ে আসাটা এক কথায় অসম্ভব। সাধারণভাবে দেখলে মনে হয়, কোনো উপায়েই এমন কোনো তারকা তৈরি হতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বীয়ভাবে এটি ছিল এক ধরনের বিপর্যয়। আবার আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুবিধা দিতে পারে। যেমন- সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনো তারকার আলো কতটা বেঁকে যাবে খুব সহজেই তা গণনা করা যায়। কিন্তু সেই জাদু গোলকের নিজের জন্য যখন এই একই জিনিস প্রয়োগ করা যায়, তখন এর কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখা যায় সে ক্ষেত্রে মহাকর্ষের টান হয় অসীম!

ডাচ পদার্থবিজ্ঞানী জোহানেস ড্রস্টি আরও কিছু গবেষণা করে দেখান যে এই সমাধান আরও পাগলাটে ফলাফল দেখায়। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আলো এত মারাত্মকভাবে বেঁকে যায় যায় যে তা বস্তুর গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে। এমনকি কোনো নক্ষত্রের আকার যখন সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণ হবে তখন আলো ঐ নক্ষত্রের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। ড্রস্টি এরপর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে হিসেব করে এই স্থানের সময়ের বিচ্যুতি বের করেন। তিনি দেখান যে আমরা যখন ঐ জাদু গোলকের কাছে যেতে থাকব তখন আমাদের ঘড়ির সময় ধীর থেকে ধীর হতে থাকবে। আর যে মুহূর্তে আমরা সেই গোলকের আওতার মধ্যে প্রবেশ করব, আমাদের ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে! এই গোলকের বাইরে থেকে যদি আমাদের কেউ পর্যবেক্ষণ করে তার কাছে মনে হবে যেন আমাদের সময় নিথর হয়ে গেছে (Frozen in time)। আসলে এই গোলকে প্রবেশ করার পর সময় বলে কিছু থাকে না, সময় একদম বন্ধ হয়ে যায়। তাই অনেক পদার্থবিদ মনে করেছিলেন প্রকৃতিতে এমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব না। তবে আশ্চর্যের কিন্তু এখানেই শেষ না, হারমান উয়েল গণনা করে দেখালেন যে এই জাদু গোলকের একদিকে যদি আমাদের মহাবিশ্ব হয়ে থাকে তবে, অন্যদিকে আরেকটি মহাবিশ্ব থাকার কথা। অর্থাৎ আমরা যদি এই গোলকের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যাই তাহলে অন্য একটি মহাবিশ্ব প্রবেশ করব।

উপরে জাদু গোলকের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো, তার সবগুলোই একই রকম অদ্ভুত। আর এ কারণেই আইনস্টাইন এমন বস্তুর অস্তিত্ব আছে

BanglaBook.org

বলে স্বীকার করতেন না। ১৯২২ সালে প্যারিসের এক কনফারেন্সে জ্যাকুইস হারমান্ড নামে এক গণিতবিদ আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করেন- 'প্রকৃতিতে যদি সত্যি এমন অনন্যতার (Singularity) অস্তিত্ব থেকে থাকে, যদি সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের মধ্যে মহাকর্ষ বল অসীম হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি কেমন হতে পারে?' হারমান্ডের জবাবে আইনস্টাইন বলেন- 'এই বিষয়টি তত্ত্বের জন্য একটি সত্যিকারের বিপর্যয়, আর এমন কোনো অবস্থায় আসলেই কি ঘটবে এ সম্পর্কে যুক্তি ও গণনার সাহায্যে বলাটা খুব কঠিন, কারণ এমন পরিস্থিতিতে এই তত্ত্ব আর প্রয়োগ করা যাবে না।' আইনস্টাইন পরে এই বিষয়টিকে, Hadamard disaster বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ভাবতেন এই অদৃশ্য তারকাকে ঘিরে এসব পরস্পরবিরোধী ধারণা সবই অনুমান মাত্র। আইনস্টাইনের এমন অনুমানের অবশ্য কারণও ছিল। প্রথমত কেউই এমন কোনো অদ্ভুত বস্তুর সন্ধান পায়নি, ফলে সম্ভবত এর কোনো অস্তিত্বই নেই। আর তাছাড়াও এমন বস্তুর অস্তিত্ব থাকাটাই অবাস্তব। আরও একটি বিষয় হলো- এমন কোনো বস্তুর আশেপাশে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

এরপর আছে সেই অবাস্তব ধারণা- সমান্তরাল মহাবিশ্বের কথা(সে সময় প্যারালাল ইউনিভার্স সংক্রান্ত সব ধারনাকেই অবাস্তব ভাবা হতো)। যেহেতু এমন কোনো বস্তুর ভেতর প্রবেশ করলে তা সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা যাবে না, এমনকি এর সংস্পর্শে যাওয়া মানেই মৃত্যু– ফলে সেই মহাবিশ্বে প্রবেশ করাও সম্ভব হবে না। আর সংজ্ঞা অনুসারেই এই জাদু গোলক অতিক্রম করাও সম্ভব না (যেহেতু এখানে সময় থেমে আছে!!!)।

১৯২০ সাল পর্যন্ত পদার্থবিদরা এই বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধার ভেতর ছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক জর্জ লেমিট্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে এই জাদু গোলক আসলে কোনো অনন্যতা (Singularity) না। আর এর মহাকর্ষ বলও অসীম না। বরং এটি এক ধরনের গাণিতিক বিভ্রান্তি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা এমন কয়েক সেট (Set) গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে গণনা করেছি, যার ফলে এমন ফলাফল পাওয়া গেছে। আমরা যদি ভিন্ন এক সেট স্থানাঙ্ক ও ভেরিয়েবল

BanglaBook.org

নিয়ে জাদু গোলকের মহাকর্ষ গণনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে আসলে কোনো অনন্যতা নেই।

লেমিট্রির এই ফলাফল শোনার পর এইচ পি রবার্টসন, জোহানেস ড্রস্টির সময় থেমে যাওয়া সংক্রান্ত মূল গণনাগুলো পুনরায় পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে সময় থেমে যাওয়ার বিষয়টি ঘটবে শুধু যদি আমরা একটি সুবিধাজনক অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করি। কোনো ব্যক্তি যদি একটি রকেটে চরে এই জাদু গোলকে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তার কাছে মনে হবে সে সেকেন্ডের খুব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে মহাকর্ষের টানে এখানে পতিত হয়েছে। আর সাথে সাথেই তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু যদি বাহির থেকে কোনো পর্যবেক্ষক এই ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার কাছে মনে হবে এই ঘটনাটি ঘটতে হাজার বছর সময় লাগছে। অর্থাৎ এক অর্থে মনে হবে যেন এখানে সময় থেমে গিয়েছে।

এই পার্থক্যটি বোঝা খুবই জরুরি। কারণ এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এমন বস্তু প্রকৃতিতে থাকাটা অবাস্তব না। আর এতে প্রবেশ করাটাও অসম্ভব কিছু না। এমনকি একে শুধু গাণিতিক ফলাফল বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এই গোলকের মধ্যে প্রবেশ করা হলে বিষয়টি কেমন হতে পারে এরপর বিজ্ঞানীরা তা গণনা করার চেষ্টা করেন। আজকের দিনে এই জাদু গোলককে ঘটনাদিগন্ত (Event horizon) বলা হয়। এমন একটি দৈত্যাকার ভরের নক্ষত্রের কতটুকু পর্যন্ত দেখা যাবে সেটাই হলো এই দিগন্ত অন্যভাবে বলা যায়, আলোক রশ্মি একটি ব্ল্যাকহোলের কতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে সেটাকেই ঘটনাদিগন্ত বলে। আর ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধকে সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধ বলা হয়।

আমরা যদি একটি ব্ল্যাকহোলের ভেতর প্রবেশ করতে চাই তাহলে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাব। সেই বিলিয়ন বছর আগে যে আলো এই ঘটনাদিগন্তে প্রবেশ করেছিল সেগুলো এখনো এখানে বন্দী হয়ে আছে। এমনকি ব্ল্যাকহোলটি সৃষ্টি হবার পর মুহূর্ত থেকে এখন পর্যন্ত যা কিছু এখানে প্রবেশ করেছে তার সবকিছুই এখানে বন্দী হয়ে আছে। এক কথায় এর ভেতর প্রবেশ করতে পারলে এর জীবন ইতিহাসটাই আমাদের কাছে

BanglaBook.org

উন্মোচিত হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা ঘটনাদিগন্তে প্রবেশ করার সাথে সাথেই এর প্রবল মহাকর্ষ বল আমাদের দেহের প্রতিটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে একদম আটা-ময়দা-সুজি করে ফেলবে। যতটুকু অংশ ঘটনাদিগন্তের ভেতরে যাবে, ততটুকু সাথে সাথেই একদম ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে এই ঘটনাদিগন্তে প্রবেশ করাটা একটা একমুখী রাস্তা। এর ভেতরে প্রবেশ করার মতো স্বাধীনতা আছে কিন্তু বের হবার মতো কোনো উপায় নেই। এর প্রবল মহাকর্ষ বলের কারণে কোনো কিছুই এর ঘটনাদিগন্তের ভেতরে একবার প্রবেশ করলে তা মুক্ত হতে পারে না। কারণ এই ঘটনাদিগন্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে ছুটতে হবে, বাস্তবে যা একদম অসম্ভব।

আইনস্টাইন নিজে ১৯৩৯ সালে একটি পেপার লিখে এই অদৃশ্য নক্ষত্রের ধারণাকে বাতিল করে দিতে চান। তার যুক্তি ছিল, এমন নক্ষত্র কখনোই প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হতে পারে না। মহাকাশে জমে থাকা গ্যাসীয় ধূলিকণা (সাধারণত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ) মহাকর্ষের প্রভাবে যখন একত্রিত হয়ে ঘূর্ণনের মাধ্যমে একটি গোলাকার জায়গায় মিলিত হতে থাকে তখন নক্ষত্র সৃষ্টি হয় এটি ধরে নিয়ে তিনি তার পেপার শুরু করেন। এরপর তিনি দেখান যে এই ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় পিণ্ড কখনোই সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণের কম হতে পারবে না, আর তাই এভাবে কোনো ব্ল্যাকহোলও তৈরি হতে পারবে না। কারণ কোনো গ্যাসীয় পিণ্ডকে সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণের কম হতে হলে, কাউকে আলোর বেগের থেকে বেশি বেগে চলতে হবে, যা সম্ভব নয়। আইনস্টাইন দেখান তাই আমাদের মহাবিশ্বের ভৌত বাস্তবতায় সোয়ার্জচিল্ড সিঙ্গুলারিটি থাকা বা সৃষ্টি হওয়া কোনটিই সম্ভব না।

আইনস্টাইনের মতো আর্থার এডিংটনও ব্ল্যাকহোলের বিষয়ে খুব রক্ষণশীল ছিলেন। এমনকি তিনি সারা জীবনই এই ধারনার বিরুদ্ধে বলে গেছেন। একবার তিনি বলেছিলেন- প্রকৃতিতে এমন কোনো নিয়ম থাকা উচিত যাতে কোনো নক্ষত্র এমন অদ্ভুত উপায়ে তৈরি না হয়"।

BanglaBook.org

মজার বিষয় হলো, ঠিক সেই বছরই রবার্ট ওপেনহাইমার ও তার ছাত্র হার্টল্যান্ড স্নাইডার দেখান যে অন্য পদ্ধতিতেও ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে পারে। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, প্রাকৃতিকভাবে মহাকাশে জমে থাকা গ্যাস মহাকর্ষের প্রভাবে (ঘূর্ণনরত অবস্থায়) সংকুচিত হয়ে ব্ল্যাকহোল তৈরি করবে না। কিন্তু এভাবে যেসব নক্ষত্র সৃষ্টি হবে সেসব নক্ষত্র থেকে পরবর্তী ধাপে ব্ল্যাকহোল তৈরি হবে। এভাবে ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির বিষয়টি বুঝতে হলে নক্ষত্রের জীবনচক্র সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আমাদের সূর্যের মতো নক্ষত্রগুলোর জন্ম হয়েছে আন্তঃমহাকাশীয় গ্যাসীয় বস্তুর সংকুচনের ফলে। এসব গ্যাসীয় বস্তুর প্রধান উপাদান মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। এই মহাকাশীয় গ্যাস এদের নিজ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে। আর সংকুচিত হতে থাকলে এদের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্যাসের অণুর আগে অন্য অণুগুলোর ধাক্কা লাগার পরিমাণ বাড়তেই থাকে। ফলে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড তাপ। সেটা যখন বেড়ে গিয়ে মোটামুটি গোটা দশেক মিলিয়ন ডিগ্রি পর্যন্ত হয়, তখন শুরু হয় পারমাণবিক ফিউশন বিক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ভেঙে হিলিয়াম ও হিলিয়াম ভেঙে হাইড্রোজেন তৈরি হয়।

আর এই শক্তিশালী বিক্রিয়ার ফলে আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুসারে যে ভর খোয়া যায় তা পরিণত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তিতে (সূর্য যে আলো বিকিরণ করে তা মূলত এই প্রক্রিয়া থেকেই তৈরি হয়)। এভাবেই তৈরি হয় নক্ষত্রগুলো। এসব নক্ষত্রের মধ্যে দুই ধরনের বল কাজ করে। ভেতরের ফিউশন বিক্রিয়ায় তৈরিকৃত বিপুল পরিমাণ শক্তি নক্ষত্রের ভিতরের সমস্ত পদার্থকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়। আবার এই বিশাল বস্তু-সম্ভার তাদের নিজের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ভেতরের দিকে সংকুচিত হতে চায়। ফলে এই দুই বিপরীত বলের টানাটানিতে নক্ষত্রগুলো একটি সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। আর তার নিজ শক্তি ও আলো বিকিরণ করতে থাকে। আমদের সূর্যও এমন একটি সাম্যাবস্থায় আছে। এর বয়স ৫০০ কোটি বছর এবং সে আরও ৫০০ কোটি বছর এই অবস্থায় থাকবে। ভাবছেন কিন্তু তারপর কী হবে?

BanglaBook.org

আসলে সকল নক্ষত্রের সাম্যাবস্থার বয়স এক না। এটি নির্ভর করে তার ভর কত তার ওপর। যদি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৫ গুণ বা তার বেশি হয়, তবে তা একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার বহির্দেশ উড়িয়ে দেবে। এই বিস্ফোরণকে বলা হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পরপরে থাকে কেন্দ্রস্থ ভারী মৌলের কোঁর (Core)। কিন্তু নক্ষত্রের ভর যদি ৩.২ সৌরভরের বেশি হয়, তবে সেটি তার কেন্দ্রস্থ চাপ সহ্য করতে পারে না। এ সীমাকে বলে ওপেনহাইমার-ভলকফ সীমা। যদি কোনো দৈত্যাকার নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি হয়, তাহলে তীব্র মহাকর্ষের প্রভাবে তার কোরটি চুপসে গিয়ে ৮০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে নেমে আসবে। যা সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের মধ্যে পড়ে।

আগেই বলেছি, সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধের সীমার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই। ফলে এটি একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবে। তাদের গণনা থেকে দেখা যায় যে ব্ল্যাকহোল থাকা শুধু সম্ভব বললে ভুল হবে; বরং মহাকাশের অসংখ্য দৈত্যাকার নক্ষত্রের শেষ পরিণতি একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবার মাধ্যমে শেষ হতে বাধ্য।

আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজ

আইনস্টাইন ভেবেছিলেন ব্ল্যাকহোলের মতো একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের বস্তু প্রকৃতিতে থাকাটা একদম অবিশ্বাস্য। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এই ব্ল্যাকহোলের ভেতর এমনকি ব্ল্যাকহোলের থেকেও বিস্ময়কর জিনিস ওয়ার্মরহাল লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গণিতবিদরা সাধারণত একে বহুভাবে সংযুক্ত স্থান (Multiply connected spaces) বলে থাকেন। কিন্তু পদার্থবিদরা একে ওয়ার্মহোল বলেন। এর অবশ্য কারণও আছে। একটি ওয়ার্ম বা কিট যেমন মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর এপাশ থেকে অন্যপাশে যাবার জন্য একটি বিকল্প সংক্ষিপ্ত রাস্তা তৈরি করতে পারে, তেমনি এই ওয়ার্ম হোলগুলোও মহাবিশ্বের দুটি স্থানের ভেতর একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা তৈরি করতে পারে। এদের অনেক সময় ডাইমেনশনাল পোর্টাল বা গেটওয়ে (Dimensional portals, or Gateways) বলা হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

এদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এই গেটওয়েগুলো আমাদের একটি বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে, যাকে বলা হয় আন্তঃমাত্রিক ভ্রমণ (Interdimensional travel)। এই আন্তঃমাত্রিক ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত মাত্রাকে ব্যাবহার করে খুব কম সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে পারি, এমনকি এক অর্থে আলোর বেগের থেকেও বেশি বেগে ভ্রমণ করা সম্ভব। চার্লস লাটউইজ ডডসন নামে একজন ইংরেজ গণিতবিদ সর্বপ্রথম ওয়ার্মহোলের ধারণাকে জনপ্রিয় করেন। মূলনাম ডডসন হলেও তিনি লুইস ক্যারল নামেই বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, কবি, গণিতবিদ, যুক্তিবিদ, ফটোগ্রাফার ও পুরোহিত। তিনি Through the Looking Glass বইয়ের মাধ্যমে ওয়ার্মহোলকে আয়না হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। এই গল্পে একটি ওয়ার্মহোল অক্সফোর্ডের এক গ্রামকে একটি আশ্চর্য দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছিল। তিনি এছাড়া Alice's Adventures in Wonderland নামে আরেকটি গল্প লিখেন, সেখানে এলিস নামে একটি মেয়ে একটি খরগোশের গর্ত দেখতে পায়। পরে সে ঐ গর্ত দিয়ে একটি অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করে। তার গল্পগুলো গতানুগতিক সাহিত্য লেখকদের মতো নয়, কেননা একজন পেশাদার গণিতবিদ হিসেবে তিনি বহুভাবে সংযুক্ত স্থানের ব্যাপারে ভালোমতোই পরিচিত ছিলেন।

গাণিতিকভাবে দেখলে, বহুভাবে সংযুক্ত স্থানের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এমন স্থানে কোনো ফিতাকে কুঁকড়ে একটি বিন্দুতে পরিণত করা যাবে না। সাধারণত কোনো ফিতা বা লুপকে অনায়াসেই সংকুচিত করে একটি বিন্দুতে পরিণত করে ফেলা যাবে। কিন্তু আমরা যদি একটি ডোনাটের কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যখন একটি ডোনাটকে ফিতা দিয়ে মুলে ফেলব তখন এটি এর পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকবে, কিন্তু মাঝের ছিদ্রটি ফাঁকাই থেকে যাবে।

আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন ফিতাকে মুড়ে একটি বিন্দুতে পরিণত করতে পারব না। যদি খুব চেষ্টা করি তাহলে হয়তো এর পৃষ্ঠের সাথে একদম লেগে থাকবে কিন্তু সংকুচিত করে একে বিন্দুতে পরিণত করা যাবে না। ডোনাটের এই আকৃতিকে জ্যামিতির ভাষায় টোরাস বলা হয়। টোরাস হলো বহুভাবে সংযুক্ত স্থানের একটি আদর্শ উদাহরণ। টোরাসের দুটি বিন্দুকে সংযুক্ত করার জন্য এর পরিধি বরাবর গেলেও সেই বিন্দুটিকে পাওয়া যাবে, আবার এর ছিদ্রের ভেতর দিয়েও একটি সংক্ষিপ্ত পথ পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

চিত্রঃ একটি ডোনাট। একটি ডোনাটকে সংকুচিত করে কখনোই একটি একটি বিন্দুতে পরিণত করা যাবে না। কারণ বাইরের প্রান্তটি ছোট করার সাথে সাথে ভেতরের প্রান্তটি ছোট হবে। কিন্তু ভেতরে একটি ফাঁকা থেকেই যাবে।

গণিতবিদরা এই বহুভাবে সংযুক্ত স্থানের এমন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক উল্লাসিত থাকলেও এমন স্থানের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকতে পারে তারা তা ভেবে দেখেননি। কিন্তু ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন ও তার ছাত্র নাথান রজেন পদার্থবিজ্ঞানের দুনিয়ার সাথে এই বহুভাবে সংযুক্ত স্থান ও ওয়ার্মহোলের প্রাথমিক ধারণাকে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা মূলত ব্ল্যাকহোলের সমাধানকে মৌলিক কণিকাদের আচরণ ব্যাখ্যার একটি মডেল হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। নিউটনের মতো আইনস্টাইনও মনে করতেন, কোনো পদার্থ বা কণিকার মহাকর্ষ বল কোনোভাবেই অসীম হতে পারে না। এই অনন্যতার কোনো বোধগম্য অর্থই হয় না। তাই আইনস্টাইন মনে করতেন এই ত্রুটি দূর করা দরকার।

ইলেকট্রনের মতো মৌলিক কণিকাদের সাধারণত আকৃতিহীন বিন্দুবৎ কণিকা মনে করা হয়। আইনস্টাইন ও রজেন ধারণা করেছিলেন ইলেকট্রনগুলোও এক ধরনের ব্ল্যাকহোল। অর্থাৎ স্থান-কালের নিজস্ব

BanglaBook.org

অনন্যতার কারণে এসব কণিকার উৎপত্তি হয়। এভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতার সাহায্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতের রহস্যময় বিষয়গুলো ব্যাখ্যার একটা উপায় পাওয়া যায়। সে অর্থে এই তত্ত্বকে একটি সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্বও বলা যেতে পারে। তারা একটি ব্ল্যাকহোলের সমাধানের সাহায্যে শুরু করেন। তাদের এই সমাধানের ব্ল্যাকহোলকে একটি লম্বা গলা-যুক্ত ফুলদানির সাথে তুলনা করা যায়। এরপর তারা এর গলাটি কেটে অন্য আরেকটি ব্ল্যাকহোলের সাথে জুড়ে দেন। এই গঠনটি দেখতে বেশ অদ্ভুত মনে হলেও আইনস্টাইনের কাছে মনে হয়েছিল এটি বেশ মসৃণ গঠন আর এতে কোনো অনন্যতাও থাকবে না। সব থেকে বড় বিষয়টি হলো এমন সমাধানে একটি ইলেকট্রন ব্ল্যাকহোলের মতো আচরণ করতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত ইলেকট্রনকে ব্ল্যাকহোল ভাবার ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজের ধারণাটিকে আজকাল বিজ্ঞানীরা অন্য বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবছেন। তাদের ধারণা এই ব্রিজ দুটি আলাদা মহাবিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের একটি সুন্দর উপায় হতে পারে। আমরা যদি দুর্ঘটনাবশত একটি ব্ল্যাকহোলের ভেতরে পড়ে যাই তবে হঠাৎ করে একটি সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে অন্য একটি মহাবিশ্বে গিয়ে উপস্থিত হব।

আইনস্টাইন মনে করতেন তার সমীকরণের কোনো সমাধান যদি একটি বিশ্বাসযোগ্য ভৌত বস্তুর দ্বারা শুরু হয়, তাহলে সেই সমাধান থেকে বাস্তবে অস্তিত্বশীল কোনো বস্তু থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কিন্তু কেউ যদি একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ে যায়, তবে অন্য প্রান্ত দিয়ে একটি সমান্তরাল মহাবিশ্বে প্রবেশ করবে কিনা এসব বিষয় নিয়ে আইনস্টাইনের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষের টান অসীম, তাই কেউ যদি একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ে যায় তবে এই অকল্পনীয় মহাকর্ষ বল তার শরীরের প্রতিটি অণুকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। আইনস্টাইন রজেন ব্রিজ প্রতি মুহূর্তেই খোলে। কিন্তু এটি এতটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় যে, কেউ যত বেগেই ভ্রমণ করুক না কেন, এপাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে না। আইনস্টাইন ভাবতেন ওয়ার্মহোল যদি থেকেও থাকে, তবে এটি কেমন জিনিস তা বলবার জন্য কোনো জীবিত প্রাণীর পক্ষে এমন কোনো টানেল পার হওয়া সম্ভব না।

BanglaBook.org

ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল

১৯৬৩ সালের কথা। রয় কার নামে নিউজিল্যান্ডের এক গণিতবিদ আইনস্টাইনের সমীকরণের এমন একটি সমাধান বের করেন যা ব্ল্যাকহোল সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটকেই সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। কোনো দানবীয় ভরের নক্ষত্রের শেষ পরিণতি কেমন হবে কারের সমাধানে থেকে এই বিষয়ে সবচে বাস্তবধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি দেখান- এমন একটি নক্ষত্র শেষ পর্যন্ত একটি ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবে।

আমরা সবাই ভর ও শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতির কথা শুনেছি। বিজ্ঞানে এমন আরও কয়েকটি সংরক্ষণশীলতার নীতি রয়েছে। তেমনি একটি নীতি হলো- কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণশীলতার নীতি। এই নীতির কারণে একটি নক্ষত্র যখন তার মহাকর্ষ বলের কারণে নিজের ভেতর চুপসে যেতে থাকে তখন তার ঘূর্ণন আরও দ্রুত হয়ে যায়। এ কারণেই ঘূর্ণনরত গ্যালাক্সিগুলোকে দেখতে কাগজের চরকার মতো মনে হয়। আবার একটি ঘূর্ণনরত নক্ষত্র তার মহাকর্ষের কারণে চুপসে গিয়ে নিউট্রন স্টারে পরিণত হতে পারে। এই নিউট্রন স্টারগুলোও দ্রুতবেগে ঘূর্ণনশীল হয়ে থাকে। এই তারকাদের ঘূর্ণনের ফলে এক ধরনের রিং-এর মতো তৈরি হয়। ঠিক তেমনি, কোনো তারকা যখন চুপসে গিয়ে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয় তখন এরাও এমন রিং তৈরি করে।

এই তারকাগুলো কিন্তু স্থায়ী হয়। কারণ, এর মহাকর্ষ বল একে ভেতরের দিকে চুপসে দিতে চায়। কিন্তু এর দ্রুত ঘূর্ণনের কারণে যে কেন্দ্রবিমুখী বল তৈরি হয় তা একে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। একটি নক্ষত্র কি শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকহোল হবে নাকি নিউট্রন স্টার হবে তা নির্ভর করে এদের ভরের ওপর।

মজার বিষয় হলো, কেউ যদি কারের ঘূর্ণনরত ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু সে মৃত্যুর মুখে পতিত হবে না। তার বদলে আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজ দিয়ে পার হয়ে সোজা একটি নতুন মহাবিশ্বে গিয়ে হাজির হবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এভাবে যদি কেউ কোনো ভিন্ন মহাবিশ্বে গিয়ে পৌছায়, সেই মহাবিশ্বের প্রকৃতি কিন্তু আমাদের মহাবিশ্বের মতো হবে না। সেই মহাবিশ্বের ভর ও ব্যাসার্ধ হবে ঋণাত্মক!! কার যখন

BanglaBook.org

আইনস্টাইনের সমীকরণের এই সমাধান খুঁজে পান তিনি তখন এতটাই আশ্চর্য হয়েছিলেন যে সাথে সাথেই তার এক সহকর্মীকে ডেকে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করে থাকতে পারছিলেন না।

কারের এই ঘূর্ণনরত রিংগুলোও আমাদের মহাবিশ্বের এক স্থান-কালকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের স্থান-কালের সাথে যুক্ত করে। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে। কারের ঘূর্ণনরত রিং দিয়ে একবার প্রবেশ করলে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ এটি একটি একমুখী রাস্তা। আপনি যখন কোনো ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করে কারের রিং-এর ভেতরে দিয়ে যাত্রা করবেন, তখন মহাকর্ষ আপনাকে পিষে ফেলবে না, কিন্তু এই বল এত তীব্র হবে যে ফিরে আসাটা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

কারের রিং- এ মূলত দুটি ঘটনাদিগন্ত রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, অন্য মহাবিশ্ব থেকে আমাদের মহাবিশ্বে ফিরে আসার জন্য আমাদের অবশ্যই দ্বিতীয় ঘটনাদিগন্তটি ব্যবহার করতে হবে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তাই কারের ব্ল্যাকহোলে যাত্রা করাকে অনেকটা একমুখী লিফটের সাথে তুলনা করা যায়। ধরুন একটি আকাশচুম্বী অট্টালিকাতে একটি লিফট আছে।

আর অট্টালিকার তলসংখ্যা অসীম। আপনি লিফটে করে শুধু উপরের দিকে যেতে পারবেন, কারণ এখানে ডাউন বাটন বলে কিছু নেই। তাই আপনি যদি লিফটে উঠে একবার আপ বাটনে চাপ দেন তবে আর নিচে ফেরার কোনো উপায় থাকবে না। এমন একটি লিফটকেও আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

কারের রিং আসলে কতটা স্থায়ী সে নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। কিছু কিছু গণনা থেকে জানা গেছে যদি কেউ এমন একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে এই বস্তুর উপস্থিতি কারের রিংকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। ফলে আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজও বন্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা যদি একটি আলোকরশ্মিকে এই ব্রিজের ভেতর দিয়ে পার করে দিতে চাই তাহলে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে এটি অস্বাভাবিক হারে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবে।

অর্থাৎ আলোক রশ্মিটির নীল অপসারণ দেখা দেবে (Blue shift)। এটি যখন ঘটনা দিগন্তের পৌঁছে যাবে এই আলোকরশ্মি এতটাই শক্তিশালী হবে

BanglaBook.org

যে আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজ দিয়ে পার হতে থাকা কাউকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এর থেকে বড় বিষয় হলো- শক্তি বৃদ্ধি করার সাথে সাথে এর নিজের মহাকর্ষ ক্ষেত্রও শক্তিশালী হবে- যা মূল ব্ল্যাকহোলটির সাথেও মিথস্ক্রিয়ায় জড়াবে। আর এর ফলে মূল আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এক কথায় বলা যায়- যদিও কিছু বিজ্ঞানী কারের ব্ল্যাকহোল রিং ব্যবহার করে আইনস্টাইন-রজেন ব্রিজ দিয়ে পার হবার স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু এভাবে পারি দেওয়াটা বাস্তবে কতটুকু সম্ভব হবে তা এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। বিশেষ করে কিছু গণনার ফলাফল থেকে মনে হয় এমন কোনো ব্ল্যাকহোল রিং-এ ঢুকে পড়ার চিন্তাটা মোটেও নিরাপদ নয়।

পর্যবেক্ষণযোগ্য ব্ল্যাকহোল বিভিন্ন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এই ৯০ দশকের শেষের দিক পর্যন্তও ব্ল্যাকহোলকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বিষয়বস্তু বলে মনে করা হতো। আর তা হবেই বা না কেন? এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ বা অন্য কোনোভাবে প্রমাণ না করা পর্যন্ত কিছু দ্বিধা তো থেকেই যায়। ১৯৯৮ সালে

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় জ্যোতির্বিদ ডগলাস রিচস্টোন বলেন যে- 'আজ থেকে দশ বছর আগে আপনি যদি গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকের কোনো বস্তুকে ব্ল্যাকহোল বলে ধরে নিতেন, তাহলে অর্ধেক মানুষ ভেবে নিত আপনি একজন ফুলবাবু ধরনের হাবাগোবা মানুষ।' তার ঐ বক্তৃতার পর থেকে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় শতাধিক ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করার জন্য জ্যোতির্বিদরা হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble space telescope), চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপ (Chandra X-ray space telescope) ও ভেরি লার্জ এ্যারে রেডিও টেলিস্কোপ (Very Large Array Radio Telescope) এর সহায়তা নিয়েছেন।

চন্দ্র এক্স-রে স্পেস টেলিস্কোপ বিভিন্ন মহাজাগতিক উৎস থেকে বিকিরিত হওয়া শক্তিশালী এক্স-রে বিকিরণ পরিমাপ করতে পারে। আর ভেরি লার্জ অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপ মূলত অনেকগুলো শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সমষ্টি। এই শক্তিশালী টেলিস্কোপগুলো নিউ মেক্সিকোতে অবস্থিত।

BanglaBook.org

এদের দ্বারা ব্ল্যাকহোল ছাড়াও মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে গ্যাসীয় বস্তুদের বিভিন্ন জটিল গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই সময়ের বেশিরভাগ জ্যোতির্বিদই মনে করেন মহাবিশ্বের বেশিরভাগ গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই ব্ল্যাকহোল রয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দেখা গেল- মহাকাশে আবিষ্কার করা সব ব্ল্যাকহোলই ঘূর্ণনরত। এর মধ্যে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে কিছু ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো প্রতি ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার বেগে ঘুরছে। গ্যালাক্সির একদম কেন্দ্রে তাকালে আমরা একটি সমতল কোর (Core) দেখতে পাব। এই কোরগুলো সাধারণত এক আলোকবর্ষ বিস্তৃত হয়ে থাকে। এই কোরের ভেতরের দিকে ব্ল্যাকহোল ও এর ঘটনা দিগন্ত থাকে।

এখন নিশ্চয় মনে প্রশ্ন জাগছে, ব্ল্যাকহোল তো দেখতেই পাওয়া যায় না, তাহলে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে ব্ল্যাকহোল আছে তা কীভাবে শনাক্ত করা হয়? এমনিতে ভাবলে মনে হতে পারে এই কাজটি বুঝি খুব ঝামেলার। তবে এটি কিন্তু খুব কঠিন কাজ না। ব্ল্যাকহোল যেহেতু দেখতে পাওয়া যায় না, তাই জ্যোতির্বিদদের কিছু পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়।

ব্ল্যাকহোল কীভাবে শনাক্ত করতে হয় তা জানতে হলে এক্রিশন ডিস্ক (Accretion disk) নামে একটি জিনিসের সাথে পরিচিত হতে হবে। মহাকাশের যত দ্রুত ঘূর্ণনশীল নক্ষত্র বা নক্ষত্রসদৃশ বস্তু আছে তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে এক্রিশন ডিস্ক থাকে। যেকোনো ভারী ও দ্রুতবেগে ঘূর্ণনশীল মহাকাশীয় বস্তুর পাশে মহাকাশীয় ধূলিকণা জড়ো হয়ে একটি ডিস্ক তৈরি করে। প্রায় সব নক্ষত্রেরই এমন একটি ডিস্ক থাকে। কিছু কিছু নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই ডিস্ক ঘনীভূত হয়ে গ্রহ তৈরি করে। আজ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে আমাদের সূর্যেরও এমন একটি এক্রিশন ডিস্ক ছিল। পড়ে তা ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীর ও চাঁদের মতো গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করেছে। ঠিক তেমনি, কোনো গ্যালাক্সির ভেতর যদি একটি ব্ল্যাকহোল থাকে তবে সেই ব্ল্যাকহোলকে দেখা না গেলেও ঐ এক্রিশন ডিস্কটি ঠিকই দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা ছবি তোলার সময় ব্ল্যাকহোলের এই ঘূর্ণনরত গ্যাসের এক্রিশন ডিস্কের ছবি তোলেন। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো এক্রিশন ডিস্কের সুন্দর সুন্দর ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

BanglaBook.org

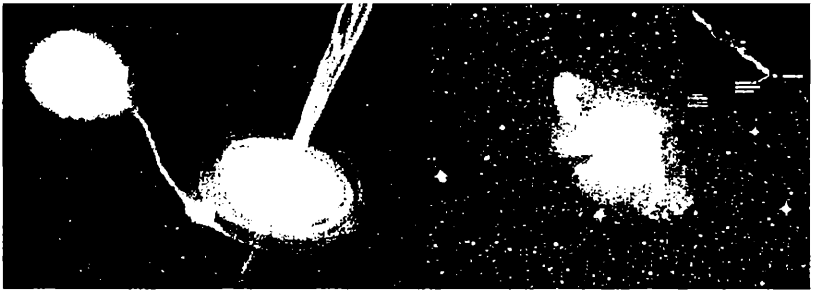

চিত্রঃ ব্ল্যাক হোলের এক্রিশন ডিস্ক।

এই ডিস্কগুলো তৈরি হবার পেছনে কিন্তু কারণ আছে। আমরা জানি যেকোনো কিছুই তার সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে থাকতে চায়। আর এই ডিস্কগুলো তৈরি হয় কারণ, এগুলোই হলো এমন ঘূর্ণনরত বস্তুর সব থেকে কম শক্তিযুক্ত অবস্থা। নিউটনের গতিসূত্র প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা এই ডিস্কের কেন্দ্রে থাকা বস্তুর ভর গণনা করতে পারেন। এমন একটি বস্তুর ভর নির্ভর করে একে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা নক্ষত্রদের গতির উপর। গতি যত বেশি হবে বুঝতে হবে কেন্দ্রের বস্তুটির ভরও তত বেশি। এখন কেন্দ্রের বস্তুটির ভরের মুক্তিবেগ যদি আলোর বেগের সমান বা বেশি হয় তাহলে আলো নিজেও এই বস্তু থেকে বের হতে পারবে না। আর এভাবেই বিজ্ঞানীরা এক্রিশন ডিস্ক ও তার চারপাশে ঘূর্ণনরত নক্ষত্রদের গতি থেকে হিসেব করে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তটি থাকে এক্রিশন ডিস্কের একদম কেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ঘটনা দিগন্ত এতটাই ক্ষুদ্র যে আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে কোনো ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তের ছবি তোলাটা সম্ভব না। জ্যোতির্বিদ ফালভিও মেলিয়া বলেছেন, 'ঘটনাদিগন্তের ছবি ফিল্মে ধারণ করাটা ব্ল্যাকহোল বিজ্ঞানের হলি গ্রেইলের মতো'। এক্রিশন ডিস্ক থেকে প্রবেশ করা যে গ্যাস ব্ল্যাকহোলে পতিত হয়, তার সবটুকু গ্যাস ঘটনাদিগন্ত পার হয়ে যেতে পারে না। কিছু পরিমাণ গ্যাস বাইপাস ছেড়ে মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় এই গ্যাসের প্রচণ্ড গতিতে সরু ঝর্ণার মতো বেরিয়ে যায়। এই ঝর্ণার দুটি ধারা হয়- একটি ব্ল্যাকহোলের উত্তর মেরুর দিকে অন্যটি দক্ষিণ মেরুর দিকে। এই নিক্ষিপ্ত ঝর্ণার কারণে এসব ব্ল্যাকহোলকে দেখতে এক ধরনের ঘূর্ণায়মান লাটিমের মতো দেখায়।

BanglaBook.org

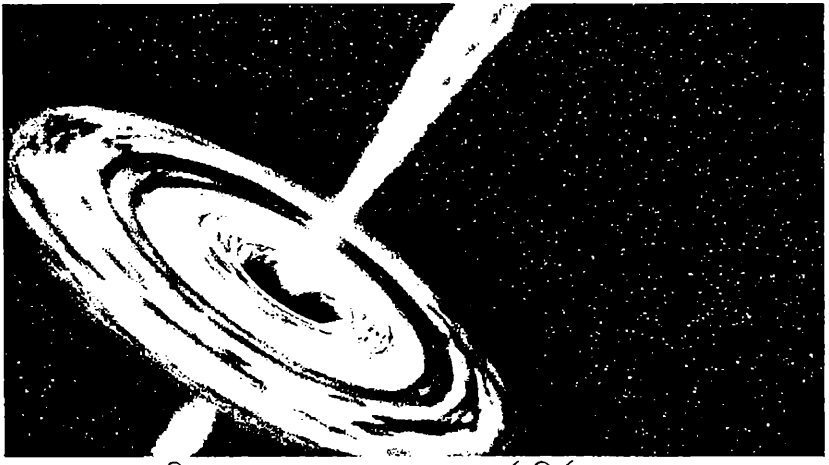

চিত্রঃ ব্ল্যাক হোল থেকে গ্যাসের ঝর্না নির্গত হচ্ছে।

এ পর্যন্ত মোট দুই ধরনের ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রথম ধরনের ব্ল্যাকহোলকে বলা হয়, 'নাক্ষত্রিক ব্ল্যাকহোল'। দৈত্যাকার আকৃতির নক্ষত্রগুলো তাদের জীবন শেষ করে দিয়ে মহাকর্ষের প্রভাবে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। এগুলো শনাক্ত করা তুলনামূলকভাবে অনেক কঠিন। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ব্ল্যাকহোলকে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়। এদের বলা হয় গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল। বৃহৎ আকৃতির যেকোনো গ্যালাক্সি বা কোয়াসারের কেন্দ্রে এই ব্ল্যাকহোলগুলোকে পাওয়া যায়। এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের ভর হয় অস্বাভাবিক রকমের বেশি। কোনোটা সূর্যের ভরের মিলিয়ন-বিলিয়ন গুণেরও বেশি। সম্প্রতি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে নিশ্চিতভাবে একটি ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে এত ধূলিকণা জমে আছে যে তা কেন্দ্রের দিকটা একদম ঝাপসা করে রেখেছে। যদি এই ধূলিকণার ঝাপসা আবরণ না থাকত তবে আমরা পৃথিবী থেকে প্রতি রাতেই স্যাগিটেরাস নক্ষত্রপুঞ্জ (ধনু রাশি) থেকে আসা উল্কাপিণ্ডের উজ্জ্বল শোভা দেখতে পারতাম। শুনতে অবাক লাগবে এই ধূলিকণা না থাকলে এই ঔজ্জ্বল্য চাদের আলোকেও ছাড়িয়ে যেত গ্যালাক্সি কেন্দ্রের এই আলোই হতো রাতের আকাশের সব থেকে উজ্জ্বল আলোর উৎস। আমাদের গ্যালাক্সির একদম কেন্দ্রে এমন একটি ব্ল্যাকহোল আছে যার ভর আমাদের সূর্যের ভরের ২৫ লক্ষ গুণ। এর আকার বুধ গ্রহের কক্ষপথের দশ ভাগের এক ভাগ। তবে গ্যালাক্টিক স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে এটি কিন্তু বড় আকারের কোনো

BanglaBook.org

ব্ল্যাকহোল না। কিছু কিছু কোয়াসারের ভেতর এমন ব্ল্যাকহোল আছে, যাদের ভর সূর্যের ভরের কয়েক বিলিয়ন গুণ।

সে তুলনায় আমাদের গ্যালাক্সির ব্ল্যাকহোলকে মামুলি বলা চলে। মিল্কিওয়ের ব্ল্যাকহোল ছাড়া আমাদের সবথেকে কাছের গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোলটি আছে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এন্ড্রোমিডা হলো সৌরজগতের সবথেকে কাছের গ্যালাক্সি। এন্ড্রোমিডার ব্ল্যাকহোলের ভর সূর্যের ভরের ৩০ মিলিয়ন গুণ। আর এর সোয়ার্জচিল্ড ব্যাসার্ধ প্রায় ৬০ মিলিয়ন মাইল।

এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে কমপক্ষে দুটি দৈত্যাকার ভরের ব্ল্যাকহোল রয়েছে। একটি এন্ড্রোমিডার কেন্দ্রের নিজস্ব ব্ল্যাকহোল। আর অন্যটি সম্ভবত বিলিয়ন বছর আগে কোনো গ্যালাক্সির সাথে সংঘর্ষের ফলে এন্ড্রোমিডা যাকে গ্রাস করেছিল সেটির ব্ল্যাকহোল। ধারণা করা হয়, আজ থেকে বিলিয়ন বছর পড়ে যদি আমাদের মিল্কিওয়ের সাথে এন্ড্রোমিডার সংঘর্ষ হয়, তবে মিল্কিওয়েকেও এটি গ্রাস করে ফেলবে। ফলে তখন আর মিল্কিওয়ে বলে কোনো গ্যালাক্সির অস্তিত্ব থাকবে না। অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে আসা কোনো ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা এন্ড্রোমিডার তিনটি ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করে শুধু জানতে পারবে- এখানে সম্ভবত আরও কোনো গ্যালাক্সি ছিল, যা এখন এন্ড্রোমিডার পেটের ভেতর। এ পর্যন্ত অনেকগুলো গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা হয়েছে। তার মধ্যে সবচে সুন্দর হলো হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা NGC 4261 গ্যালাক্সির। এর আগেও শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে অনেকগুলো ব্ল্যাকহোল (গ্যালাক্সির উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে) থেকে নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত প্লাজমা ঝর্ণার ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য তৈরির পেছনের কারণটি তখনো আমরা জানতাম না। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের ছবির সাহায্যে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের যে সুন্দর ডিস্কটি আবিষ্কার করা হয়েছে তার কোর (Core) ৪০০ আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত। এই ডিস্কটির কেন্দ্রে একটি ছোট্ট বিন্দুর মতো এক্রিশন ডিস্ক রয়েছে। কিন্তু হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে এই ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলটির কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এই

BanglaBook.org

ডিস্ক দেখার জন্য আমাদের আরও শক্তিশালী দূরবীক্ষণ প্রয়োজন। এই ব্ল্যাকহোলটির ভর সূর্যের ভরের প্রায় ১.২ বিলিয়ন গুণ।

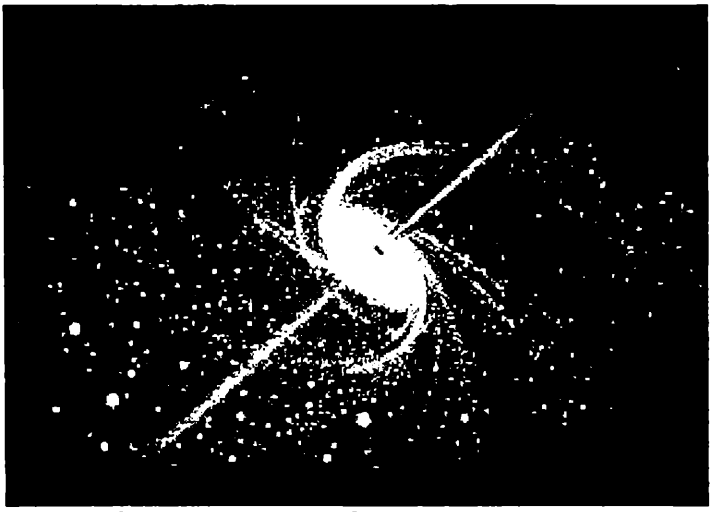

চিত্রঃ NGC 4261 গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোল

গ্যালাক্টিক ব্ল্যাকহোল গুলো এতটা বড় আর শক্তিশালী হয়ে থাকে যে, এরা অনেক সময় অনেক বড় বড় নক্ষত্রকেও গ্রাস করে ফেলে। ২০০৪ সালে নাসা (NASA) ও ইয়োরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (European Space Agency) জানায়- তারা দূরবর্তী একটি গ্যালাক্সিতে, কোনো এক ব্ল্যাকহোল দ্বারা সম্পূর্ণ একটি নক্ষত্রকে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করার ছবি শনাক্ত করতে পেরেছেন। চন্দ্র এক্স-রে টেলিস্কোপ (The Chandra X-ray telescope) ও ইউরোপিয়ান এক্সএক্সএম-নিউটন স্যাটেলাইট (European XMM-Newton satellite) উভয়ই একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিল। এছাড়া RX J1242–11 গ্যালাক্সি থেকে একটি তীব্র এক্স-রে বিকিরণ শনাক্ত করা হয়েছে, যা থেকে জানা গেছে কোনো একটি ব্ল্যাকহোল একটি নক্ষত্রকে গলাধঃকরণ করে ফেলেছে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন এই ব্ল্যাকহোলটির ভর আমাদের সূর্যের ভরের ১০০ মিলিয়ন গুণ। হিসেব থেকে আরও জানা গেছে একটি নক্ষত্র যখন কোনো ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তের কাছাকাছি আসতে থাকে, তখন এর তীব্র মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে নক্ষত্রটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর ঘটে একটি তীব্র বিস্ফোরণ।

BanglaBook.org

সেই বিস্ফোরণের ফলেই এই তীব্র এক্স-রে বিকিরিত হয়। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের পর্যবেক্ষক জ্যোতির্বিদ Stefanie Komossa বলেছেন "এই তারকাগুলো এদের ব্রেকিং পয়েন্ট থেকে প্রসারিত হতে থাকে। আর এমন দুর্ভাগা প্রতিবেশীর আচরণে বেশ অবাক হয়ে যায় "। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতির বিষয়টি আমাদের বহুদিনের জমানো অনেক রহস্যের সমাধান করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ M-87 গ্যালাক্সির কথা ধরা যাক। এই গ্যালাক্সিটি জ্যোতির্বিদদের কাছে সবসময়ই খুব কৌতূহল উদ্দীপক ছিল। কারণ এই বিশাল সংখ্যক নক্ষত্রসমৃদ্ধ বৃহৎ ভরের গ্যালাক্সিটির এক পাশে লম্বা লেজের মতো কিছু একটা ছিল। এর এক পাশ থেকে খুবই তীব্র বিকিরণ বের হত(তাই পর্যবেক্ষণের সময় একটি লম্বা লেজের মতো দেখা যেত) বলে বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন এটি সম্ভবত কোনো এন্টিম্যাটারের ঝর্ণা হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ৩ বিলিয়ন সৌরভরের একটি ব্ল্যাকহোল খুঁজে পেয়েছেন। আর ঐ লেজটি ছিল আসলে ঐ ব্ল্যাকহোল থেকে নির্গত হওয়া প্লাজমার ঝর্ণা।

চন্দ্র এক্স-রে টেলিস্কোপের(Chandra X-ray telescope) সাহায্যে আরও একটি অবাক করা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। জ্যোতির্বিদরা যখন মহাজাগতিক ধূলিকণার একটি আবরণ পেরিয়ে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তে একগুচ্ছ ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন সেটি বেশ অবাক করা বিষয় ছিল। তাদের সেই পর্যবেক্ষণে ৬০০ ব্ল্যাকহোলের একটি গুচ্ছ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ তথ্যের আলোকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন- আমাদের রাতের আকাশে কমপক্ষে ৩০০ মিলিয়ন ব্ল্যাকহোল আছে।

উপরে উল্লেখ করা সব ব্ল্যাকহোলই সম্ভবত বিলিয়ন বছর পুরনো। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি হবার মুহূর্তের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই দুর্লভ কাজ করা সম্ভব হয়েছে কারণ এগুলো থেকে শক্তিশালী গামা-রে বিস্ফোরণ হয়, যা থেকে মহাবিশ্বের সব থেকে বেশি শক্তি নিঃসৃত হয়। এগুলো থেকে এতটাই বেশি শক্তি বিকিরিত হয় যে, বিজ্ঞানীরা বলেন- বিগ ব্যাং-এর পর এই গামা-রে বিস্ফোরণই হলো দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তিশালী বিকিরণ।

BanglaBook.org

গামা-রে বিস্ফোরণের একটি আগ্রহ উদ্দীপক ইতিহাস আছে। তখন কোল্ড ওয়ার চলছে। ৬০এর দশকের শেষ ভাগের কথা। যুক্তরাষ্ট্র ভাবছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্য কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বুঝি গোপনে পারমাণবিক বোমা বানানোর চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল এটি সম্ভবত খুবই গোপনে করা হচ্ছে, যা পৃথিবীর কোনো দুরূহ অঞ্চল এমনকি চাঁদেও হতে পারে। আর এভাবে কোনো বোমা তৈরি করার চেষ্টা করা মূলত চুক্তি ভঙ্গ করার মধ্যে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তা অবশ্যই শনাক্ত করা যাবে। এমন কোনো বিস্ফোরণ যাতে শনাক্ত করা যায় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র 'ভেলা' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল আকারের বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ফলে এমন উজ্জ্বল বিস্ফোরণ হলে তা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে দেখা যাবেই। ১৯৭০ এর মধ্যে ভেলা স্যাটেলাইট এমন দুটি বিস্ফোরণের ছবি তুলতে সক্ষম হয়। এই বিস্ফোরণগুলো প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডের তীর বরাবর দেখা দিয়েছিল। এসময় সেখানে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ থাকার কারণে বিশ্বের বড় বড় বোদ্ধার এ নিয়ে এখনো বিতর্ক করে থাকেন। কিন্তু এখন আমরা জানি, ভেলার সাহায্যে তারা মূলত মহাকাশের কিছু শক্তিশালী গামা-রে বিস্ফোরণের ছবি তুলেছিল! সে সময়ের প্রযুক্তি অনেক অনগ্রসর হওয়াতে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে বিজ্ঞানীরা তখন বুঝতে পারেননি এটি আসলে কোনো উৎস থেকে আসা বিস্ফোরণের চিহ্ন। কিন্তু আজকের দিনের কথা আলাদা। এখন আমাদের প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। স্পেস টেলিস্কোপ, কম্পিউটার ইত্যাদির সাহায্যে এখন অনেক নিখুঁতভাবে এসব গামা-রে বিস্ফোরণ শনাক্ত করা যায়। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতিদিন তিনটি গামা-রে শনাক্ত করা যায়। এসব বিস্ফোরণের উৎস সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা এখন দ্রুতগতির কম্পিউটার ব্যবহার করেন, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাকে আরও গতিশীল করেছে।

এসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে আমাদের সামনে কিছু বিস্ময়কর ফলাফল উন্মোচিত হয়েছে। বিস্ফোরণের ছবি বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে এসব মারাত্মক বিস্ফোরণের কেন্দ্রীয় বস্তুগুলোর

BanglaBook.org

ব্যাস মাত্র একশ মাইলের মত। অন্যভাবে বলা যায়, এত মারাত্মক বিস্ফোরণের ঘটানোর জন্য দায়ী বস্তুগুলোর আকার মাত্র মোটামুটি আকারের একটি শহরের সমান। এই বিস্ফোরণের বেশির ভাগই ঘটে থাকে বিভিন্ন বাইনারি নক্ষত্র ও পালসারের সংঘর্ষের ফলে। এই ঘটনাগুলো যদিও খুবই কম ঘটে; তবে আমাদের মহাবিশ্বটি যেহেতু প্রায় অসীম বিস্তৃত, তাই রাতের আকাশে তাকালে মাঝে মাঝেই এমন বিস্ফোরণ চোখে পড়বে। আর এগুলোর তীব্রতা এত বেশি হয় যে বিস্ফোরণের কয়েক দিন পর্যন্ত তা আলো দিতে থাকে।

কিন্তু ২০০৩ সাল পাওয়া কিছু নতুন তথ্য প্রমাণের সাহায্যে দেখা গেছে এই শক্তিশালী গামা-রে বিস্ফোরণগুলো আসলে কিছু হাইপারনোভা (Hypernova) বিস্ফোরণের ফলেও হয়ে থাকে।

হাইপারনোভাকে অনেক সময় সুপারলুমিনাস হাইপারনোভা (Superluminous supernovae) নামেও ডাকা হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণ কেন ঘটে তা আমরা আগেই জেনেছি। নক্ষত্রগুলো সাম্যাবস্থার বয়স পেরিয়ে গেলে এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়ে থাকে। যদি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৫ গুণ হয় তবে তা একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার বহির্দেশ উড়িয়ে দেয়। হাইপারনোভা বিস্ফোরণ মূলত এমন এক ধরনের সুপারনোভা বিস্ফোরণ। তবে এই বিস্ফোরণের শক্তি সাধারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। একটি হাইপারনোভা বিস্ফোরণের পরে নক্ষত্রটি একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। অর্থাৎ আমরা যখন একটি হাইপারনোভা বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করব তখন বুঝতে হবে আমরা একটি ব্ল্যাকহোলের জন্ম দেখলাম।

দ্রুত ফোকাস করার ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিস্কোপ ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এসব শক্তিশালী গামা-রে বিস্ফোরণ দেখা যায়। জ্যোতির্বিদরা নিশ্চিত হয়েছেন যে এগুলো আসলে দৈত্যাকার সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলেই হয়ে থাকে। এসব বিস্ফোরিত নক্ষত্রগুলোর প্রচুর শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্র থাকে আর এরা এদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু দিয়ে মারাত্মক শক্তিশালী বিকিরণ নির্গত করে। ফলে এই বিস্ফোরণের তীব্রতা যতটুকু হবার কথা ছিল আদতে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে আমরা পৃথিবী থেকে যেসব বিস্ফোরণ দেখতে পারি তাদের মূল বিস্ফোরণের থেকে বেশি শক্তিশালী

BanglaBook.org

মনে হয়। এই বিস্ফোরণগুলো যদি ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাহলে আগামী দিনের উন্নত প্রযুক্তি ও স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে এদের আরও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ফলে এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে স্থান-কাল সম্পর্কে অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। বিশেষ করে ব্ল্যাকহোল কীভাবে স্থান-কালকে বাকিয়ে দেয় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। একটি ব্ল্যাকহোল যদি স্থানকে প্রেটজেলের (ময়দার তৈরি প্যাঁচানো দেখতে এক ধরনের খাবার; এই প্যাচগুলো এক ধরনের লুপ তৈরি করে) মতো বাঁকিয়ে দেয়, তবে এগুলো কি সময়কেও বাকিয়ে দিতে পারবে?

আইনস্টাইনের সমীকরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় একটি ব্ল্যাকহোল সময়কেও বাঁকিয়ে দিতে পারে। এমনকি ঘুরিয়ে লুপও তৈরি হওয়া সম্ভব। ব্ল্যাকহোলের এমন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণেই এটি টাইম ট্র্যাভেল সম্পর্কে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ব্ল্যাকহোলের শক্তিশালী মহাকর্ষ স্থান-কালকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যায় যার সাথে আমাদের দেখা কোনো কিছুরই মিল নেই। এই ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে থাকতে পারে ওয়ার্মহোল এমনকি হোয়াইট হোল। তাই টাইম ট্র্যাভেলের আলোচনায় ব্ল্যাকহোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই টাইম মেশিনের বিস্তারিত বর্ণনার আগে স্থান-কালের এসব অনন্যতা নিয়ে এতসব আলোচনা।

ভ্যান স্টোকামের টাইম মেশিন

আমরা আগেই জেনেছি, আইনস্টাইনের তত্ত্ব স্থান ও সময়কে একটি অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সত্তায় পরিণত করেছে। ফলে একটি ব্ল্যাকহোলের ভেতরে থাকা ওয়ার্মহোল যখন স্থানের দুটি ভিন্ন বিন্দুকে সংযুক্ত করে, তখন এটি মূলত দুটি ভিন্ন সময়কেও যুক্ত করে। সহজভাবে বলা যায়, আইনস্টাইনের তত্ত্ব সময় ভ্রমণকে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমোদন করে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজে এই সময়ের পেছনে যাবার ব্যাপারটি অনুমোদন করতেন না। তার মতো ছিল সময়ের এই নদীর স্রোত বেঁকে গেলেও বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। তবে নদীতে যেমন পানির ঘূর্ণি সৃষ্টি হয় তেমন থাকার সম্ভাবনা আছে।

BanglaBook.org

আইনস্টাইন সময় ভ্রমণ অনুমোদন না করলেও, তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণ বিশ্লেষণ করে অনেকেই টাইম মেশিন বানাতে চেয়েছেন। ১৯৩৭ সালে ডব্লু. জে. ভ্যান স্টোকাম সময়ের বিপরীতে যাবার মতো একটি সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। তিনি আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান থেকে দেখান যে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব টাইম ট্র্যাভেল অনুমোদন করে। তিনি একটি অসীম দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার দিয়ে শুরু করেন। তার গণনায় দেখা যায়, একটি অসীম দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার যখন আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ঘুরতে থাকবে তখন এটি স্থান-কালের বুননকে (সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারী স্থান-কালের গঠন কিছুটা ফেব্রিকের বুননের মত) শক্তভাবে টেনে কুঁকড়ে ফেলবে। এই বিষয়টি ফ্রেম ড্র্যাগিং (Frame-dragging) নামে পরিচিত। এই বিষয়টি পরীক্ষার সাহায্যেও নিশ্চিত করে দেখা গেছে। ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের নিখুঁত ছবির সাহায্যে স্থান-কালের এই বক্রতা দেখা যায়।

এখন কেউ যদি এমন একটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের চারপাশে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ঘুরতে পারে তবে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা কোনো দর্শকের কাছে মনে হবে যেন সে আলোর বেগের থেকেও বেশি বেগে ভ্রমণ করছে। স্টোকাম যখন এই সমাধান প্রস্তাব করেছিলেন তখন তিনি নিজেও জানতেন না যে তার এই বিশেষ ধরনের ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারে যদি কেউ ভ্রমণ করতে চায়, তবে সে টাইম ট্র্যাভেল করতে পারবে। এমন একটি সিলিন্ডারে ভ্রমণ করলে, ভ্রমণকারী যে সময়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেই সময়ের আগেই পূর্বের অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে।

এখন আপনি যদি এই সিলিন্ডারে চারিদিকে ঘুরতেই থাকেন তাহলে প্রথমে আপনি যে সময়ে যাত্রা করেছিলেন সেই সময়ের পূর্বের সময়ে পৌঁছুবেন। এখন আবার একই বেগে যাত্রা শুরু করলে আপনি আরও আগের সময়ে চলে যাবেন। এভাবে যতবার ভ্রমণ করবেন ততই আগের সময়ে চলে যাবেন। এভাবে একদম সিলিন্ডারটি তৈরি করার সময়ে চলে যাওয়া সম্ভব। এমন একটি সিলিন্ডারকে অবশ্যই কোনো আদর্শ টাইম মেশিন বলা যায় না। কারণ একটি অসীম দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার কীভাবে বানাতে হয় তা আমরা কেউই জানি না। আর বানানো গেলেও এত বেগে কীভাবে ঘুরাতে হবে তাও আমাদের জানা নেই। এই টাইম মেশিনের আরও একটি সীমাবদ্ধতা

BanglaBook.org

আছে। সিলিন্ডারটি যে সময় তৈরি করা হয়েছিল কোনভাবেই তার আগের সময়ে চলে যাওয়া যাবে না। তবে এমন কোনো সমাধানের তাৎপর্য কিন্তু কোনো অংশই কম না। কারণ এভাবে আমরা তাত্ত্বিকভাবে অন্তত টাইম ট্র্যাভেলের উপায় খুঁজে পেয়েছি। তাত্ত্বিকভাবে কোনো কিছু সম্ভব হলে তা যে বাস্তবে করা যাবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। ফলে কোনো সময় হয়তো এমন টাইম মেশিন তৈরি করা যাবে যখন সেই মেশিনের জন্য কোনো অসীম দৈর্ঘ্যের কোনো সিলিন্ডারের প্রয়োজন হচ্ছে না।

গোডেলের মহাবিশ্ব

১৯৪৯ সালে বিখ্যাত গণিতবিদ ও যুক্তিবিদ কার্ট গোডেল আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি খুব অদ্ভুত সমাধান খুঁজে পান। তার সমাধান অনুসারে পুরো মহাবিশ্ব নিজেই ঘূর্ণায়মান। স্টোকামের সিলিন্ডারের মতো এই মহাবিশ্বের চারদিকে ভ্রমণ করেও টাইম ট্র্যাভেল করা যাবে। আমরা আগেই জেনেছি একটি রকেটে করে খুব দ্রুত গোডেলের মহাবিশ্বের চারদিকে ঘুরে আসি, তাহলে আমরা যে সময়ে যাত্রা করেছিলাম তার আগেই মূল অবস্থানে ফিরে আসতে পারব।

গোডেলের মহাবিশ্বের নীতি অনুসারে কেউ চাইলে স্থান ও সময় দুটোতেই ভ্রমণ করতে পারবে। এই মহাবিশ্বের যেকোনো ঘটনা, তা যত অতীতে বা ভবিষ্যতেই ঘটুক না কেন সেই সময়ে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু গোডেলের মহাবিশ্বের কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। যেমন মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এমন মহাবিশ্ব নিজেই নিজের উপরে চুপসে যেতে পারে। ফলে এই মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্টি হওয়া কেন্দ্রবিমুখী বলকে এই মহাকর্ষ বলের সাথে একটি সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের গতির পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার হতে হবে। আর মহাবিশ্বের আকার যত বেশি হবে, মহাকর্ষ বল বেশি হবার কারণে নিজের উপর চুপসে যাবার প্রবণতাও তত বেশি হবে। আবার ঘূর্ণন যত দ্রুত হবে, কেন্দ্রবিমুখী বলও তত বেশি হবে, আর তা একে চুপসে যাবার হাত থেকে রক্ষা করবে।

কোনো মহাবিশ্বের আকার যদি আমাদের মহাবিশ্বের সমান হয়, গোডেল হিসেব করে দেখেছেন এমন একটি মহাবিশ্বকে প্রতি ৭০ বিলিয়ন বছরে নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে হবে। আর এমন মহাবিশ্বে

BanglaBook.org

টাইম ট্র্যাভেল করার জন্য কাউকে কমপক্ষে ১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ভ্রমণ করতে হবে। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে; সময়ের অতীতে ফিরে যাবার জন্য ভ্রমণের বেগও হতে হবে অনেক বেশি; একদম আলোর বেগের কাছাকাছি।

গোডেলের মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য থেকে বিভিন্ন রকম প্যারাডক্সের সৃষ্টি হতে পারে। গোডেল নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এমন একটি মহাবিশ্বে চাইলে অতীতে চলে যাওয়া যাবে। আর অতীতে গিয়ে ইতিহাসও পরিবর্তন করে ফেলা যাবে। গোডল লিখেছেন, 'কেউ চাইলে পর্যাপ্ত বেগের একটি রকেট নিয়ে যাত্রা শুরু করলে যেকোনো স্থানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসা যাবে। আমাদের মহাবিশ্বে এটি সম্ভব না হলেও, অন্য একটি মহাবিশ্বের(যাকে ঘূর্ণায়মান হতে হবে) স্থানের যেকোনো দূরবর্তী অংশে এটি সম্ভব।'

এই ধরনের ঘটনাগুলো কিছু অদ্ভুত বিষয়কে তুলে ধরে। এভাবে অতীতে ভ্রমণ করা গেলে এমন সময়ে চলে যাওয়া যাবে যেখানে সে নিজেই জীবিত রয়েছে। ফলে সেই সময়ে তার নিজের সংখ্যা হবে দুজন। একজন সেই অতীত সময়ে ছিল, আরকেজন ভবিষ্যৎ থেকে টাইম ট্র্যাভেল করে যাওয়া তার ভবিষ্যৎ সত্তা। এখানে সমস্যা হলো আমাদের অতীতটাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই ভবিষ্যতের সত্তা যদি সেই আগের সত্তার সাথে গিয়ে দেখা করে তাহলে তা ইতিহাসের সাথে মিলবে না। এমনকি তার স্মৃতিতে তো আসলে এমন কোনো ভবিষ্যৎ সত্তার সাথে দেখা করার কোনো দৃশ্য নেই। ফলে ভবিষ্যৎ থেকে যাওয়া লোকের স্মৃতি নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে। সে নিজেই এভাবে তার অতীত সত্তার সাথে দেখা করছে, কিন্তু তার স্মৃতি তাকে এমন কিছু সমর্থন করছে না!

আইনস্টাইন তার বন্ধু ও প্রতিবেশীর এই অদ্ভুত সমাধান দেখে নিজে অনেক বিরক্ত হয়েছিলেন। তার নিজের মতো ছিল এমনভাবে অতীতে ভ্রমণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি পরে এ সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করে বলেছিলেন:

Kurt Gödel's essay constitutes, in my opinion, an important contribution to the general theory of relativity, especially to the analysis of the concept of time. The problem here involved disturbed me already at the time of the building up of the general

BanglaBook.org

theory of relativity, withoutmy having succeeded in clarifying it .

The distinction ÒearlierlaterÓ is abandoned for world-points which lie far apart in a cosmological sense, and those paradoxes, regarding the direction of the causal connection, arise, of which Mr. Gödel has spoken It will be interesting to weigh whether these are not to be excluded on physical grounds.

আইনস্টাইনের এই প্রতিক্রিয়া দুটি কারণে বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। প্রথমত, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব গঠন করার প্রথম দিকে টাইম ট্র্যাভেলের সম্ভাবনার বিষয়টি তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সময় ও স্থান যেহেতু এক অভিন্ন সত্তা আর এই স্থান-কালের ফেব্রিককে টানা, কুঁকড়ে ফেলা, এমনকি পেঁচিয়ে ফেলা পর্যন্ত সম্ভব। যদি এমন করা যায়, বিশেষ ধরনের বক্রতার কারণে টাইম ট্র্যাভেল করাও সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি গোডেলের সমাধানকে বাতিল করে দিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে, কারণ আমাদের মহাবিশ্ব ঘুরছে না, বরং এটি প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তার সমীকরণ নিয়ে আরও অনেক কাজ হয়। সেসব গবেষণা থেকে জানা যায়, তার সমীকরণ টাইম ট্র্যাভেল ও ওয়ার্মহোলের মতো অদ্ভুত জিনিসের অস্তিত্ব অনুমোদন করে।

কিন্তু এদের ব্যবহার করে কীভাবে টাইম ট্র্যাভেল করা যাবে সে বিষয় বিজ্ঞানীরা কোনো সুন্দর সমাধান দিতে পারেননি। কারণ হিসেবে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা এখনো সময়ের প্রকৃতিকে খুব ভালোমতো বুঝতে পারেননি। এজন্য আমাদের আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। গোডেলের সমাধান থেকে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি এগুলো দিয়ে খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের মহাবিশ্বটি ঘূর্ণায়মান না। আর একটি অসীম দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার কীভাবে তৈরি করতে হয় তাও আমরা জানি না।

BanglaBook.org

থর্ন টাইম মেশিন

টাইম ট্র্যাভেলের এসব উত্তেজনাকর আলোচনাগুলো ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এই সময়টাতে কণা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবাই নিউক্লিয় বলগুলোর রহস্যভেদ

নিয়েই পড়ে ছিলেন। মাঝে একসময় বিগ ব্যাং ও ইনফ্লেশন তত্ত্বের মতো মহাবিশ্ব সৃষ্টিবিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে সবার আগ্রহ ছিল। ফলে এই দীর্ঘ সময় টাইম ট্র্যাভেলের মতো অদ্ভুত একটি বিষয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায়নি। কিন্তু কার্ল সাগান তার 'কনটাক্ট' উপন্যাসের মাধ্যমে টাইম ট্র্যাভেলের বিষয়টি আবারও আলোচনায় নিয়ে আসেন। কনটাক্টের নায়িকা পৃথিবী থেকে অভিজিৎ নক্ষত্রে ভ্রমণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই যাত্রাটি ছিল দ্বিমুখী, প্রথমে সে অভিজিৎ নক্ষত্রে যায়, আর কাজ শেষ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। সাগান মূলত ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে যে ওয়ার্মহোল থাকে সেটি ব্যবহার করেই এই দ্বিমুখী ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ব্ল্যাকহোল টাইপ ওয়ার্মহোলের দ্বারা এমন দ্বিমুখী যাত্রা অনুমোদন করে না।

তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য পদার্থবিদ কিপ থর্নের সাথে যোগাযোগ করেন। থর্ন আইনস্টাইনের সমীকরণের এক নতুন সমাধান নিয়ে হাজির হন আর পদার্থবিজ্ঞানের দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন। তার সমাধান পূর্বের সমাধানগুলোর মতো জটিল সব সমস্যা ছাড়াই টাইম ট্র্যাভেলের উপায় বলে দিতে পারে। ১৯৮৮ সালে তিনি সহকর্মী মাইকেল মরিস ও উলভি উরটসিভারের সাথে মিলে দেখান যে যদি কোনোভাবে বহিঃস্থ ঋণাত্মক পদার্থ (Exotic negative matter) বা ঋণাত্মক শক্তির (Negative energy) মতো অদ্ভুত ভর-শক্তি তৈরি করা যায় তবে সত্যি একটি টাইম মেশিন বানানো সম্ভব হবে।

প্রথম দিকে পদার্থবিদসহ প্রায় সবাই এমন একটি অদ্ভুত সমাধানের কথা শুনে সন্দেহ করেছিল। কারণ এমন বহিঃস্থ ঋণাত্মক পদার্থ বা ঋণাত্মক শক্তি দেখা তো দূরের কথা অনেকে বিষয়টি বুঝতেই পারছিল না। কিন্তু আজকের দিনে আমরা জানি, টাইম মেশিন বানানোর বা টাইম ট্র্যাভেল বিষয়টি বোঝার জন্য এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানা একটি বড় পদক্ষেপ। এই ঋণাত্মক পদার্থ ও ঋণাত্মক শক্তির একটি সুবিধা হলো, এগুলো ব্যবহার করে আমরা একটি দ্বিমুখী ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পারব। ফলে ব্ল্যাকহোল টাইপ ওয়ার্মহোলের মতো কোনো একমুখী যাত্রা করতে হবে না। এই ওয়ার্মহোল দিয়ে সময় ভ্রমণ করলে আবার ফেরত আসা যাবে। আরও একটি আশাপ্রদ ব্যাপার হলো, থর্নের ও তার গ্রুপ হিসেব করে দেখতে পেলেন, এই ধরনের টাইম মেশিন ব্যবহার করে যাত্রা করলে

BanglaBook.org

যাত্রীর উপর ভ্রমণের প্রভাব এতটাই কম হবে যে তা জেট প্লেনে ভ্রমণ করার মতোই, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

একটি সমস্যা হলো, এই ঋণাত্মক পদার্থের বৈশিষ্ট্য একদম অদ্ভুত। একটু উদাহরণ দিলে এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা যদি প্রতিপদার্থের (Anti-matter) কথাও হিসেবে ধরি, তাহলেও ঋণাত্মক পদার্থকে এদের থেকে কম অদ্ভুত মনে হবে। প্রতিপদার্থ আর পদার্থ মিলিত হলে তারা একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু এছাড়া প্রতিপদার্থের আচরণ সাধারণ পদার্থের মতোই। কিন্তু এই ঋণাত্মক পদার্থের আচরণ খুবই অদ্ভুত। আমরা যদি কোনো ঋণাত্মক পদার্থকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি, তবে তা মাটিতে পতিত হবার বদলে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। কারণ পদার্থ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে নিচের দিকে পড়লেও, ঋণাত্মক পদার্থের ক্ষেত্রে এই বল বিকর্ষণ-ধর্মী (Antigravity) আচরণ করবে।

ঋণাত্মক পদার্থের বৈশিষ্ট্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে এত বড় মহাবিশ্বে এমন পদার্থ খুঁজে পাওয়া এত সহজ না। আর এমন পদার্থ যে আছে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। পৃথিবীতে এমন পদার্থ থেকে থাকলেও ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই এগুলো মহাশূন্যে চলে গেছে। এমনকি অন্য কোনো গ্রহেও এদের পাওয়া যাবে না। শুধু মহাশূন্যেই এদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব (যদি থেকে থাকে)।

এমনকি এমন পদার্থের পাশ দিয়ে কোনো মহাকাশযান নিয়ে গেলেও তা আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে, কারণ আমরা নিজেরাসহ আমাদের ব্যবহিত সবকিছুই সাধারণ পদার্থ দিয়ে গঠিত। ঋণাত্মক পদার্থের কোনো হদিস না পাওয়া গেলেও (না থাকার সম্ভাবনাই বেশি) ঋণাত্মক শক্তি বাস্তবে সম্ভব। তবে শুধু বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতেই এই শক্তি সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩ সালে হেনরি কাসিমির দেখান যে দুটি সমান্তরাল পাতকে খুব কাছাকাছি স্থাপন করা হলে এদের মধ্যকার শূন্যস্থানে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি হবে। সাধারণভাবে এই প্লেট দুটোর স্থির থাকার কথা, কেননা এগুলোকে বাহির থেকে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত করা হবে না। কিন্তু কাসিমির দেখালেন, ঋণাত্মক শক্তির ধারণা সঠিক হয়ে থাকলে এই দুটি প্লেটের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল সৃষ্টি হবে, ফলে এরা একে অপরের কাছে আসতে চাইবে। এই শক্তির পরিমাণ খুব সামান্য হলেও ১৯৪৮ সালে কাসিমিরের এই পরীক্ষা বাস্তবে করে দেখা সম্ভব হয়। আর দুটি প্লেটের মধ্যকার এই

BanglaBook.org

সামান্য শক্তি মেপেও দেখা যায়। কাসিমিরের পরীক্ষার সফলতার ফলে ঋণাত্মক শক্তি নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কাসিমিরের প্রভাব মূলত শূন্যস্থানের একটু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি নীতি থেকে এই বৈশিষ্ট্য গণনা করে দেখা যায়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে কোনো কণিকার অবস্থান ও ভরবেগ একই সাথে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এমনকি গাণিতিকভাবেও না। অর্থাৎ এই সীমাবদ্ধতা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাবে নয়, বরং এই নীতি হলো প্রকৃতির একটি মৌলিক নিয়ম। তাই ভরবেগ ও অবস্থান এক সাথে মাপতে গেলে কিছু অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে, কখনোই সঠিকভাবে মাপা যাবে না।

ভাবতে অবাক লাগবে এই অনিশ্চয়তা নীতি থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে শূন্যস্থান বলে আসলে কিছু নেই। কারণ শূন্যস্থান মানে কোনো একটি ক্ষেত্রের অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই শূন্য। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে তো দুটি মানকে এভাবে সঠিকভাবে বলা যাবে না। তাই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, শূন্যস্থান আসলে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়। তার বদলে গবেষণা করে জানা গেল- শূন্যস্থান মূলত অসংখ্য কাল্পনিক কণিকা (Virtual Particle) দিয়ে পরিপূর্ণ। এসব কণিকার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শূন্যস্থানের মধ্যে সেকেন্ডের খুব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে কণিকা ও প্রতিকণিকা সৃষ্টি হয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে তা কল্পনা করাই শক্ত। উদাহরণসরূপ এক সেকেন্ডের বিলিয়ন বিলিয়ন ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন সৃষ্টি হয়ে আবার নিজেদের ধ্বংস করে দেয়।

BanglaBook.org

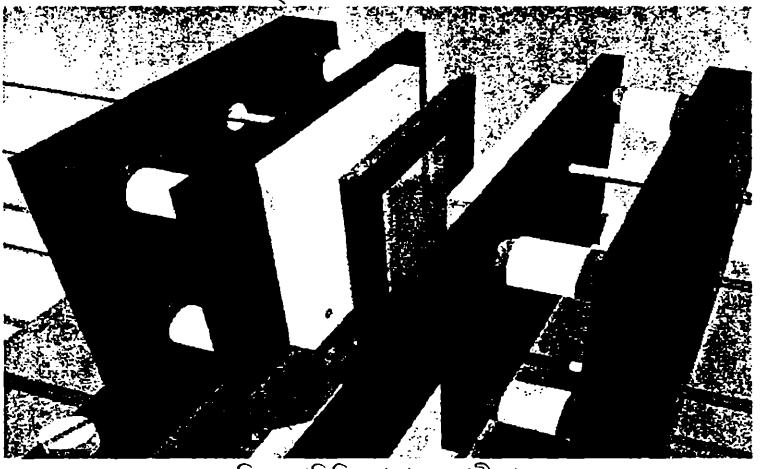

চিত্রঃ কাসিমির প্রভাবের পরীক্ষা

এই ঋণাত্মক শক্তি উৎপন্ন করার দুটি শর্ত আছে। প্লেটগুলোকে খুব কাছাকাছি রাখতে হবে আর স্থানটি পদার্থশূন্য হতে হবে। দুটি প্লেটের মধ্যকার জায়গা খুব কম হওয়ায় প্লেটের বাইরের দিকে যে কল্পিত কণিকাগুলো আছে তারা সহজেই ভেতরের দিকে আসতে পারে না। ফলে ভেতরে যাবার সময় তারা খুব সামান্য হলেও একটি বল প্রয়োগ করে। ফলে দেখে মনে হয় যেন দুটি প্লেট পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই প্লেট দুটির ভেতর দূরত্ব যত কমানো যাবে কল্পিত কণিকারা ভেতরে যাবার জন্য ততই বেশি শক্তি প্রয়োগ করবে। ফলে সৃষ্ট ঋণাত্মক শক্তির পরিমাণও বেশি হবে। ১৯৯৬ সালে লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির (Los Alamos National Laboratory) স্টিভেন লামোরেক্স এই প্রভাব আরও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখতে সক্ষম হন। এই পরীক্ষায় সৃষ্টি হওয়া শক্তির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। উৎপন্ন শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা হলে তা একটি পিঁপড়ার মতো সামান্য কোনো পতঙ্গের ওজনের ৩০০০০ ভাগের এক ভাগ হতো। এই পদ্ধতিতে আরও বেশি শক্তি উৎপন্ন করতে হলে প্লেটগুলোকে আরও কাছে আনার মতো প্রযুক্তি অর্জন করতে হবে।

এই আবিষ্কারের ফলে থর্নের প্রস্তাব করা টাইম মেশিন চালানোর জন্য একটি উপায় পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানবজাতি যখন আরও অনেক সূক্ষ্ম প্রযুক্তি অর্জন করতে পারবে তখন এমন প্লেটগুলোকে আরও অনেক কাছাকাছি এনে প্রচুর পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে। থর্ন টাইম মেশিন বানানোর জন্য দুটো প্লেটকে অত্যন্ত কাছাকাছি আনতে হবে। তবে এই প্লেটগুলোকে যেকোনো আকৃতির হলে চলবে না। প্লেটগুলো সমান্তরালেই থাকবে, কিন্তু এদের গোলকের আকার দিতে হবে। ফলে এদের দেখতে মনে হবে একটি গোলকের ভেতর আরেকটি গোলক। ভেতরের গোলক আর বাইরের গোলকের মধ্যে শূন্যস্থানের কারণে প্রচুর ঋণাত্মক শক্তির উদ্ভব ঘটবে। ফলে দুটি গোলকের মধ্যে একটি ওয়ার্মহোল তৈরি হয়ে গোলকদুটিকে সংযুক্ত করবে। প্রতিটি গোলকের ভেতর ওয়ার্মহোলে প্রবেশ করার একটি করে মুখ সৃষ্টি হবে।

সাধারণভাবে দুটি গোলকের ভেতরই একইভাবে সময় প্রবাহিত হতে থাকবে। এবার আমরা যদি কোনো একটি গোলকের সাথে একটি রকেট যুক্ত করে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে মহাকাশে ছুড়ে দিই, তবে

BanglaBook.org

মহাকাশে থাকা গোলকের সময় ধীর হয়ে যাবে। ফলে দুটি গোলকের ভেতর সময় একই হারে প্রবাহিত হবে না। এবার পৃথিবীতে থাকা গোলকের সাহায্যে ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিতীয় গোলকে চলে যাওয়া যাবে। এদের মধ্যে দূরত্ব যতই হোক না কেন দুই গোলকের মধ্যে ওয়ার্মহোল তখনো কার্যকর থাকবে। ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে এভাবে অতীতে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই টাইম মেশিন দিয়ে মেশিন বানানোর আগের সময়ে চলে যাওয়া সম্ভব না। তবে আজকে ২০১৬ সালে যদি আমরা একটি টাইম মেশিন তৈরি করি, তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই ফলাফল ভোগ করতে পারবে। ৩০০০ সালের ছেলেমেয়েরা তখন ইচ্ছে করলে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যেকোনো সময়ে ভ্রমণ করতে পারবে।

থর্নের টাইম মেশিন বাস্তবে সম্ভব। কিন্তু বেশ কিছু সমস্যা আছে বলে ব্যাবহারিকভাবে তৈরি করে আগের সময়ে চলে যাওয়াটা খুবই সূক্ষ্ম প্রযুক্তির ব্যাপার। কিছু কিছু বিষয় করতে গেলে এমন সমস্যায় পড়তে হবে যে এমনকি অনেক উন্নত প্রযুক্তি অর্জন সম্ভব হলেও এই টাইম মেশিন তৈরি করাটা সহজ হবে না।

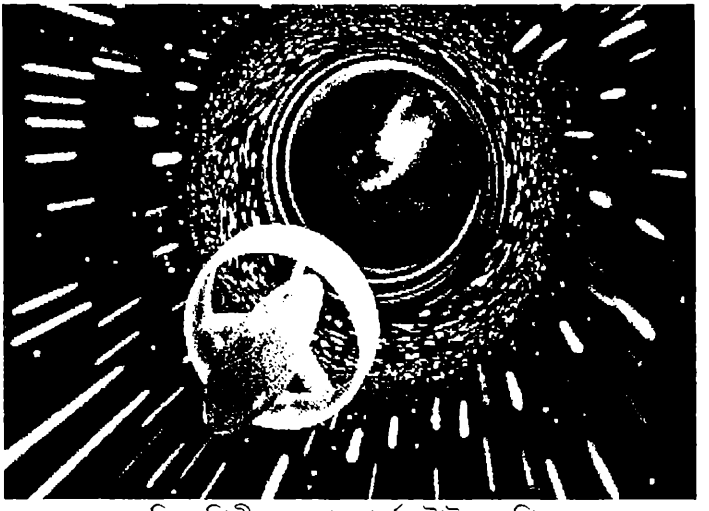

চিত্রঃ শিল্পীর কল্পনায় থর্নের টাইম মেশিন

থর্নের টাইম মেশিন বানানোর জন্য প্রথম সমস্যা হলো- প্রচুর ঋণাত্মক শক্তির প্রয়োজন। আর এত ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করাটা খুবই কঠিন কাজ। এই মেশিনে যে ওয়ার্মহোল তৈরি হবে তা নির্ভর করবে ঋণাত্মক শক্তির যোগানের ওপর। স্থান-কালের মধ্যে ওয়ার্মহোলের মুখ খোলার জন্য প্রচুর

ঋণাত্মক শক্তি প্রয়োজন। ঋণাত্মক শক্তির পরিমাণ যত বেশি হবে ওয়ার্মহোলও তত শক্তিশালী হবে।

কাসিমিরের প্রভাব ব্যবহার করে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এর পরিমাণ এত কম যে এভাবে ওয়ার্মহোল সৃষ্টি করলে তার আকার একটি পরমাণুর থেকেও ছোট হবে। ফলে এই ওয়ার্মহোল দিয়ে অতীতে ভ্রমণ তো দূরের কথা কোনো কাজেই লাগবে না। কাসিমিরের প্রভাব ছারাও অন্য উপায়ে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এগুলো তৈরি করা বা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জটিল বিষয়। উদাহরণসরূপ পল ডেভিস ও স্টিফেন ফুলিং তাদের এক গবেষণায় এই শক্তি সৃষ্টির একটি বিকল্প উপায় দেখিয়েছেন। এভাবে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি করতে হলে কোনো আয়নাকে খুব দ্রুত ঘোরাতে হবে। ফলে এই আয়না দ্রুতবেগে ঘুরতে শুরু করলে আয়নার সামনের দিকে ঋণাত্মক শক্তির সৃষ্টি হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, আয়নাকে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ঘুরাতে হবে। আর কাসিমির প্রভাবের মতো এক্ষেত্রেও উৎপন্ন ঋণাত্মক শক্তির পরিমাণ হবে খুব অল্প।

উচ্চ শক্তির লেজার ব্যবহার করেও ঋণাত্মক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। লজারের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর শক্তি-দশার ভেতর কিছু 'সংকুচিত দশা (Squeezed states)' আছে, যেখানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি সহাবস্থান করে। তবে এই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে খুবই জটিল প্রযুক্তির প্রয়োজন। কারণ এমনিতে ঋণাত্মক শক্তি ও ধনাত্মক শক্তির পালস (Pulse) আলাদা হিসেবে দেখা যায় না। এই পালস মাত্র ১০-১৫ সেকেন্ডের জন্য স্থায়ী হয়। তাই এত ক্ষুদ্র সময় নিয়ে কাজ করাটা সম্ভব হলেও অত্যন্ত জটিল।

উপরের আলোচিত ঋণাত্মক শক্তির সবগুলো উৎসই ছিল কৃত্রিম। কিন্তু প্রকৃতিতেও ঋণাত্মক শক্তির উৎস আছে। এর সবচে ভাল উদাহরণ হলো ব্ল্যাকহোল। একটি ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তের কাছে ঋণাত্মক শক্তির উপস্থিতি থাকে। স্টিফেন হকিং ও জ্যাকোব বেকেনস্টাইন দেখিয়েছেন ব্ল্যাকহোল আসলে সম্পূর্ণরূপে কালো না। কারণ তারা তাদের গণনায় দেখিয়েছেন, ব্ল্যাকহোল ধীরে ধীরে শক্তি ক্ষয় করতে থাকে। এটি সম্ভব হয় কারণ, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে কোনো বিকিরণ মাঝে মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ার

BanglaBook.org

ব্ল্যাকহোলের অস্বাভাবিক মহাকর্ষ টান অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারে। অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী কোয়ান্টাম জগতে যেকোনো ঘটনা ঘটার খুব কম হলেও একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। আর এই খুব কম সম্ভবতাকে কাজে লাগিয়েই এই বিকিরণগুলো ঘটনাদিগন্ত অতিক্রম করতে পারে। এভাবে বিকিরণ করার কারণে সময়ের সাথে ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্ত ছোট হতে থাকে।

ব্ল্যাকহোলের ভেতর কোনো সাধারণ বস্তু যেমন একটি নক্ষত্র পতিত হলে এর ঘটনাদিগন্ত আকারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোনো ঋণাত্মক পদার্থ ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তে নিক্ষিপ্ত হলে এর আকার সংকুচিত হবে। ব্ল্যাকহোল যেহেতু ঘটনাদিগন্তের কাছে শক্তি বিকিরণ করে আকারে সংকুচিত হয়, তাই এখানে ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি হয়।

অনেকের ধারণা ব্ল্যাকহোলের ভেতর যে ওয়ার্মহোল সৃষ্টি হয় তার মুখ ঘটনাদিগন্তেই আছে। যেহেতু ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টির উৎস এই ঘটনাদিগন্ত, তাই ওয়ার্মহোলের মুখটিও এই ঘটনাদিগন্তেই হবে। তাদের ধারণা এই ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করতে পারলে ওয়ার্মহোল নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু এই ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করাটা অনেক কঠিন কাজ। পাশাপাশি মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার। এই ঋণাত্মক শক্তি সৃষ্টি হলে তা ঘটনাদিগন্তের একদম কাছাকাছি হবে, ফলে কয়েক সেন্টিমিটারের ব্যবধানের কারণে ব্ল্যাকহোলের গ্রাসে পরিণত হবার বড় একটি সম্ভাবনা থেকে যায়।

হকিং তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, সব প্রকার ওয়ার্মহোলের সমাধান স্থায়ী হবার জন্যই ঋণাত্মক শক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন। কারণটাও খুবই সাধারণ। ধনাত্মক শক্তি দ্বারা একটি ওয়ার্মহোল সৃষ্টি হলে তার ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা যাবে না। কারণ এমন কোনো ওয়ার্মহোল দিয়ে যাবার সময় তা পদার্থের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে ওয়ার্মহোলটিকে ধ্বংস করে দেবে। শুধুমাত্র যদি ঋণাত্মক শক্তি উপস্থিত থাকে তবেই এমন অবস্থায় ওয়ার্মহোলটি টিকে থাকবে। আরেকটি বিষয় হলো, ঋণাত্মক শক্তির প্রভাবে বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বলের সৃষ্টি হয়। ফলে ঋণাত্মক শক্তির উপস্থিতিতে ওয়ার্মহোলটি টিকে থাকার পাশাপাশি এর স্থায়িত্বও বেড়ে যাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তির জোগান থাকলে একটি স্থায়ী ওয়ার্মহোলকে ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের অন্য মুখ দিয়ে যাত্রা সম্পন্ন করা যাবে।

BanglaBook.org

কোনোভাবে যদি প্রচুর পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তির উৎপন্ন করা যায় বা কোনো প্রাকৃতিক উৎস থেকে তৈরি হওয়া ঋণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করে ব্যবহার করা যায় তবে একটি টাইম মেশিন তৈরি করে টাইম ট্র্যাভেল করা কোনো সমস্যা না। একদল পদার্থবিজ্ঞানী তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রচুর শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ঋণাত্মক শক্তিক্ষেত্র তৈরি হওয়াটা একদম স্বাভাবিক। ফলে থর্নের টাইম মেশিনের যে বর্ণনা আমরা উপরে দেখেছিলাম, সেভাবে কোনো টাইম মেশিন তৈরি করতে না পারলেও যদি শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে পারি তবে সে সময় এই ঋণাত্মক শক্তি ব্যবহার করে ওয়ার্মহোল দিয়ে ভ্রমণ করা যাবে।

ওয়ার্মহোল দিয়ে টাইম মেশিন বানানোর ক্ষেত্রে আরও একটি বড়সড় বাধা আছে। ধরুন আমরা কোনোভাবে প্রচুর পরিমাণ ঋণাত্মক শক্তি অর্জন করতে পেরেছি, আর তা ওয়ার্মহোল তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত। কিন্তু ওয়ার্মহোল তৈরি হলেই যে তাকে ব্যবহার করতে পারব তা কিন্তু না। একটি ওয়ার্মহোলকে আমরা কীভাবে খুঁজে পাব? এটি কি দেখতে পাওয়া যায়? উত্তর সম্ভবত না। তাহলে কীভাবে আমরা একটি ওয়ার্মহোল খুঁজে পাব? থর্ন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার মতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে ওয়ার্মহোল একাই তৈরি হবে, আর এটি স্থান-কালের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও বলেছেন স্থান-কালের ফেনার (Space-time foam) ভেতর ওয়ার্মহোল এমনিতেই বিদ্যমান থাকে। স্থান-কালের ফেনার কথা বলতে গেলে প্রায় ২০০০ বছর পুরনো একটি প্রশ্ন চলে আসে; সব থেকে ক্ষুদ্র দূরত্ব বলতে কী কিছু আছে? আর থেকে থাকলে সেটা কতটুকু? ২০০০ বছর আগে এই প্রশ্নটিকেই একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক জেনো। তার প্রশ্ন ছিল 'কারও ভ্রমণ করার মতো সব থেকে ক্ষুদ্র দূরত্ব কোনটি?'

এই প্রশ্ন উত্থাপন করার পাশাপাশি জেনো মজার একটি গাণিতিক ধাঁধার তৈরি করেছিলেন। তিনি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন যে একটি নদীকে অতিক্রম করা সম্ভব না। তিনি প্রথমে দেখান, একটি নদীর দুই পারের মধ্যকার দূরত্বকে অসীম সংখ্যক ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা যায়। পরে তিনি যুক্তি দেখান, অসীম সংখ্যক বিন্দু অতিক্রম করার জন্য অসীম সময়ের দরকার, তাই একটি নদীর দুই পারের দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে যেহেতু অসীম

BanglaBook.org

সংখ্যক বিন্দু অতিক্রম করতে হবে, তাই একটি নদী পার হওয়া সম্ভব না। এই একই প্রমাণের সাহায্যে এটাও প্রমাণ করা যায় যে, কোনো কিছুই আসলে অতিক্রম করা সম্ভব না; যা একদম হাস্যকর সিদ্ধান্ত। ক্যালকুলাস ছাড়া যেহেতু এমন সমস্যার সমাধান করা যায় না, তাই এই ধাঁধা সমাধান করার জন্য আমাদের প্রায় দুই হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তাহলে সব থেকে ক্ষুদ্র দূরত্ব বলতে কি আসলেই কিছু আছে? নাকি দুটি স্থানের মধ্যকার দূরত্বকে অসীম সংখ্যক ক্ষুদ্র বিন্দুতে ভাগ করা যায়? পদার্থবিজ্ঞান আমাদের এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন হুইলার আইনস্টাইনের সমীকরণ বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব খুঁজে পেয়েছেন। হুইলার দেখিয়েছেন একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দূরত্বের ক্ষেত্রে স্থান-কালের বক্রতা মারাত্মক রকম বেড়ে যায়। এর থেকে ক্ষুদ্র দূরত্বে স্থান-কালের বক্রতা অসীম হয়ে যাবে। এই সর্বনিম্ন দূরত্বকে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য ($১০^{-৩৩}$ সে.মি.) বলা হয়।

প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়- "প্ল্যাঙ্ক সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য"(আর এই "প্ল্যাঙ্ক সময়" হলো সবথেকে ক্ষুদ্র সময়)। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যে স্থান-কালের বক্রতা সর্বোচ্চ, বক্রতা এর থেকে বেশি হলে তা একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবে। ফলে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের থেকে ক্ষুদ্র কোনো দূরত্ব সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।

প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই স্তরে স্থান-কালকের গঠন মসৃণ নয় (কারণ স্থান-কালের বক্রতা সর্বোচ্চ)। এই স্তরে স্থান-কালকে কোঁকড়ান, অস্থির, ফেনাময় বলা যেতে পারে। এই অস্থিতিশীল স্থান-কালের মধ্যে প্রতিনিয়ত শূন্য থেকে এমন ফেনা তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। এমনকি একদম শূন্যস্থানের সর্বনিম্ন দূরত্বের মধ্যেও এই ফেনা তৈরি হয়ে চলেছে। ফুটন্ত পানির দিকে তাকালে আমরা এমন এক অশান্ত রূপ দেখতে পাব। স্থান-কালের ক্ষুদ্র স্কেলে চলে গেলেও ফুটন্ত পানির মতো এমন অস্থিরতা দেখা যাবে। আর এমন প্রতিটি ফেনা মূলত একেকটি ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল আর শিশু মহাবিশ্ব (Baby Universe) !

সাধারণভাবে, কল্পিত কণিকারা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মতো বিপরীত কণিকা দিয়ে তৈরি হয়ে আবার খুব কম সময়ের মধ্যে শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক দূরত্বের ক্ষেত্রে এই কণিকারা একেকটি ওয়ার্মহোল ও

BanglaBook.org

শিশু মহাবিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার জন্যই এদের অস্তিত্বে আসার সম্ভাবনাও আছে। অবাক করা তথ্য হলো- আমাদের মহাবিশ্ব নিজেও সম্ভবত স্থান-কালের ফেনার মধ্যে ভাসমান এমন কোনো একটি ফেনা থেকেই শুরু করে হঠাৎ স্ফীত হতে শুরু করে, আর পরে একটি বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে আজকের অবস্থায় পৌঁছায়। কিন্তু আধুনিক স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী এই ফেনা কোনো মহাবিশ্বের স্থান-কালের ফেনা থেকে সৃষ্টি হয়নি বরং তা একদম শূন্যতা (স্থান ও সময় ছাড়া শূন্যতা বা Absolute nothingness) থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

থর্নের মতো ছিল, ওয়ার্মহোল যেহেতু প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যায়, ফলে অনেক উন্নত সভ্যতা অর্জন করার পর আমরা স্থান-কালের ফেনা থেকে ওয়ার্মহোলকে আলাদা করতে শিখব। আর এমন একটি আলাদা করা ওয়ার্মহোলকে ঋণাত্মক শক্তি দ্বারা প্রসারিত করে ও নিয়ন্ত্রণ করে এর ভেতর দিয়ে যাত্রা করতে পারব।

সবকিছু বিবেচনা করলে থর্নের টাইম মেশিন তৈরি করাটা অসম্ভব কিছু না। তবে কারিগরি দিক বিবেচনা করলে এটি অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা এতটা উন্নত প্রযুক্তি অর্জন করা সম্ভবত আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও সম্ভব হবে না। আর এরপরেও কোনো খুঁতখুঁতে লোকের মনে হয়তো একটি প্রশ্ন থেকেই যাবে যে,টাইম ট্র্যাভেল আসলে পদার্থবিজ্ঞানের কোনো মূলনীতি লঙ্ঘন করছে কিনা!!

মিসনার স্পেস ও টাইম ট্র্যাভেল

টাইম ট্র্যাভেল আসলেই সম্ভব কিনা তা নিয়ে পদার্থবিদদের মধ্যকার বিতর্ক অনেক পুরনো। ১৯৯২ সালে হকিং এই বিতর্কের অবসান করতে চাইলেন। তার ইচ্ছা ছিল তিনি এমন কিছু প্রমাণ দেখাবেন যাতে এই বিতর্ক চিরদিনের জন্য থেমে যায়, আর কেউ যেন টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে সময় নষ্ট না করে। টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের তিনি সম্ভবত খুব বেশি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের বিদ্রূপ করে এটাও বললেন যে, টাইম মেশিন তৈরি করা সম্ভব হলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ভবিষ্যৎ থেকে আসা মানুষদের সাথে আমাদের সময় বেশ ভালোই কাটত।

BanglaBook.org

হকিং-এর ইচ্ছা ছিল টাইম ট্র্যাভেল সংক্রান্ত এমন কিছু বৈজ্ঞানিক প্রতিবন্ধকতা আবিষ্কার করা যার ফলে এই ধারণাটিকেই সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানতেন হকিং-এর এই চেষ্টা সফল হবে না। কারণ পদার্থবিজ্ঞানের এমন কোনো জানা বিধি নেই যার ভিত্তিতে সময় ভ্রমণের ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া যায়। তার বিপরীতে তাদের জানা ছিল, কোয়ান্টাম জগতে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাই শূন্য না। ফলে যদি যথেষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা করা যায় তবে কোয়ান্টাম প্রভাব ও কোয়ান্টাম বিচ্যুতির ফলে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু টাইম ট্র্যাভেল সংক্রান্ত কোনো বিষয়কেই হকিং ইতিবাচক হিসেবে দেখেননি। ফলে এই সংক্রান্ত সকল ধারণাকে বাতিল করার জন্য তিনি 'chronology protection conjecture' প্রস্তাব করেন।

টাইম ট্রাভেল নিয়ে কাজ করার জন্য বিজ্ঞানীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওয়ার্মহোলের সমাধানকেই বেছে নেন। কিন্তু ওয়ার্মহোলের সমাধান নিয়ে কাজ করাটা অনেক জটিল বলে হকিং মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস মিসনারের উদ্ভাবন করা মহাবিশ্বের একটি সরল প্রতিরূপ দিয়ে তার যুক্তি ও বিশ্লেষণ শুরু করেন। প্রস্তাবকের নামানুসারে মহাবিশ্বের এই সরল প্রতিরূপকে 'মিসনার স্পেস' বলা হয়। এই সরল প্রতিরূপেই টাইম ট্র্যাভেলের সকল উপাদান উপস্থিত ছিল। ফলে হকিং মিসনার স্পেসকেই বেছে নিলেন।

মিসনার স্পেসকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক আপনার শোবার ঘরটিই সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব। এই ঘরের বাম ও ডান পাশের দেয়ালের প্রতিটি বিন্দুই দেখতে হুবহু একই রকম। এমন দেয়ালের ক্ষেত্রে একটি মজার ঘটনা ঘটে। আপনি যদি এই ঘরের বাম দিকের দেয়াল দিয়ে হেঁটে বের হয়ে যেতে চান তবে আপনার নাক ভাঙার পরিবর্তে ডান দিকের দেয়াল দিয়ে আবার এই ঘরেই প্রবেশ করবেন। অর্থাৎ সিলিন্ডারের দুই পাশের দেয়াল যেমন জোড়া লাগানো তেমনি এই ঘরের দেয়ালগুলোও একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগানো।

BanglaBook.org

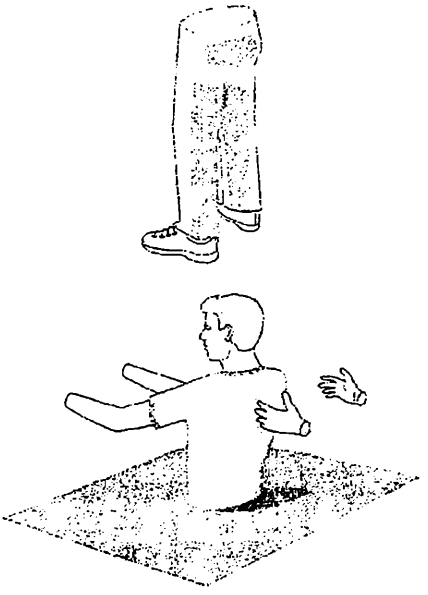

চিত্রঃ মিসনার স্পেস

এমন দেয়ালের একটি ভাল উদাহরণ হলো 2D ভিডিও গেম। আমারা যখন মোবাইলে 'স্ন্যাক গেম' খেলি তখন সাপকে এক দিকের স্কিন দিয়ে বের করে দিলে তা আবার উল্টো পাশের স্ক্রিন দিয়ে বের হয়ে যায়। মিসনার স্পেসকেও এমন একটি সাপ খেলার স্ক্রিন হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তবে এই স্কিন 2D এর পরিবর্তে 3D। অর্থাৎ এই খেলায় সাপকে শুধু দেয়াল দিয়ে বের করলেই উল্টো দিক দিয়ে বের হবে না, পাশাপাশি ছাদ দিয়ে বের করে দিলেও ফ্লোর দিয়ে বের হয়ে যাবে। ঘরের ছয় দিকের বিপরীত দেয়াল সবগুলোই সমবিন্দুর দ্বারা গঠিত। ফলে এই ঘর থেকে বের হয়ে যাবার কোনো উপায় নেই, যেদিক দিয়েই বের হবেন না কেন বিপরীত দিকে দিয়ে আবার ঘরেই প্রবেশ করতে হবে। আর আমাদের মহাবিশ্বও ঠিক এমনই, একটি বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্র। সে অর্থে মিসনার স্পেসকে সত্যিকার অর্থেই মহাবিশ্বের একটি সরল প্রতিরূপ বলা যেতে পারে।

এমন স্থানের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো- এই ঘরের দেয়ালগুলো স্বচ্ছ (transparent)। আর কোনো একটি দেয়াল দিয়ে বাইরে তাকালে আপনার এই ঘরের একটি কার্বন কপি (Carbon copy) দেখতে পাবেন। আর সেই ঘরের ভেতরও আপনার নিজেও একটি কার্বন কপিকে দেখতে পাবেন।

BanglaBook.org

কিন্তু আপনি কখনই তার সামনের দিকটি দেখতে পাবেন না। আপনি যখনই মুখ ঘুরিয়ে ফেলবেন তখন আপনার কপিও তার মুখ ঘুরিয়ে ফেলবে। ফলে সব সময় আপনি তার পশ্চাৎ দিকটিই দেখতে পাবেন।
এমনকি উপরে বা নিচে তাকালেও একই ঘটনা ঘটবে। ফলে আপনার নিজের হুবহু প্রতিরূপের সাথে যোগাযোগ করাটা একদমই সম্ভব হবে না। আপনি কোনো দিকে সরে যাওয়ামাত্রই সেও আপনার বরাবরই সরে যাবে।
আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। আমরা যদি কোনো শক্তিশালী টেলিস্কোপের (আসলে বাস্তবে এত শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করা সম্ভব না) সাহায্যে সামনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা আমাদের মাথার পেছনের অংশ দেখব। এমন হবে কারণ আমাদের মহাবিশ্বও মূলত এক ধরনের উচ্চমাত্রিক গোলক (Hyper sphere)। ফলে সামনের দিকে তাকালে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব ঘুরে আবার আমাদের চোখে এসে পৌঁছুবে।
এখন ধরে নিন মিসনার স্পেসে থাকা অবস্থায় আপনার চারপাশের দেয়ালের কোনো একটি সংকুচিত হয়ে আসছে। এবার একটি মজার ঘটনা ঘটবে। আপনার ঘরের ডান পাশের দেয়াল যদি আপনার দিকে ঘণ্টায় দুই কিলোমিটার বেগে আপনার দিকে আসতে থাকে আর আপনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য যদি বাম দিকের দেয়াল দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান তাহলেই শুরু হবে এক অদ্ভুত ঘটনা। কেননা, আপনি বাম দিকের দেয়াল দিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার ডান দিকের দেয়াল দিয়ে এই ঘরেই প্রবেশ করবেন। ফলে আপনার গতির সাথে এখন অতিরিক্ত ২ কিলোমিটার অতিরিক্ত গতি যোগ হবে। ফলে আপনার গতি হয়ে যাবে ৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এখন আপনি যতবার দেয়াল ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করতে থাকবেন ততবারই আপনার গতির সাথে ২ কিলোমিটার অতিরিক্ত গতি যোগ হতে থাকবে। ফলে এই গতি ৬, ৮, ১০ এভাবে বাড়তে বাড়তে আলোর বেগের কাছাকাছি চলে যাবে।
ফলে একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তি বিন্দু অতিক্রম করার পর আপনার গতি এত বৃদ্ধি পাবে যে আপনি অতীতে চলে যেতে থাকবেন। এমনকি আপনি ইচ্ছে করলে সেই মহাবিশ্বের স্থান-কালের যেকোনো বিন্দুতে চলে যেতে পারবেন। এমনকি আপনার জন্মেরও পূর্বে!

BanglaBook.org

হকিং মিসনার স্পেসের সব বৈশিষ্ট্য খুব সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করেন। তার বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, গাণিতিকভাবে ভাবলে এই ঘরের বিপরীত দিকের দেয়ালগুলো মূলত ওয়ার্মহোলের মুখ। এরপর তিনি গতানুগতিক পদার্থবিদ্যা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুটোর সাহায্যেই প্রমাণ করে দেখান যে এই মিসনার স্পেস মূলত অস্থায়ী। একটি আলোকরশ্মি যখন এই মিসনার স্পেসে প্রবেশ করবে তখন তা ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকবে। ফলে আলোর ব্লু শিফট (Blue shift) দেখা দেবে। এর ফলে একসময় এই শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে অসীমের দিকে যেতে থাকবে; যা এক কথায় অসম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় এভাবে আলোর শক্তি এতটাই বৃদ্ধি করবে যে ঘরটি এই প্রবল মহাকর্ষের প্রভাবে নিজের ভেতর চুপসে যাবে ফলে ওয়ার্মহোলটিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর দ্বারা হকিং বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেউ যখন মিসনার স্পেসের ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে চেষ্টা করবে তখন ওয়ার্মহোলটি আর টিকে থাকবে না। তার গণনায় দেখা যায় এক্ষেত্রে এনার্জি মোমেন্টাম টেনসরের (energy momentum tensor) মান হয়ে পড়বে অসীম। কোনো স্থানের ভর ও শক্তির পরিমাণ কত হবে তা এই এনার্জি মোমেন্টাম টেনসরের সাহায্যে জানা যায়। আর এর মান অসীম হওয়াটা সম্ভব না। অর্থাৎ হকিং বলতে চেয়েছেন এমন কোনো ওয়ার্মহোল দিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব না।

যেহেতু এমন কোনো ওয়ার্মহোল দিয়ে ভ্রমণ করতে গেলে কোয়ান্টাম বিকিরণের প্রভাব (quantum radiation effects) অসীম পর্যন্ত চলে যাবে, তাই এই বিষয়টিকে হকিং টাইম ট্র্যাভেলের জন্য চরম আঘাত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। হকিং-এর এই সমাধান প্রকাশ পাবার পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক আলোচনা চলে। কেউ পক্ষে, তো কেউ বিপক্ষে। কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে হকিং এর সমাধানের বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। তারা ওয়ার্মহোলের আকার ও অন্যান্য প্যারামিটার পরিবর্তন করে এমনকি হকিং-এর সমাধান থেকেই স্থায়ী ওয়ার্মহোলের জন্য একটি মডেল তৈরি করে ফেলেন। তারা ওয়ার্মহোল সমাধানের এনার্জি মোমেন্টাম টেনসরের বিষয়টি

BanglaBook.org

পরীক্ষা করে দেখেন যে কিছু ক্ষেত্রে ওয়ার্মহোল অস্থায়ী হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা স্থায়ী হবে। রাশিয়ান পদার্থবিদ সার্জেই ক্রাসনিকভ বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্মহোল পরীক্ষা করে দেখেন। তার পরীক্ষায় দেখা যায়, এমন কোনো একটি প্রমাণও নেই যা থেকে বলা যায় যে টাইম মেশিন তৈরি করা সম্ভব না বা এটি অস্থায়ী হবে।

ক্রাসনিকভের এই গবেষণা পদার্থবিদদের মধ্যে টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে নতুন করে কাজ করার উদ্দীপনা ফিরিয়ে এনেছিল। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের Li-Xin Li তো অ্যান্টি-ক্রোনলজি প্রোটেকশন কঞ্জেকচার (Anti-chronology protection conjecture) প্রস্তাব করে বসেন। হকিং যেমন ক্রোনলজি প্রোটেকশন কঞ্জেকচারের মাধ্যমে টাইম ট্র্যাভেলকে একদম বাতিল করে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি লি-জিন লি তার অ্যান্টি-ক্রোনলজি প্রোটেকশন কঞ্জেকচারের মাধ্যমে দেখালেন যে 'পদার্থবিজ্ঞানের এমন কোনো নিয়মের অস্তিত্ব নেই যা টাইম ট্র্যাভেলের ধারনাকে বাতিল করে দেয়।'

১৯৯৮ সালে হকিং তার প্রস্তাবনা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন। তিনি লিখেন, 'এনার্জি মোমেন্টাম টেনসর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতীত ভ্রমণের ক্রিয়াকে বাতিল করতে পারে না, আর ক্রোনলজি প্রোটেকশনও করতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, তার মানে এই নয় যে টাইম ট্র্যাভেল একদম নিশ্চিতভাবে সম্ভব, এর অর্থ হলো- এই সম্পর্কে আমরা এখনো সবকিছু ভালভাবে জানি না। হকিং এর-প্রস্তাবনার এই দুর্দিনে ম্যাথিও ভিসার তার ক্রোনলজি প্রোটেকশনকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। ম্যাথিউ-এর মতে ক্রোনলজি প্রোটেকশনের ব্যর্থতার অর্থ এমন কিছু না যে তার জন্য টাইম ট্র্যাভেলের সমর্থকরা সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। এর দ্বারা শুধু এটুকুই বোঝা যায় যে টাইম ট্র্যাভেলের বিষয়টি ভালোমতো জানার জন্য আমাদের আরও অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে।

মহাকর্ষের জন্য একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। আমরা আগেই জেনেছি টাইম ট্র্যাভেল

BanglaBook.org

সম্পর্কে হকিং-এর মতো এখন অনেক বদলেছে। তার মতে এটি অসম্ভব নয়, তবে এটা বাস্তবে করাটা হয়তো সম্ভব না।

গট টাইম মেশিন

১৯৯১ সালে রিচার্ড গট আইনস্টাইনের সমীকরণের অন্য আরেকটি সমাধান প্রস্তাব করেন, যা টাইম ট্র্যাভেলকে অনুমোদন করে। গটের এই সমাধানটি সত্যি একদম ব্যতিক্রমী ছিল, কারণ এই সমাধানে তিনি কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তু, সিলিন্ডার, ওয়ার্ম হোল, ব্ল্যাকহোল বা ঋণাত্মক শক্তির উল্লেখ করেন নি।

গট ১৯৪৭ সালে লুইসভিল, ক্যানটাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের থেকে তার কাজ ও কথা বলার ধরন অনেকটাই আলাদা। তিনি খুব কম বয়স থেকেই বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। সেই সময় থেকেই তিনি একটি শখের জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময় তিনি ওয়াশিংটন হাউজ সায়েন্স ট্যালেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতেও তিনি এই প্রতিযোগিতার সাথে যুক্ত থেকেছেন; এই কার্যক্রমের বিচারকদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর থেকে বহুদিন এসবের সাথে যুক্ত ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেবার পর তিনি প্রিন্সটনে যোগ দিন, আর এখনো সেখানেই কর্মরত আছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার সময় থেকেই গট কসমিক স্ট্রিং (Cosmic string) সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কসমিক স্ট্রিং মূলত স্ট্রিং তত্ত্বের একটি সমাধান। তবে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির বিভিন্ন মডেলও কসমিক স্ট্রিং থাকার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে মহাজাগতিক স্ফীতি (Cosmic inflation) হবার ঠিক পরেই যখন বিগ ব্যাং শুরু হয়, তার ঠিক পরেই এই স্ট্রিংগুলো তৈরি হয়েছিল। সেই উত্তপ্ত মহাবিশ্বে সবেমাত্র বিভিন্ন প্রতিসাম্যতা ভাঙতে শুরু করেছে।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটেছিল যে প্রতিসাম্যতা ভাঙনের প্রক্রিয়াটা সবদিকে সমানভাবে সংযুক্ত ছিল না। ফলে এসব মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সৃষ্টি হতে পেরেছিল। এই বস্তুগুলোর আকার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বেশ অদ্ভুত। এগুলো এতটাই পাতলা যে তা একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের

BanglaBook.org

চেয়েও সুরু। কিন্তু এদের ভর কিন্তু তেমন হেলাফেলা করার মতো না। এদের কিছুর ভর এতটাই বেশি যে তা একটি নক্ষত্রের সমান হতে পারে! এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি কসমিক স্ট্রিং-এর ওজন আমাদের পৃথিবীর থেকেও অনেক বেশি হবে। আর এগুলোর আকারও হয় বেশ দৈত্যাকার। কিছু কিছু কসমিক স্ট্রিং কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত থাকতে পারে।

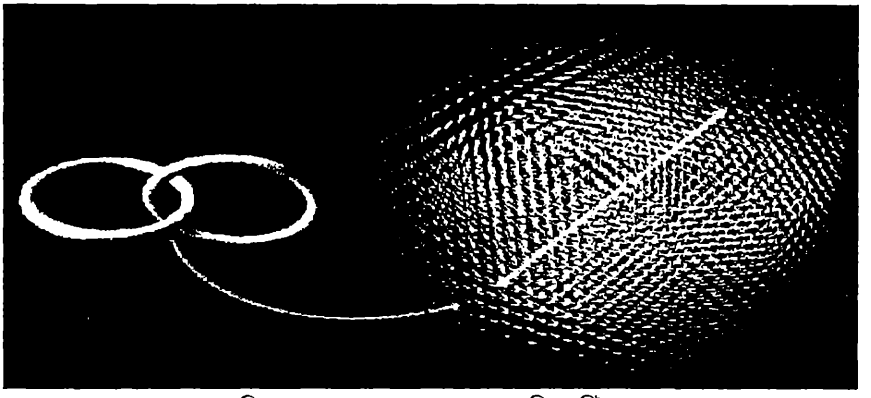

চিত্রঃ স্থান-কালের ভেতর কসমিক স্ট্রিং

গট প্রথমে আইনস্টাইনের সমীকরণের বিশ্লেষণ করে কসমিক স্ট্রিং-এর একটি সমাধান বের করেন। প্রথমে তিনি কৌতূহলবশতই এগুলো নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি কসমিক স্ট্রিং নিয়ে কিছু গণনা করার সময় বেশ অবাক করা একটি বিষয় লক্ষ করলেন। আমরা যদি দুটি কসমিক স্ট্রিং নিয়ে একটিকে অন্যটির দিকে নিয়ে যেতে থাকি, তবে এরা সংঘর্ষ করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমরা এদের একটি টাইম মেশিন হিসেবে ব্যবহার করতে পারব।

প্রথম বিষয় হলো আমরা যখন এমন দুটি সংঘর্ষরত কসমিক স্ট্রিং-এর চারদিকে একবার ঘুরে আসব তখন এর চারপাশের স্থান সংকুচিত হয়ে যাবে। এমন সংকুচিত স্থানের চারদিকে ঘুরে এলে একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করা যায়। আমরা যদি কোনো একটি বস্তু যেমন একটি দণ্ডের চারদিকে ঘুরে আসি তাহলে আমরা সব সময়ই ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসব। কিন্তু এই সংঘর্ষরত স্ট্রিংগুলোর চারপাশে একটি রকেটে চড়ে ঘুরে এলে আমরা দেখতে পাব, আমরা আসলে ৩৬০ ডিগ্রির কম ঘুরে এসেছি। একটি কোনের(Cone) ক্ষেত্রেও ঠিক এই বিষয়টিই ঘটে। সে যাই হোক, মূল বিষয় হলো আমরা যদি এই স্ট্রিংগুলোর চারপাশে খুব দ্রুতবেগে ঘুরে আসি

BanglaBook.org

তাহলে দূর থেকে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে আমরা আলোর বেগের থেকেও বেশি বেগে ঘুরে এসেছি। এই স্ট্রিংগুলোর চারপাশের স্থান (Space) যেহেতু সংকুচিত হয়ে গিয়েছে, তাই এমনটা ঘটা সম্ভব হবে। এখন মজার বিষয় হলো, যদিও কেউ আমাদের দেখলে ভাববে আমরা আলোর বেগে থেকেও বেশি বেগে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু তাও এটি বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করবে না। কারণ আমাদের নিজেদের রকেটের কাছে তো বেগ আর আলোর বেগের থেকে বেশি না। শুধুমাত্র স্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় আমরা এই সুবিধাটা পাচ্ছি।

ধরুন আপনার বাসা থেকে আপনার অফিসের দূরত্ব ২ কিলোমিটার। এখন কেউ যদি রাস্তাটিকে সংকুচিত করে আধা কিলোমিটার করে দেয় তাহলে আপনার বেগ কম থাকলেও আপনি খুব কম সময়ে এই রাস্তাকে অতিক্রম করতে পারবেন। আপেক্ষিক তত্ত্বে স্পেস বলতে আসলে মহাশূন্যকে বোঝানো হয়। মহাশূন্য নিজেই যদি সংকুচিত হয়ে যায় তবে রকেটের বেগ আলোর বেগের কম থাকলেও আলোর বেগকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।

এখন মজার বিষয় হলো আমরা যদি এভাবে কসমিক স্ট্রিংগুলোর চারপাশে ঘুরে স্থানের বক্রতাকে কাজে লাগিয়ে আলোর বেগের বেশি বেগে ভ্রমণ করতে পারি তবে আমরা কিন্তু অতীতে চলে যেতে থাকব। গট উল্লেখ করেছিলেন, When I found this solution, I was quite excited. The solution used only positivedensity matter, moving at speeds slower than the speed of light. By contrast, wormhole solutions require more exotic negative-energydensity material (stuff that weighs less than nothing).

কিন্তু এ ধরনের কসমিক স্ট্রিং ব্যবহার করে একটি টাইম মেশিন তৈরি করতে হলে প্রচুর পরিমাণ শক্তির জোগান থাকা প্রয়োজন। অতীতে ভ্রমণ করার জন্য আমাদের এমন কসমিক স্ট্রিং খুঁজে বের করতে হবে, যার প্রতি সেন্টিমিটারের ওজন ১০ মিলিয়ন বিলিয়ন টন এবং একে অপরের বিপরীত দিকে কমপক্ষে আলোর বেগের ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯৬% বেগে ঘুরতে হবে। এগুলো শুনে খুব বেশি হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ আমরা

BanglaBook.org

প্রকৃতিতে এই বেগের বেশ কিছু জিনিস দেখতে পাই। বিভিন্ন মহাজাগতিক উৎস থেকে উচ্চ শক্তির প্রোটন এই বেগে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে।

সমালোচকরা অবশ্য কসমিক স্ট্রিং ব্যবহার করে টাইম মেশিন তৈরির ব্যাপারে তেমন আশাবাদী নন। কারণ, কসমিক স্ট্রিং খুবই বিরল একটি জিনিস। মহাবিশ্বের এই বিশাল পরিসরে এমন জিনিস খুঁজে পাওয়া অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া যেকোনো স্ট্রিং হলেই তো আর হবে না। টাইম মেশিন বানানোর জন্য আমাদের সংঘর্ষরত কসমিক স্ট্রিং প্রয়োজন। যা খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন।

কিন্তু গট নিজেই এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তার মতে- আমরা যখন প্রযুক্তির দিক থেকে আরও অনেক অগ্রসর হতে পারব তখন আমরা মহাকাশ থেকে একটি কসমিক স্ট্রিং খুঁজে বের করতে পারব। দৈত্যাকার মহাকাশযান ও বিশাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একে আমরা একটি আয়তক্ষেত্রের রূপ দেব। কিন্তু এই আয়তাকার স্ট্রিংটি একটু বাঁকানো থাকবে। এখন এই আয়তক্ষেত্রাকৃতির কসমিক স্ট্রিংগুলো তাদের নিজের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে চুপসে যেতে থাকবে। স্ট্রিংটি একটু বাঁকা থাকার কারণে লম্বা দিকের স্ট্রিং দুটো (আয়তাকার লম্বা দিক অর্থে বোঝানো হয়েছে) নিজেদের বিপরীত দিকে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ঘুরতে শুরু করবে। ফলে এই স্ট্রিং-এর এই ঘূর্ণায়মান আয়তাকার লুপ দিয়ে টাইম মেশিন তৈরি করা যাবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এমন একটি টাইম মেশিন তৈরি করে এক বছর অতীতে ভ্রমণ করতে চাইলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কেননা এই ক্ষমতার টাইম মেশিন তৈরির জন্য আমাদের এমন দৈত্যাকার স্ট্রিং প্রয়োজন যার ভর অন্তত একটি গ্যালাক্সির অর্ধেক!!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টাইম ট্র্যাভেল প্যারাডক্স

ধরুন টাইম মেশিনে চড়ে কোনো এক ব্যক্তি, ১০০০ বছর ভবিষ্যৎ থেকে আমাদের সময়ে চলে এল। সাথে করে আপনার জন্য এক ব্যাগ লইট্ট্যা শুটকি নিয়ে এল। আপনি তো খুব খুশি। ভবিষ্যতের লইট্টা শুঁটকি, তাও আবার ফ্রিতে। কিন্তু আপনার ছেলে সবকিছু শুনে, এক মধুর আবদার করে বসল। তার ইচ্ছা এই লইট্ট্যা মাছটার কার্বন ডেট টেস্ট করা হোক। কার্বন ডেট টেস্টে তাহলে কি ফলাফল দেখা যাবে?

কোনো 'মৃত দেহ' বা কোনো 'নমুনা' কতদিন আগে মারা গিয়েছে সেটি আমরা কার্বন ডেট টেস্ট করার মাধ্যমে জানতে পারি। একটি প্রাণী মৃত হবার সাথে সাথেই সেই প্রাণীর দেহের কার্বন-১৪ এর পরিমাণ কমে যেতে থাকে। তাই কোনো নমুনায় কতগুলো কার্বন-১৪ আছে সেটি দেখেই মৃতদেহ কত দিন আগে মারা গিয়েছিল তা বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি ভবিষ্যৎ থেকে আগত কোনো নমুনার ডেট টেস্ট করা হয় তাহলে কি দেখা যাবে? যে পরিমাণ কার্বন-১৪ থাকার কথা তার থেকে বেশি? কিন্তু তাতো অসম্ভব। আবার ধরুন আপনার হাতে কোনো নমুনা আছে, এখন সেটা অতীত থেকেই আসুক আর ভবিষ্যৎ থেকেই আসুক, সেটাকে ছাড়া কার্বন ডেট টেস্ট করা সম্ভব। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিষয়টি একদম স্ববিরোধী।

টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক। তবে একটি মজার বিষয় হলো, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে বিভিন্ন প্যারাডক্স তৈরি হবার কারণেই বেশির ভাগ বিজ্ঞানী টাইম ট্র্যাভেলের ধারণাকে বাতিল করে দিতে চান। এই প্যারাডক্সগুলো সত্যি মাথা খারাপ করে দেবার মতো। প্যারাডক্স হলো এমন একটি বাক্য,

BanglaBook.org

দৃশ্য বা ঘটনা যা নিজেই নিজের সাথে সংগতিপূর্ণ না। কিন্তু এমন অসংগতিপূর্ণ বিষয় আবার সঠিকও হতে পারে। তাই নিজের সাথে বিরোধী সত্য নিয়ে বাধে ঝামেলা।

প্যারাডক্সিক্যাল একটি ব্যাকের উদাহরণ হলো উইলিয়াম শেক্সপিয়র বিখ্যাত নাটক হ্যামলেটের একটি ডায়ালগ 'I must be cruel to be kind.' প্রথমে দেখে মনে হতে পারে এটি আবার কেমন কথা? সদয় হবার জন্য কীভাবে নিষ্ঠুর হতে হয়! কিন্তু একটু ভালমতো ভাবলেই বোঝা যায় বাক্যটি আসলে ঠিকই আছে। বাক্যের মতো বিভিন্ন বিষয়েই এমন প্যারাডক্স হতে পারে। অতীত ভ্রমণসম্পর্কিত প্যারাডক্সগুলো আবার সব রকম প্যারাডক্সকে ছাড়িয়ে যায়। লইট্যা মাছের কার্বন টেস্ট করতে গিয়েই বোঝা যাচ্ছে, এসব প্যারাডক্স দ্বারা আসলেই কি বোঝায় বা আসলেই কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করাটাও বেশ কঠিন।

অতীত ভ্রমণের ক্ষেত্রে কেন এসব প্যারাডক্স উপস্থিত হয় তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসবে। প্রথমে ভবিষ্যৎ ভ্রমণের বিষয়টি লক্ষ্য করুণ। একজন মহাকাশচারীর কথাই ভাবা যাক, সে একটি রকেট নিয়ে আলোর বেগের খুব কাছাকাছি ভ্রমণ করবে। এখন লক্ষ করুন, যখন সে রকেটে করে মহাকাশে পাড়ি দিল, তখন সে বর্তমান সময় থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অর্থাৎ সে এখন বর্তমানে অনুপস্থিত। এবার সে যখন ভবিষ্যতে ভ্রমণ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন সেই পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সে পৃথিবীতে ফেরার পরও কোনো প্যারাডক্স জন্ম দেয় না। শুধু রকেটে থাকার সময় তার গতি ধীর হয়ে গেছে বলে তার কাছে মনে হয়েছে কয়েক মিনিট গেছে, কিন্তু আমরা পৃথিবীতে ছিলাম বলে আমরা আমাদের স্বাভাবিক সময়ে চলতে থাকব। ফলে সে এসে শুধু দেখবে যে- ম্যাজিকের মতো পৃথিবীতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে এখানে কোনো প্যারাডক্সের সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু অতীতের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। আপনি যখন টাইম মেশিনে করে অতীতে ভ্রমণ করবেন, তখন আপনি বর্তমানে অনুপস্থিত হয়ে গেলেন। আর আপনি যখন সময় ভ্রমণ করে ১০ বছর আগে চলে যাবেন- সেই সময়ে ইতিমধ্যেই একজন আপনি বর্তমান আছে। ফলে আপনি টাইম মেশিন থেকে নামার পর পৃথিবীতে আপনার সংখ্যা হয়ে গেল দুজন; যা

BanglaBook.org

ঘটে যাওয়া অতীতকে পরিবর্তন করে ফেলল। আর বাস্তব জগতে নিয়ম অনুযায়ী অতীত পরিবর্তন করে ফেলাটা স্বীকৃত নয়। ঠিক এ কারণেই অতীতে ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্যারাডক্সের উৎপত্তি হয়। কিন্তু আমাদের হাতে যদি মহাকর্ষের জন্য একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থাকত তবে এমন প্যারাডক্স সমাধান করাটা কোনো বড় সমস্যা হতো না। আমাদের হাতে এখন মহাকর্ষের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির তত্ত্ব না থাকায় কাজটি অনেক কঠিন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আপনি যদি অতীতে চলে গিয়ে আপনার পিতা-মাতাকে মেরে ফেলেন, তাহলে আপনার জন্ম নেওয়াটাই অসম্ভব হয়ে যাবে। ফলে মনে হবে যেন আপনার পিতামাতাকে মেরে ফেলার জন্য আপনি কখনোই অতীতে ফিরে যেতে পারবেন না; এটা একদম প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই আপাতবিরোধী যুক্তিগুলো বিজ্ঞানের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিজ্ঞান সব সময়ই যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে। তাই কোনো বিষয়ের বিপক্ষে একটি সঠিক যুক্তিও বিষয়টিকে বাতিল করে দিতে পারে। এসব কথা রেখে চলুন কিছু প্যারাডক্সের কথা শোনা যাক। অতীতে ভ্রমণ করা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে কয়েক রকম টাইম প্যারাডক্সের উদ্ভব হয়। এদের আবার সুন্দর সুন্দর নামও আছে।

গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স (Grandfather paradox)

টাইম ট্র্যাভেল সম্পর্কে প্রচলিত প্যারাডক্সগুলোর মধ্যে সব থেকে পরিচিত হলো এই গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক নাথানিল স্যাকনার তার ছোট গল্প 'Ancestral Voices' –এ এবং রেনে বারজাভেল তার ১৯৪৯ সালে লেখা 'Le Voyageur Imprudent'-এ প্রথম এই প্যারাডক্সের কথা উল্লেখ করেন। প্যারাডক্সটি হলো- যদি কেউ অতীতে ফিরে গিয়ে তার নিজের দাদা ও দাদি বিয়ে হবার আগেই তার দাদাকে মেরে ফেলে, তাহলে তার নিজের জন্ম নেওয়া সম্ভব না। আর যদি সে নিজে জন্মই না নেয়, তবে তার দাদাকে মারার জন্য সে ভবিষ্যৎ থেকে এল কী করে?

নাম গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স হলেও এই প্যারাডক্সের মূল কথা এটাই যে- কেউ যদি অতীতে ফিরে গিয়ে এমন কিছু করে, যাতে তার নিজের জন্ম

BanglaBook.org

নেওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে সে অতীতে ফিরে এল কী করে? কেউ তার দাদাকে মেরে ফেলার পরিবর্তে যদি অন্য এমন কিছুও করে যার ফলে তার অতীতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়, তবে তাকেও গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্সের কাতারে ফেলা যাবে। যেমন কেউ যদি একটি টাইম মেশিন ব্যবহার করে অতীতে গিয়ে এই টাইম মেশিন প্রস্তুত করার আগেই এর প্রস্তুতকারক বিজ্ঞানীকে খুন করে ফেলে, তবে সে অতীতে আসার জন্য টাইম মেশিনটি পাওয়া সম্ভব না। কেননা বিজ্ঞানীকে মেরে ফেললে তো টাইম মেশিনটিই তৈরি হবে না, সে ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করে অতীতে ভ্রমণ করাটা একদম অসম্ভব।

গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্সের একটি সামান্য আলাদা রূপ হলো হিটলার প্যারাডক্স। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতেও এটি দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্রে কাহিনীর নায়ক একটি টাইম মেশিন নিয়ে হিটলার যখন দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ করার জন্য অন্য দেশগুলোকে উদ্বুদ্ধ করছিল তার আগেই হিটলারকে মেরে ফেলে। অতীত পরিবর্তনের এই প্রভাব গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্সের মতো ঠিক সরাসরি বোঝা যাবে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যাবে, হিটলার যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাই বাধাত তাহলে তাকে মারার জন্য কেউ একজন কেন অতীতে চলে যাবে?

বুটস্ট্র্যাপ প্যারাডক্স (Bootstrap paradox)

বুটস্ট্র্যাপ প্যারাডক্স অনেক ক্ষেত্রে অন্টোলজিক্যাল প্যারাডক্স (ontological paradox) বা ইনফরমেশন প্যারাডক্স (Information paradox) নামেও পরিচিত। প্রকৃতিতে সাধারণত কার্যকারণের একটা সম্পর্ক আছে। কোনো কিছু ঘটতে হলে তার জন্য অবশ্যই কোনো একটা কারণ থাকতে হবে। বিজ্ঞানের নিয়মও তাই। কোনো একটি ভৌত ঘটনা ঘটার জন্য অবশ্যই কোনো কিছুর প্রভাব প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটাই কার্যকারণের সম্পর্ক।

কিন্তু কেউ যদি ভবিষ্যৎ থেকে কোনো টাইম মেশিন নিয়ে বর্তমানে হাজির হয়, তবে তার জন্য কোনো কারণ থাকবে না। সাধারণত কোনো ঘটনা ঘটার জন্য প্রথমে একটি কারণ থাকে এবং সেই কারণের ফলে ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণের আগেই ঘটনাটি ঘটছে। ফলে ঘটনার কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

আসলে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে তথ্য প্রবাহিত হচ্ছে। তারপরও এই ঘটনার কারণ খোঁজার একটি চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন আমরা বলতে পারি, কেউ একজন বর্তমানে টাইম মেশিন তৈরি করার চেষ্টা করছে বলেই ভবিষ্যৎ থেকে কেউ একজন টাইম মেশিন নিয়ে বর্তমানে চলে আসতে পারছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে বর্তমানের ঘটনার জন্য ভবিষ্যতের কারণ দেখানো হচ্ছে, আর ভবিষ্যতের ঘটনার জন্য অতীতের কারণ দেখানো হচ্ছে। ফলে কার্যকারণের একটি লুপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কার্যকারণের এই গোলাকার চক্রে এসে, কারণের আদি কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ভবিষ্যৎ থেকে কোনো তথ্য অতীতে প্রবাহিত হলে মূলত তার কোনো উৎস থাকে না। তাই অতীতে ভ্রমণ করা হলে সব সময়ই কারণ ছাড়া একটি ঘটনা ঘটে; বাস্তবে যা হয় না।

ধরুন কোনো বিজ্ঞানী একটি টাইম মেশিন তৈরি করল। তারপর সে ভাবল অতীতে চলে গিয়ে সে তার নিজের তরুণ বয়সের মানুষটিকে টাইম মেশিন তৈরি করার গোপন তথ্য বলে দেবে। এখন সত্যি যদি এমন করা যায় তাহলে ঐ টাইম মেশিন তৈরির গোপন তথ্যের কোনো উৎসই থাকবে না।

বিলকার প্যারাডক্স (Bilker's paradox)

যখন কেউ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জেনে গিয়ে তার ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করতে চায়, তখন এমন প্যারাডক্সের উদ্ভব ঘটে। ধরুন আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জানার জন্য একটি টাইম মেশিন তৈরি করলেন। এবার ৫ বছর ভবিষ্যতে গিয়ে দেখতে পেলেন রিয়া নামে একটি মেয়ের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে, আর সে আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। তখন আপনি আবার অতীতে ফিরে এসে দিয়া নামের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। এভাবে ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারলে ভবিষ্যতেরই আর কোনো অর্থ থাকে না। আপনি যদি জানতেই পারেন আপনার ভবিষ্যৎ কী, তাহলে তা পরিবর্তন করা অসম্ভব; কেননা যা ঘটবে সেটাই তো ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে আবার অতীতে ফিরে আসা সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ নিজেই অসম্ভব হয়ে যাবে!

BanglaBook.org

প্রিডেস্টিনেশন প্যারাডক্স (Predestination paradox)

প্রিডেস্টিনেশন প্যারাডক্স, কসাল লুপ (Causal loop) বা কসালটি লুপ (Causality loop) নামেও পরিচিত। একে অনেকটা বদ্ধ গোলকীয় সময়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কার্যকারণের সম্পর্কের ফলে এই প্যারাডক্সের উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে প্রথম একটি ঘটনার ফলে দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা ঘটে, আবার সেই দ্বিতীয় ঘটনার কারণে প্রথম ঘটনাটি পুনরায় ঘটে এবং এভাবে চলতেই থাকে। যদি সময়ের সাথে ঘটনাপ্রবাহগুলোকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে এমন প্যারাডক্স সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অতীতে ভ্রমণকারীদের বিকল্প কিছু করার থাকে না। তারা তাদের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা নিজেই ইচ্ছায়ই একই ঘটনা বারবার ঘটাতে থাকে।

ছোট একটি উদাহরণের সাহায্যে এই প্যারাডক্সের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন লোকের প্রেমিকার একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এখন লোকটি একটি টাইম মেশিন ব্যবহার করে অতীতে ফিরে গিয়ে তার প্রেমিকাকে বাঁচাতে চায়। অতীতে ফিরে যাবার পর সে ঐ ঘটনাটি ঘটার পূর্বেই দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তার প্রেমিকাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু এই প্যারাডক্স অনুসারে সে চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হবে না। হয়তো সে খুব তাড়াতাড়ি ঐ ঘটনাস্থলে যাবার চেষ্টা করবে, আর ঐ নির্ধারিত সময়েই তার প্রেমিকাকে নিজের অজান্তেই গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে।

পরে এই কাজটি সফলভাবে করার জন্য সে আবারও অতীতে ভ্রমণ করে তার প্রেমিকাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যতবারই চেষ্টা করুক না কেন, প্রতিবারই কোনো না কোনো কারণে তার প্রেমিকার মৃত্যু হবেই। ফলে সে বারবার তাকে বাঁচানোর জন্য অতীতে ভ্রমণ করবে; প্রতিবার ব্যর্থ হবার পর আবার অতীত ভ্রমণ শুরু করবে। ফলে সে একটি টাইম লুপের মধ্যে আটকে যাবে। এক্ষেত্রে, সময় ভ্রমণকারী ইচ্ছে করলেও এই লুপ থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না।

এই ধারণা অনুসারে সবকিছু আগে থেকেই নির্ধারণ করা। ফলে অতীতে ভ্রমণ করলে তাকে এই লুপের মধ্যে আটকে যেতে হবে। সময়ের সাথে

BanglaBook.org

ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন করা সম্ভব না, তাই তাকে এই সময়ের ঘূর্ণিপাকে পাক খেতে হবে। এই প্যারাডক্সের ফলে আরও একটি প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয়, তা হলো ঐ সময় ভ্রমণকারী যদি বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তবে তার মৃত্যু হবে কী করে? কেননা সে তো বারবারই অতীত ভ্রমণ করতে বাধ্য থাকবে। এই প্যারাডক্স অনুসারে কেউ একবার অতীতে ভ্রমণ করে ঘটনাপ্রবাহ পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে বারবার একই কাজ করে যেতে হবে। এমনকি তার মৃত্যুও হবে না; সময়ের ঘূর্ণিতে আটকে থাকতে হবে।

এই প্যারাডক্সটি গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্সের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাব করা। এই প্যারাডক্স অনুসারে কেউ অতীত ভ্রমণ করে তার দাদা-দাদি বা বাবা-মাকে মেরে ফেলতে পারবে না। এই ধারণা অনুসারে অতীতে চলে গিয়ে ইতিহাসকে পরিবর্তন করা সম্ভব না, ইতিহাস অপরিবর্তনীয়। ফলে এমনও হতে পারে যে সে অতীতে ফিরে যাবার পর তার দাদাকে মেরে ফেলার ইচ্ছাও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

সেক্সচুয়াল প্যারাডক্স (Sexual paradox)

এই ধরনের প্যারাডক্সে আপনি নিজেই নিজের পিতা হতে পারেন; যা এক কথায় অসম্ভব। ব্রিটিশ দার্শনিক জনাথন হ্যারিসন এই সম্পর্কিত একটি গল্প লিখেছিলেন। ঐ গল্পের মূল চরিত্র নিজেই নিজের পিতা কিন্তু সে নিজেকে খুনও করেছিল। রবার্ট হাইনলাইন তার ক্লাসিক গল্প All You Zombies,– এ গল্পের নায়ক একই সাথে নিজেই নিজের বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে। দেখা যাচ্ছে তার পুরো পরিবার সে নিজেই। এই ধরনের প্যারাডক্সের উদ্ভব হতে হলে শুধু একটি টাইম মেশিন থাকলেই হবে না, পাশাপাশি DNA প্রযুক্তিতেও অনেক উন্নত হতে হবে।

এই প্যারাডক্সগুলো কিন্তু ইচ্ছেমতো তৈরি করা যায় না। কেউ ইচ্ছেমতো একটা জটিল গল্প ফেঁদে দিলেই তা প্যারাডক্স হিসেবে গণ্য হবে না। সবকিছুকে অবশ্যই আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। হলিউডের সিনেমার গল্পলেখকরা সাধারণত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে অমান্য করে তাদের গল্পের কাহিনী লিখে থাকেন। তবে পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু যেকোনো প্যারাডক্সকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকেন।

BanglaBook.org

যদি কোনো গল্প থেকে একটি প্যারাডক্সিক্যাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তবে অবশ্যই তাকে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই হতে হবে; এছাড়া তাকে প্যারাডক্স বলে ভাবা হবে না।

উদাহরণসরূপ বলা যায়, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের নদীকে মহাকর্ষ বা অন্য কোনো উপায়ে প্রভাবিত করা যায়। এই নদীর স্রোতকে বাঁকিয়ে ফেলা যায়, এমনকি নদীর পানিতে যেমন ঘূর্ণি তৈরি হয় তেমন করাও সম্ভব। কিন্তু এই নদীর প্রবাহকে একদম থামিয়ে দেওয়া যায় না। ফলে কোনো একটি গল্পে কেউ চাইলে অতীতে গিয়ে তার বাবাকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু সেই হঠাৎ করে নাই হয়ে যেতে পারবে না। কারণ এমন হওয়ার অর্থ হলো সময়ের স্রোতকে থামিয়ে দেওয়া। ফলে কেউ যদি তার জন্মের আগেই তার পিতাকে মেরে ফেলে, তবুও সে দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে যাবে না। কারণ তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে অমান্য করে।

প্যারাডক্সের সমাধান

ভবিষ্যতে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্যারাডক্সের উদ্ভব না হলেও অতীতে ভ্রমণ করতে গেলেই বিভিন্ন রকম প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয়। তাই দেখে মনে হয় যেন অতীত ভ্রমণ সম্ভব না। অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞানের জানা কোনো তত্ত্বই সময় ভ্রমণের ধারণাকে বাতিল করে দেয় না। তাহলে প্রশ্ন হবে, এসব প্যারাডক্সের উৎপত্তি হয় কেন? অতীতে ভ্রমণসংক্রান্ত প্যারাডক্স সমাধান করার জন্য অনেকগুলো তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে।

নোভিকভ স্ব-দৃঢ় নীতি (Novikov self-consistency principle)

নোভিকভ স্ব-দৃঢ় নীতি অনুসারে, কেউ যদি অতীতে ভ্রমণ করে তবে সে এমন কিছু করতে পারবে না যা অতীতে ঘটেনি। ঘটনাপ্রবাহের সাথে কার্যকারণের একটি সম্পর্ক আছে, তাই সে এমন কিছুই করতে পারবে না যার ফলে ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যায়। এই নীতি অনুসারে কী কী ঘটবে সব আগে থেকেই ঠিক করা। ফলে কেউ যদি অতীতে ভ্রমণ করে তার পূর্বপুরুষকে কোনো বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলতে চায়, তবে গুলি করার সময় হয়তো তার বন্দুকটাই ঠিকমতো কাজ করবে না। অথবা এমনও হতে পারে যে, অতীত

BanglaBook.org

সময়ে চলে যাবার পর তার নিজেরও মতই পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে সে ঐ ব্যক্তির পূর্বপুরুষকে খুন করার ইচ্ছা থাকবে না। এমন ঘটলে গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স ও বুটস্ট্র্যাপ প্যারাডক্স দুটোরই সমাধান হয়ে যায়।

বহু-বিশ্ব অনুকল্প (Multiple universes hypothesis)

এই তত্ত্ব অনুসারে অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকটির সময়ের প্রবাহ ও ইতিহাস আলাদা আলাদা। এদের একত্রে বলা হয় বহু-বিশ্ব বা Multiverse। কেউ যদি অতীতে ভ্রমণ করে, তবে সে তার নিজের মহাবিশ্ব তৈরি করে ফেলবে। ঐ মহাবিশ্ব সে যদি তার পূর্ব পুরুষকে মেরে ফেলে তবে কোনো প্যারাডক্স তৈরি হবে না। কারণ সে যে মহাবিশ্বে গিয়ে তার পূর্বপুরুষকে খুন করেছে, এই মহাবিশ্বে এই লোক মূলত তার পূর্বপুরুষই না। ফলে তার নিজের মূল মহাবিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। আর নতুন মহাবিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ আলাদাভাবে চলতে থাকবে।

শাখা মহাবিশ্ব অনুকল্প (Branching universe hypothesis)

এই তত্ত্বের সাথে বহু-বিশ্ব তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে। এই তত্ত্ব মতে কেউ যদি অতীতে ভ্রমণ করে তবে তার সময় দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। ফিল্ম সিরিজ "Back to the Future" মূলত এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়। এখানে দেখানো হয়- কিছু লোক অতীতে ভ্রমণ করে সেই সময়ের লোকদের তাদের ভবিষ্যৎ থেকে করে আসা পরিকল্পনার দ্বারা প্ররোচিত করে। ফলে ঘটনাপ্রবাহ বদলে যায়। এই লোকগুলো যে ভবিষ্যৎ থেকে আসা পরিকল্পনা অনুসারে সবকিছু করছে, সেটা অতীতের লোকজন কিছুই বুঝতে পারে না। ফলে তারা সময় ভ্রমণকারীদের প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করে ইতিহাস বদলে দেয়। আর এই নতুন সময়ের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস বাতিল অনুকল্প (Erased timeline hypothesis)

এই তত্ত্ব মতে, কেউ অতীতে ভ্রমণ করতে পারবে। এমনকি অতীত পরিবর্তনও করতে পারবে। কিন্তু যে সময় থেকে এসেছিল সেই সময়ে আর

BanglaBook.org

ফিরে যেতে পারবে না। অতীতে ভ্রমণ করার সাথে সাথেই তার আগের সময়টি ইতিহাস থেকে মুছে গিয়ে নতুন সময় পরিক্রমা শুরু হবে। তবে সে ইচ্ছে করলে এই সময় থেকে আবারও অতীতে ভ্রমণ করতে পারব। এভাবে সে তার আরও আগের সত্তার সাথে দেখা করতে পারবে। কিন্তু কখনোই আর আগের সময়ে ফিরে যাওয়া যাবে না। ধরা যাক ৩৫ বছর বয়সের একজন লোক তার ২৫ বছরের সময়ে ফিরে গেল। এবার তার পক্ষে আর পূর্বের সময়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু ২৫ বছর থেকে অতীত ভ্রমণ করে আবার ২০ বছরের সময়ে যেতে পারবে।

এখন আবার তার পক্ষে ২৫ বছরেও ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, অতীত ভ্রমণকে অনেকটা একমুখী রাস্তার মতো বিবেচনা করা হয়।

সামারভিলের টাইমলাইন তত্ত্ব (Summerville's timeline theory)

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু একটিমাত্র মহাবিশ্বেরই অস্তিত্ব আছে। কেউ যখন অতীতে চলে যাবে তখন ঐ অতীত স্থান-কালের পারমাণবিক কণিকাদের একটি পুনর্বিন্যাস হবে, কিন্তু কোনো কণিকারই একটি অনুলিপি তৈরি হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি তার একটি কম বয়সী সত্তার কাছে চলে যেতে চায়; ধরা যাক আপনার বয়স এখন ২৫ বছর, আপনি আপনার ১৫ বছরের সত্তার সাথে দেখা করতে চান তবে আপনার দুটি কপি (Copy) আপনি দেখতে পাবেন না। এক্ষেত্রে ধরা হয় যে আপনার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু একটি নতুন সজ্জা ধারণ করে আপনার কম বয়সী একটি রূপ তৈরি করবে। এক্ষেত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ সত্তার সাথে প্রকৃতির কার্যকারণের সম্পর্কটিও আলাদা হবে। ফলে আপনি অতীতে গিয়ে কী করছেন তা কোনো প্যারাডক্স সৃষ্টি করবে না। এই তত্ত্বগুলো ছাড়াও আরও অনেক তত্ত্বের মাধ্যমে অতীত ভ্রমণ সম্পর্কিত প্যারাডক্সের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তার মধ্যে বিশেষ পরিচিত অনুকল্পগুলোর নাম দেওয়া হলো।

ইতিহাস দূষণ অনুকল্প (timeline corruption hypothesis)
সময়গত রূপান্তর অনুকল্প (Temporal merging hypothesis)
ইতিহাস নির্বাচন অনুকল্প (Choice timeline hypothesis)
Can-not because has-not because will-not theory

BanglaBook.org

আত্মসংশোধন অনুকল্প (Self-healing hypothesis)

বিনাশ প্রস্তাব (Destruction resolution)

সময়গত পরিবর্তন বাতিল তত্ত্ব (Temporal modification negation theory)

- নির্ধারিত ইতিহাস তত্ত্ব (Doomed timeline theory)

পরীক্ষাগত সমাধান

উপরের উল্লেখ করা প্রতিটি সমাধানই মূলত অনুকল্প (Hypothesis) পর্যায়ে রয়েছে। এগুলোকে কোনো তত্ত্বগত সমাধান বলা যায় না। উপরন্তু সেগুলোকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখাটাও অনেক কঠিন কাজ। তবে সম্প্রতি ২০১৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর, সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান একটি খবরে টাইম ট্র্যাভেল প্যারাডক্সের এক ধরনের সফল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এই পরীক্ষাটি মূলত ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ (Closed timelike curve) নিয়ে করা হয়েছে। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা জেনেছি যে, ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভের ধারণা সঠিক হয়ে থাকলে অতীতে ভ্রমণ অবশ্যই সম্ভব হবে। আর কোনো পরীক্ষা যদি এই ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করতে পারে তবে অতীত ভ্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হবার পাশাপাশি সমাধানটি কীভাবে আসবে তাও জানা যাবে। অর্থাৎ, অতীতে ভ্রমণ করলে আসলেই কী হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

অতিক্ষুদ্র কণিকাদের ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব জগতের কোনো নিয়ম খাটে না। সেক্ষেত্রে তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আজব নিয়মগুলো মেনে চলে। কোয়ান্টাম পর্যায়ে দেখলে, ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ বা অতীতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এসব কণিকা কোনো নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলাচল না করে সকল সম্ভাব্য পথ দিয়ে চলে।

১৯৯১ সালে ডেভিড ডিউটচ নামে এক ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে একটি পরীক্ষার প্রস্তাব করেছেন, যাতে একটি কণিকা ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ দিয়ে অতীতে ভ্রমণ করলে কী হবে তা বোঝা যায়। তার এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভকে পরীক্ষা করার পাশাপাশি গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্সের মতো বিষয়গুলো সমাধান করা যাবে।

BanglaBook.org

সম্প্রতি টিম রালফ ও তার PhD ছাত্র মার্টিন রিংবার সর্বপ্রথম সেই দুই দশক পুরনো ডিউটচ- এর মডেলকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার উপায় বের করেছে। রালফদের পরীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। তাদের গবেষণার ফলাফল Nature Communications জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, রালফদের পরীক্ষাটি মূলত কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্য নিয়ে করা হয়েছে। তাদের সিমুলেসনের একটি বড় অংশ ছিল। ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভে অতীত ভ্রমণ করা হলে গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স কীভাবে সমাধান হবে? ডিউটচের কোয়ান্টাম সমাধান কীভাবে প্যারাডক্স সমাধান করে তা খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। একটি মানুষ যখন ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ দিয়ে ভ্রমণ করে অতীতে গিয়ে তার বাবাকে মেরে ফেলে তখনই মূলত প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয়। এখন ডিউটচের মডেলে মানুষের বদলে একটি মৌলিক কণিকা নিয়ে পরীক্ষাটি করা হয়। ধরুন কোনো একটি মৌলিক কণিকা একটি টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে চলে গিয়ে একটি পারমাণবিক সুইচ চাপতে পারে। এখন সে যদি সুইচটি চাপে তবে সে যে টাইম মেশিনে করে অতীতে এসেছিল মেশিনটিই নষ্ট হয়ে যাবে। যদি মেশিনটিই নষ্ট হয়ে যায় তবে সে আর অতীতে এল কী করে? ফলে এই কণিকাদের ক্ষেত্রে যদি পরীক্ষাটি করে দেখা সম্ভব হয়, তবে অতীত ভ্রমণ করলে আসলেই কী ঘটবে তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে।

ডিউটচের মডেল নিয়ে কাজ করে রালফরা এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তাদের পরীক্ষায় দেখা যায়- যদি কোনো কণিকা ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ দিয়ে প্রবেশ করে অতীতে ফিরে যেতে চায়, তবে তার প্রবেশ করার সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আর অতীতে ফিরে যাবার পরের বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকম থাকবে। আর কণিকাটি যদি এভাবে কোনো সুইচ চেপে তার নিজের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাতিল করে দিতে চায়, তবে এটি কাজ করার সম্ভাবনা হবে অর্ধেক। অর্থাৎ সেই কণিকাটি ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভে প্রবেশ করে ঐ সুইচটি টিপতে চায়, তবে এটি অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে কাজটি করার জন্য দুই বার চেষ্টা করলে একবার সফল হবে। আর যদি এভাবে এটি নিজেকে তৈরি করার সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়, তবে তা আর ফিরে

BanglaBook.org

আসতে পারবে না। তেমনি, একটি মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একই রকম হবে। সে তার পূর্বপুরুষকে নিজের হাতে খুন করার অর্ধেক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে আর তার পূর্বপুরুষরা তার হাতে খুন হওয়া থেকে বাঁচার সুযোগ পাবে অর্ধেক।

রাফল, রিংবার ও তাদের সহকর্মীরা তাদের এই নতুন সিমুলেশনে ডিউটচের মডেল ব্যবহার করে কোয়ান্টাম সিস্টেমের ভেতর এক জোড়া পোলারাইজড ফোটনের মধ্যকার সংঘর্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা গাণিতিকভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই ফোটন দুটি ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভে ভেতর দিয়ে চলাচলকারী একটি ফোটনের সমতুল্য! রিংবার বলেছেন, We encode their polarization so that the second one acts as kind of a past incarnation of the firs। যদিও তারা কোনো সত্যিকারের কিছুকে সময়ের অতীতে পাঠিয়ে দেননি, কিন্তু এই সিমুলেশন করার মাধ্যমে কোনো কিছু অতীতে চলে গেলে সত্যি কী হতে পারে তা সম্পর্কে জানা গেছে, যা এমনিতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে অনুমোদিত নয়। এ বিষয়ে রালফ বলেছেন, Of course, we're not really sending anything back in time but [the simulation] allows us to study weird evolutions normally not allowed in quantum mechanics.

সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টড বার্ন এই পরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের আশ্চর্য কিছু তথ্য জানিয়েছেন। তার মতে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যদি ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে আমরা এমন সব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারব যা সাধারণ কোনো কম্পিউটার তো দূরের কথা কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়েও সম্ভব না। কোয়ান্টাম কম্পিউটার এমনিতেই সাধারণ কম্পিউটারের থেকে অনেক বেশি দ্রুত গণনা করতে পারে। আর ক্লোজ টাইম লাইক কার্ভ ব্যবহার করে যদি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করা যায় তা আমাদের কল্পনাকেও হার মানাবে। সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ভাবলে মনে হতে পারে যে অতীতে ভ্রমণ

BanglaBook.org

করলে প্যারাডক্স সৃষ্টি হবে। আর এটাও মনে হয় যে অতীতের সবকিছু ঘটেই আছে; তা আর পরিবর্তন করা সম্ভব না। এখানে প্যারাডক্স সমাধানের যে পরীক্ষাটির কথা বলা হয়েছে তা থেকে একটি আপাত সমাধান মিললেও পরিপূর্ণ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির তথ্য ছাড়া টাইম ট্র্যাভেল প্যারাডক্সের সম্পূর্ণ সমাধান হচ্ছে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টাইম ট্র্যাভেল ও গুজব

টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। আর বেশির ভাগ মানুষই সত্য-মিথ্যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার না করে বিভিন্ন গুজবে বিশ্বাস করে থাকে। শুনতে অবাক লাগবে অ্যামেরিকার মতো উন্নত দেশেও শতকরা ৪৮ জন মানুষ বিশ্বাস করে যে পৃথিবী থেকে UFO দেখা গিয়েছে। টাইম ট্র্যাভেল নিয়েও এমন অনেক গুজব আছে, আর সেগুলো অনেক মানুষ বিশ্বাসও করে। টাইম ট্র্যাভেল সম্পর্কিত জনপ্রিয় এসব গুজব নিয়ে উইকিপিডিয়ায় একটি পেজও আছে। নাম Time travel urban legends। এই পেজের প্রথমেই তথাকথিত এসব লিজেন্ডদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'এই লোকগুলোর ঘটনা মূলত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইন্টারনেটে প্রচারিত খবরের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে। যার কোনোটিরই নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। বরং ধারণা, অপর্যাপ্ত তথ্য ও বিভিন্ন কল্পকাহিনীর উপরে ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে'। পাশাপাশি এই তথ্যগুলো যে ধাপ্পাবাজির উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে তাও বলা হয়েছে।

টাইম ট্র্যাভেলার হিসেবে পরিচিত এমন একজন হলেন এন্ড্রু কার্লসিন (Andrew Carlssin)। এই লোক মূলত একজন শেয়ার ব্যবসায়ী। ২০০৩ সালে ১২৬টি উচ্চ ঝুঁকির শেয়ার কিনে পর পর সবগুলোতেই লাভ করার পর সন্দেহ বশত SEC তাকে গ্রেফতার করে। রিপোর্টে বলা হয় কার্লসিন

BanglaBook.org

মাত্র ৮০০০ ডলার দিয়ে শুরু করে ৩৫০০০০০০০ ডলার লাভ করে ফেলেন। আর এই বিষয়টি SEC এর নজরে আসে। পরবর্তীতে রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, তাকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে চার ঘণ্টার একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সে সেখানে জানায় সে মূলত আমাদের সময়ের মানুষ না।

২০০ বছর ভবিষ্যতের সময় থেকে টাইম মেশিনের সাহায্যে সে এসেছে। কঠিন শাস্তি দেবার পর অনুসন্ধানকারীদের সে ওসামা বিন লাদেনের খবর জানাতে চায় ও এইডস রোগের প্রতিষেধক তৈরি করার উপায় বলে দিতে চায়। পরে তাকে তাকে টাইম মেশিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সে তার নিজের সময়ে ফিরে যায়। কিন্তু তাকে অনেক অনুরোধ করা হলেও সে কাউকে তার টাইম মেশিনের কার্যপ্রণালী বলতে চায়নি।

উপরের গল্পটি প্রথমে উইকলি ওয়ার্ড নিউজ (Weekly World News) নামে একটি ব্যঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি ইয়াহু নিউজে প্রকাশ করা হয়। ইয়াহু নিউজ ইচ্ছে করেই এর গল্পের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে প্রকাশ করেছিল। গল্পটি জনপ্রিয়তা পাবার পর অনেক ছোট-বড় ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকা এটিকে প্রকাশ করে। আর তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। পরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও বেশি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্টারনেটে প্রকাশ করা সেসব গল্পে, মূল গল্পের সাথে আরও নতুন বিশেষণ যোগ করা হতে থাকে। আর এখন প্রচুর মানুষ বিশ্বাস করে যে এই লোকটি আসলেই ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেই অতীতে ভ্রমণ করেছিল।

এই গল্পের আজকাল যে রূপ পাওয়া যায় তাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। সেখানে দেখানো হয়, কার্লসিন একদিন জেল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে আর পাওয়া যায়নি। পরে তার এই অস্বাভাবিক অদৃশ্য হবার প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন পত্রিকার ছবি হাজির হয়। ফলে টাইম ট্র্যাভেল বিষয়টি সম্পর্কে যদি কেউ বিজ্ঞানসম্মতভাবে না জানে, তাহলে তার কাছে এই গল্প বাস্তব মনে হওয়া খুব বেশি অবাক কিছু না।

BanglaBook.org

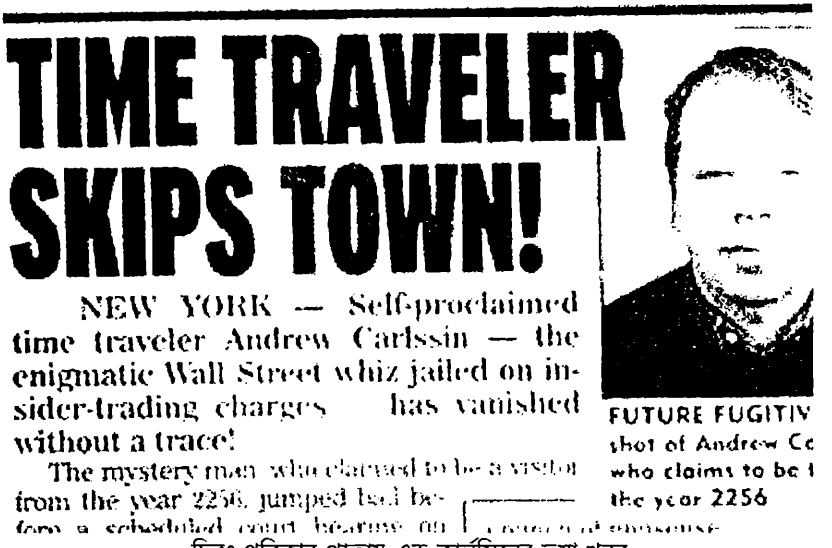

TIME TRAVELER SKIPS TOWN!

NEW YORK — Self-proclaimed time traveler Andrew Carlssin — the enigmatic Wall Street whiz jailed on insider-trading charges — has vanished without a trace!

The mystery man who claimed to be a visitor from the year 2256, jumped bail be- fore a scheduled court hearing on

FUTURE FUGITIV
shot of Andrew Ca
who claims to be f
the year 2256

চিত্রঃ পত্রিকার পাতায় এন্ড্রু কার্লসিনের ভুয়া খবর

২০১০ সালের অক্টোবর মাসের কথা। আইরিস ফিল্ম মেকার জর্জ ক্লার্ক, Chaplin's Time Traveler শিরোনাম দিয়ে ইউটিউবে একটি ভিডিও আপলোড করেন। ভিডিওটি ছিল ১৯২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে 'গুমান চায়নিজ থিয়েটার'-এ চলা চার্লি চ্যাপলিনের একটি সিনেমার প্রিমিয়ার শো চলাকালীন সময়ের। সিনেমার নাম 'দি সার্কাস'। সে সময় সিনেমার গেটের সামনে জিরাফের একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করা হচ্ছিল। ভিডিও চলাকালীন সময়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে একজন মহিলা হেঁটে চলে যায়। এমন সময় তিনি তার হাতটি কানের কাছে তুলে ধরেন।

ক্লার্ক তার এই ভিডিও সম্পর্কে বলেছেন, বিবর্ধিত পর্যবেক্ষণে তিনি দেখতে পেয়েছেন এই মহিলার হাতে এক পাতলা বস্তু ধরা ছিল। দেখে মনে হয় যে একটি মোবাইল ফোন। কিন্তু সেই ১৯২৮ সালে একটি মানুষ মোবাইল ফোন পাবে কোথায়? আর কার সাথেই বা কথা বলবে! তাই ক্লার্ক প্রচার করতে থাকলেন এই মহিলাটি একটি টাইম ট্র্যাভেলার। তিনি ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের এই সময়ে এসেছেন, আর ভবিষ্যতের মানুষদের সাথে কথা বলছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভিডিও ক্লিপটিতে কয়েক মিলিয়ন হিট হয়। আর টাইম ট্র্যাভেলারের গল্পটিও সবার মধ্যে প্রচার হয়ে যায়।

BanglaBook.org

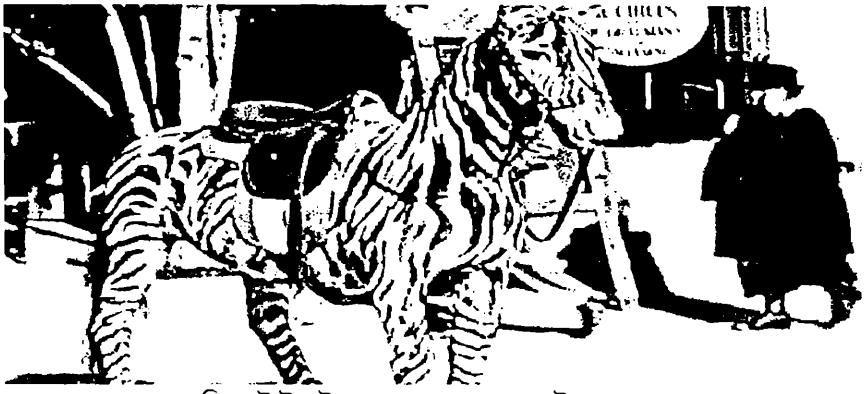

চিত্রঃ টাইম ট্রাভেলারের হাতে মোবাইল ফোন।

দি আটলান্টিক পত্রিকার সহসম্পাদক নিকোলাস জ্যাকসন এই টাইম ট্র্যাভেলার গুজবের রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পারেন ১৯২৮ সালের কয়েক বছর আগেই সবেমাত্র তারবিহীন কানে শোনার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল। আর ভিডিও দেখে তিনি বুঝতে পারেন ঐ মহিলার কানে ধরা জিনিসটিও একটি শোনার যন্ত্র ছিল। অনেকে অবশ্য কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে তাদের সবার মতামতই প্রায় কাছাকাছি। যেমন- ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নাড বেকার মেডিক্যাল লাইব্রেরির অ্যাক্টিভিস্ট ফিলিপ স্ক্রোসরা মনে করেন এটি মূলত একটি ইয়ার ট্রাম্পেট (Ear trumpet) ছিল।

১৯৪১ সালে কানাডার সাউথ ফর্ক ব্রিজ পুনরায় চালু করার দিন একটি অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অনেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ দিনের একটি ছবি আছে, যেখানে একটি লোককে সময় ভ্রমণকারী বলে ধরা হয়। ছবিতে দেখা যায়, একটি লোক অনেক আধুনিক একটি সানগ্লাস ও একটি টি-শার্ট পরে সবার সাথে দাঁড়িয়ে ব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখছেন। এই ছবি নিয়ে যারা আলোচনা তুলেছিল তাদের বেশির ভাগ মানুষই বিশ্বাস করে এই লোকটি অবশ্যই ভবিষ্যৎ থেকে টাইম মেশিনে চড়ে এসেছে। তা না হলে সে এমন পোশাক ও সানগ্লাস পাবে কোথায়।

BanglaBook.org

চিত্র ঃ ডান দিকের তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় যেন সে আধুনিক পোশাক পরে রয়েছে

কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানে প্রকৃত সত্য জানা গেছে। জানা যায় ঐ ধরনের সানগ্লাস প্রথম তৈরি করা হয় ১৯২০ সালের দিকে। কিন্তু ঐ সময়ের খুব বেশি ছবি না থাকাতে প্রথমে মনে হয়েছিল এমন গ্লাস আসলেই অনেক নতুন। আর তাকে যে টি-শার্ট পরে থাকতে দেখা গেছে, তাকে প্রথমে দেখতে টি-শার্টের মতো মনে হলেও ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায় সেটি আসলে টি-শার্ট না। সেটি ছিল মূলত একটি সোয়েটার। সে সময় ঐ সোয়েটারের প্রচলন ছিল। সোয়েটারের উপর দিয়ে অন্য একটি কাপড় থাকায় প্রথমে দেখলে মনে হতে পারে সেটি টি-শার্ট, কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে আসল ঘটনা বোঝা যায়। কিন্তু গুজব মানুষের কাছে এমন পছন্দের একটি জিনিস যে তা উপভোগ করার জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়ে বসে থাকে।

এবার স্বয়ং টাইম ট্র্যাভেলারের কাহিনী শোনা যাক। ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত অ্যামেরিকার অনেক বুলেটিন বোর্ডে একটি ভবিষ্যদ্বাণী লেখা থাকত। বুলেটিনের এই বার্তা প্রচারক নিজেকে জন টিটর বলে প্রচার করে। এসব বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে সে জানায়, সে মূলত একজন টাইম ট্র্যাভেলার। সে ২০৩৬ সাল থেকে এসেছে। ঐ বুলেটিন বোর্ডে সে

BanglaBook.org

অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। আর সেগুলো নাকি ২০০৪ সাল থেকে কার্যকর হওয়া শুরু করবে। এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে সে আগামী দিনের যেসব মারাত্মক পরিবর্তন হবে তার কথা তুলে ধরত। তার মধ্যে ছিল- অ্যামেরিকা ভেঙে পাঁচটি ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হবে। নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ হবার ফলে পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ২০১৫ সালেও তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিলতে দেখা যায়নি। এই ঘটনাটি একটি বই, ডকুমেন্টারি, এমনকি রেডিও শোনতেও স্থান পেয়েছে।

শুনলে অবাক হবেন, জন টিটরের থেকেও বড় পাগল আছে। তবে এই ব্যক্তি বুলেটিন বোর্ডের পরিবর্তে স্প্যাম ই-মেইলকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ২০০১ সালে থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ইন্টারনেটে প্রচুর সংখ্যক স্প্যাম মেইল পাঠাতে থাকেন। তার মেইলের বিষয় প্রায় সব সময় একই থাকত। সে মেইলের মাধ্যমে মূলত সবার কাছ থেকে সাহায্য চাইত, কেউ যেন তাকে একটি ডাইমেনশনাল র্যা c জেনারেটর তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। কিছু কিছু মেইলে সে এটাও উল্লেখ করত যে, সে মূলত একজন টাইম ট্র্যাভেলার। কিন্তু তার টাইম মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সে ২০০৩ সালে এসে আটকে গেছে। তাই এমন একটি মেশিন তৈরি করা তার খুবই দরকার।

অনেক ব্যক্তি তার মেইলের প্রতিউত্তর দিয়েছিল। এর মধ্যে একজন ছিলেন ডেভ হিল। তিনি এই টাইম ট্র্যাভেল দাবিদার ব্যক্তির জন্য একটি অনলাইন শপ ঠিক করে দেন, যাতে সে ডাইমেনশনাল র্যা c জেনারেটর তৈরি জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারেন। ডেভের মতো অনেকেই তখন এই স্প্যামারের কথা বিশ্বাস করছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই এই স্প্যামারকে শনাক্ত করা হয়। জানা যায় তার নাম James R. Todino। টাইম ট্র্যাভেল করা নিয়ে এই ব্যক্তির একদম দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরবর্তীতে ভালোমতো খোঁজ নিয়ে জানা যায়- এই লোক মূলত একজন মানসিক রোগী। মারাত্মক সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। তার বাবার কাছেও একই তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এই রোগে আক্রান্ত

BanglaBook.org

রোগীরা বিভিন্ন অলীক বিশ্বাস ধারণ করে থাকে। কেউ বিভিন্ন কাল্পনিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে, কেউ শুধু আওয়াজ শুনতে পায়, কেউ নিজের মতো হুবহু আরেকজনকে দেখতে পারে।

উপরে যে দুজনের কাহিনী শোনালাম এগুলো হলো সাধারণ পাগল। মজার ব্যাপার হলো, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে সাধারণ পাগলের পাশাপাশি বিজ্ঞানী পাগলও আছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ফার নামে এক ইরানি সংবাদ সংস্থা দাবি করে, ২৭ বছর বয়সী এক ইরানি বিজ্ঞানী একটি টাইম মেশিন তৈরি করছে, যা থেকে মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারবে। কিছুদিন পরেই এই ঘটনা সংবাদমাধ্যম থেকে তুলে দেওয়া হয়। পরে ইরানের সরকার এক বার্তায় ঘোষণা করে যে, ইরানের কোনো বিজ্ঞানী এমন কোনো মেশিন তৈরি করেনি। কিন্তু এই ঘটনা প্রচার হবার পর বেশির ভাগ মানুষই বিশ্বাস করেছিল। আসলে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো দাম নেই। কিন্তু মানুষ সবকিছু তাদের নিজেদের মতামত ও বিশ্বাসের বিচার করতে চায়।

কুসংস্কারের অনেক রকম ডালপালা থাকে। তার মধ্যে এমন কিছু গুজব থাকে, যা ভাবলে অবাক হতে হয় যে মানুষ কতটা গুজবপ্রিয়। ক্রোনোভিসর (Chronovisor) নামে একটি মেশিনের কথা প্রচলিত আছে। প্রচুর মানুষের ধারণা এই মেশিন দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের যেকোনো ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এই মেশিনের কথা মূলত গির্জার পাদ্রি ও লেখক ফাদার ফ্রাঙ্কোইস ব্রুননের লেখা বই থেকে জানতে পারে। ব্রুনন সাধারনত বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও ধর্মীয় বিষয় নিয়েই বেশি লিখতেন। তবে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বা অধিবিদ্যা নিয়েও লিখেছেন। তিনি তার The Vatican's New Mystery বইয়ে দাবি করেন ইতালিয়ান পাদ্রি ও বিজ্ঞানী ফাদার Pellegrino Maria Ernetti এই যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন। তিনি যেহেতু একজন বাস্তব মানুষ ছিলেন তাই বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করে আসলেই এমন কোনো যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল।

BanglaBook.org

আশ্চর্যের বিষয় হলো Ernetti নিজেও এই যন্ত্র তৈরি করার দাবি করেছেন। জানা যায়, তিনি কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে মিলে এই যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। এমনকি এই দলের মধ্যে নাকি এনরিকো ফার্মিও ছিলেন। তার নিজের দেওয়া বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, যেকোনো ঘটনা ঘটার সময় যে বিকিরণ ও শক্তি নিঃসরিত হয় তা পরিবেশ কর্তৃক গৃহীত হয়। তিনি দাবি করেন, তার যন্ত্র এই বিকিরণকে পরিবেশ থেকে আলাদা করে যেকোনো মুহূর্তের ঘটনাকে দেখাতে পারে। এমনকি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক আলাদা করে সেই সময়ের শব্দও শোনাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অদ্ভুত যন্ত্রের কোনো প্রমাণ কখনো পাওয়া যায়নি।

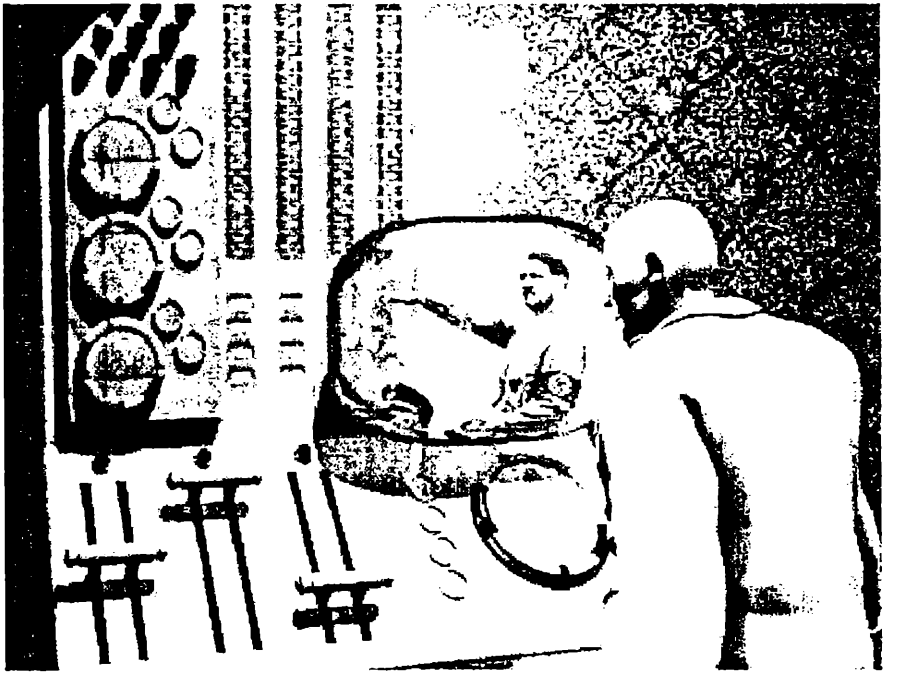

চিত্রঃ তথাকথিত ক্রোনোভিসর যন্ত্রের কাল্পনিক রূপ

চীনের কিছু মানুষ বিশ্বাস করে চীনের একটি সময় সুড়ঙ্গ আছে। তাদের ধারণা সেই সুরঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বাহির হলে সময় ১ ঘণ্টা পিছিয়ে যায়।

এই সুড়ঙ্গটি Guizhou প্রদেশের তঁহুর শহরে অবস্থিত। স্থানীয়দের বর্ণনা মতে কেউ যদি বিকেল পাঁচটায় প্রবেশ করে পাঁচ মিনিট পর বের হয় তখন

BanglaBook.org

তারা তাদের ঘড়িতে পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট দেখার পরিবর্তে চারটা বেজে পাঁচ মিনিট দেখে থাকে। অর্থাৎ তাদের সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। এই সুরঙ্গটি অনেক আগে তৈরি করা হলেও স্থানীয়রা বলেছে এই প্রভাব অল্প কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে। মজার বিষয় হলো, কোনো খবরেই ঘড়ির সময় পরিবর্তনের কথা শোনা যায়নি। যারা সময় পিছিয়ে যাবার দাবি করেছে তাদের সবার মতে শুধুমাত্র তাদের মোবাইল ফোনের সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। আর সুড়ঙ্গ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে সময় আবার ঠিকও হয়ে যায়। এ কারণে অনেকে ধারণা করেছেন, নেটওয়ার্কজনিত কারণে এই প্রভাব দেখা দিতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম থেকে আমরা দেখেছি, সময় ভ্রমণ করা অবাস্তব কল্পনা না। তবে টাইম মেশিন তৈরি করার মতো প্রযুক্তি অর্জন করার জন্য আমাদের আরও অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে। হিংসাত্মক প্রবণতার কারণে আমরা যদি আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করে না দেই তবে, বিজ্ঞানীরা হয়তো একদিন সত্যিকারের ভ্রমণ করার উপযোগী টাইম মেশিন তৈরি করতে পারবেন। সেদিন আমরা হব সত্যিকারে স্বাধীন সত্তা। পাশাপাশি এটাও বলা দরকার, সময় ভ্রমণ নিয়ে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে তার সবগুলোই বানোয়াট। তাই এগুলোতে বিশ্বাস করা চূড়ান্ত বোকামি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তথ্যসূত্র

সহায়ক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র ও ওয়েবসাইটঃ

Time Warped: Unlocking the Mysteries of Time Perception Hammond ,Claudia. (2012)

The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence. Carl Sagan. (1977)

Erik Trinkaus, "The Shanidar 3 Neandertal", American Journal of Physical Anthropology, Volume 57, Issue 1, pp. 37 – 60

Steven Mithen, "After the ice: a global human history, 20,000-5000 BC", Chapter 44 – "Vultures of the Zagros", 2003

DD Thompson and Erik Trinkaus, "Age determination of the Shanidar 3 Neanderthal", Science 1 May 1981

E. Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, vol. 87, December 1978, p. 143

About Time. Davies, Paul. (1996)

The Nature of Space and Time._ Roger Penrose, Stephen Hawking.

Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe. Penrose, Roger. (2010)

The Fabric of the Cosmos: Space. Time, and the Texture of Reality. Greene, Brian (2004).

Parallel Worlds; A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos Kaku,Michio(2005)

A Brief History of Time. Hawking, Stephen (1998).

Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe. Smolin,Lee. (2014)

The End of Time: The Next Revolution in Our Understanding of the Universe . Barbour,Julian. (1999)

Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the Tenth Dimension. Kaku, Michio (1994).
Time and Chance. Albert, David (2000)
Foundations of Space-Time Theories. Friedman, Michael (1983)
Asymmetries in Time. Horwich, Paul (1987). MIT Press.
ভবিষ্যতে যাওয়া যাবে, যাবেনা পেছনে ফেরাঃ আইনস্টাইন, আপেক্ষিকতা ও সময়ের আধুনিক ধারনা। আসিফ, সাহিত্য প্রকাশ(২০০৮)।
সময় প্রসঙ্গ, ড. আলী আসগর, অনিন্দ্য প্রকাশ(২০০৭)।
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.science20.com/
https://en.wikipedia.org/
http://www.abroadintheyard.com/

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org